আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার

জিরো টু ওয়ান

উদ্যোগের নথিপত্র,
এবং
কীভাবে ভবিষ্যৎ নির্মান করবে,
নিজের ভিতর থেকে উন্নয়ন
করার চেষ্টা করতে হবে।

পিটার থিয়েল
ব্লেক মাস্টার

BOOK ON ENTREPRNUERSHIP

জিরো টু ওয়ান

শিকড় থেকে শিখরে

পিটার থিয়েল

ব্লেইক মাস্টার

অনুবাদ

ফজলে রাব্বি

Audilua.com
Digital University

মুখবন্ধ

এই বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি প্রশ্ন হচ্ছে :

ক. 'এমন কোন কোন সত্য বিষয় আছে যাতে খুব কম লোকই আপনার সাথে একমত হয়?'

খ. 'মূল্যবান এমন কোন কোম্পানিটি কেউ সৃষ্টি করছে না?'

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন প্রশ্ন করলে সহজে কেউ উত্তর দিতে পারে না। আর যারা উত্তর পেয়ে যায় তার কথা বলার চেয়ে কাজ করে সেই নবসৃষ্টির আনন্দ ও মুনাফা নিতে আগ্রহী। আজ থেকে বিশ বছর আগের একটি ঘটনা বলি। তখন বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের বেশ ভালো অবস্থা। গার্মেন্টসের মালামাল পরিবহণ করা হতো খোলা ট্রাকে করে। এতে করে বেশ কিছু মালামাল বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হতো অথবা চুরি যেতো। এতে করে একটি সমস্যা সৃষ্টি হলো। এই সমস্যার সমাধানে এলো কাভার ভ্যান। তখন যারা এই সমস্যা ও পরিবর্তন ধরতে পেরেছে তারা কাভার ভ্যান দিয়ে অনেক অর্থ আয় করতে সক্ষম হয়েছে। আবার সেই প্রশ্নটি বিবেচনা করুন, 'মূল্যবান এমন কোন কোম্পানিটি কেউ সৃষ্টি করছে না?' আজকে থেকে বিশ বছর পর এমন কী দরকার, এমন কোন সমস্যা সৃষ্টি হবে তা যদি আপনি আজকে খুঁজে বের করতে পারেন, তবে আজকে থেকেই আপনি সেই কাজ করে বিশ বছরের মধ্যে বাজারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতে পারবেন।

আরেকটি ঘটনা বলছি, ট্রলি ব্যাগ। আগে চীন থেকে ট্রলি ব্যাগ বাংলাদেশে আমদানি করে আনা হতো। এখন সেই আমদানিকারকরাই বাংলাদেশে ট্রলি ব্যাগের কারখানা বসাচ্ছে এবং বাংলাদেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করছে। চীনের চেয়ে বাংলাদেশের সুবিধা হচ্ছে, চীনের শ্রমিকের মজুরি দিতে হয় ৫০,০০০ টাকা, অথচ বাংলাদেশের শ্রমিকের মজুরি ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার মধ্যে। এই ধরনের আরও অনেক ব্যবসা আছে যা ভবিষ্যতে আপনার সামনে দিয়েই সৃষ্টি হবে। আপনি যদি আগ্রহী হন এবং যথেষ্ট পরিমাণ খুঁজে দেখার মতো শ্রম দেন, তবে আপনিও এমন একটি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী হবেন।

বুদ্ধি কেউ জন্ম থেকে নিয়ে আসে না। মানুষ জন্ম নেয় মস্তিষ্ক নিয়ে। সেই মস্তিষ্ককে প্রতিনিয়ত শানিত করতে হয়, ধার দিতে হয়। একা একা চিন্তা করাই যথেষ্ট নয়। বুদ্ধিমান লোকজনের সাথে চলুন, যারা কাজ করে, উদ্যমী লোকের সঙ্গ থেকে, আলাপ আলোচনা থেকে শিখুন। তবেই আপনার মধ্যে দূরদর্শিতা সৃষ্টি হবে। তবেই আপনি আপনার ভবিষ্যৎকে পরিষ্কার দেখতে পাবেন। আর সেই ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করতে যা যা দরকার তা তো এই বই স্পষ্ট আকারে পাচ্ছেন। শিকড় থেকে শিখরে উঠে আসা অগ্রদূত, তাহলে দেখা হচ্ছে।

ফজলে রাব্বি

০৭ আষাঢ় ১৪২৫

Audilua.com

সূচি

০	সূচনা	১১
এক	ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ	১৩
দুই	আনন্দ করুন যেন ১৯৯৯ সাল	২১
তিন	যেকোনো সফল প্রতিষ্ঠানই আলাদা	৩৩
চার	প্রতিযোগিতার মূলনীতি	৪৯
পাঁচ	শেষে থাকলে যে সুবিধা	৬১
ছয়	আপনি লটারির কোনো টিকেট নন	৭৯
সাত	অর্থকে অনুসরণ করুন	৯১
আট	গোপনীয়তা	৯৯
নয়	মূলভিত্তি	১১৩
দশ	মাফিয়াদের কলাকৌশল	১২৫
এগারো	আপনি যদি উদ্যোগ নেন তবে কি লোকজন এই ব্যাপারে এগিয়ে আসবে?	১৩৫
বারো	মানুষ ও যন্ত্র	১৫১
তেরো	সবুজ প্রযুক্তি বা নবায়নযোগ্য প্রযুক্তি	১৬৩
চৌদ্দ	প্রতিষ্ঠাতাদের বৈশিষ্ট্য	১৭৭
১	স্থিরতা নাকি অসাধারণত্ব	১৮৫

Audilua.com

সূচনা

প্রতিটি উদ্যোগের সফলতা কিন্তু একবারই আসে। পরবর্তীতে যে বিল গেটস আসবে সে কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম বানাবে না। পরবর্তী ল্যারি পেজ বা সার্জে ব্রিন কিন্তু একটি সার্চ ইঞ্জিন বানাবে না। পরবর্তী মার্ক জাকারবার্গ কিন্তু একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বানাবে না। আপনি যদি এদেরকে অনুকরণ করেন, তবে আমি বলব আপনি এদের থেকে কিছুই শিখছেন না।

আমি এই কিন্তু শব্দটির নিচে দাগ দিয়েছি। কারণ এই কিন্তুর মধ্যেই আপনার সুযোগ। পরবর্তী মার্ক জাকারবার্গ কিন্তু একটি সামাজিক যোগাযোগ সাইট বানাবে না। আমি তো বলব পরবর্তীতে কোন মার্ক জাকারবার্গই আসবে না। যখন বিশ্বের এক নম্বর কোটিপতি রূপে বিল গেটস ছিলেন, তখন অনেকেই জানতে চেয়েছে এর পরের বিল গেটস কে আসবে? আসলে কি বিল গেটস এসেছে? না। এসেছে জেফ বেজোস, ল্যারি পেজ, সার্জে ব্রিন, মার্ক জাকারবার্গ, জ্যাক মা। তাহলে পরবর্তীতে কে আসবে? কী নিয়ে আসবে? আমি বলি, হয়তো আপনি আসবেন। হয়তো আপনি এমন কোন উদ্যোগ নিয়ে হাজির হবেন যা কেবল দেশের সমস্যাই সমাধান করবে না; বরং সারা বিশ্বের সমস্যা সমাধান করবে। বিশ্বকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিবে।

বিশ্বের সফল ব্যক্তিদেরকে আপনি দেখবেন, তাদের উদ্যোগ ও পদ্ধতিগুলো থেকে শিখবেন; আর নিজের পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করবেন। এমন কোন বুদ্ধি বা ধারণা সেই পদ্ধতির সাথে যোগ করুন যা আপনার উদ্যোগকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিবে। তবে অবশ্যই প্রথমে আপনার উদ্যোগটিকে স্থানীয় কোনো সমস্যার সমাধান করতে হবে। যেমন বিল গেটস, তিনি তার এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর সাথে মিলে অপারেটিং সিস্টেম নির্মাণের উদ্যোগ নেন। তার কারণ ছিল তখনকার দিনে কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম ছিল না। এজন্য প্রচুর সময় ব্যয় হতো। তাই এই সমস্যার সমাধানে বিল গেটস অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে এগিয়ে আসেন। তারপর জাকারবার্গ যখন হার্ভাডে পড়ালেখা করছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের

অভ্যন্তরীণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনলাইনে যোগাযোগ করার দরকার হয়ে পড়ে। জাকারবার্গ একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে এলো, স্থানীয় সমস্যার সমাধান হলো। তারপর মার্ক জাকারবার্গ সারা বিশ্বে এই উদ্যোগকে প্রণোদনা দিল।

এখনো আপনি যদি তাদেরকে কেবল অনুকরণই করে যান তবে আপনি তাদের কাছ থেকে কিছুই শিখছেন না। অবশ্যই নতুন কিছু সৃষ্টি করার চেয়ে অনুকরণ করা সহজ। ইতোমধ্যে আমরা যে উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে পেরেছি সেই জিনিসটা নিয়ে কাজ করাই হলো ১ থেকে 'ম' তে গমন। (ম মানে মৃত, এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আরও আলোচনা করা হয়েছে।) হয়তো আমরা আরও কিছু যোগ করলাম। কিন্তু যখনি আমরা নতুন কিছু সৃষ্টি করবো, উদ্ভাবন করবো তখনই এটা হবে ০ থেকে ১ এ গমন।

ধরুন, আপনার মনে হলো এই বইটি ভালোই চলছে, এটি আমিও অনুবাদ করবো এবং বাজারজাত করবো। এটা হলো ১ থেকে ম। আর যদি এই বই পাঠ করে, এই বইয়ের জ্ঞান আপনার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জন করেন ও সেই সাফল্যের ঘটনাবলি দিয়ে বই রচনা করেন, তবেই সেটা হবে ০ থেকে ১। আমি অনুপ্রেরণামূলক ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের বই অনুবাদ করি, লিখি কেবল আপনার জন্য। যাতে আপনি আপনার জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারেন এবং ০ থেকে ১ এ যেতে পারেন।

এখন আমেরিকার কিছু কোম্পানির কথা বলি; উইন্ডোজ, গুগল, ফেসবুক সহ অন্যান্য বড় বড় কোম্পানি যদি নতুন কিছু সৃষ্টি করতে না পারে তবে আজকে তারা যতই মুনাফা করুক না কেন ভবিষ্যতে ব্যর্থ হবেই। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যে ব্যবসা পেয়েছি এখনো আমরা যদি সেই ব্যবসার পুরাতন রাস্তাগুলোকে ঘষা-মাজা করি, ঝকঝকে করি তবে কী লাভ? নতুন কিছু সৃষ্টি না করলে যে কী হতে পারে তার প্রমাণ ২০০৮ সালের ব্যবসায়িক বিপর্যয়। আজকের 'সবচেয়ে ভালো পেশা বা রাস্তা' আপনাকে ভবিষ্যতের অচল অবস্থার দিকে নিয়ে যাবে। সবচেয়ে ভালো রাস্তা বা পেশা হচ্ছে যে রাস্তা নতুন এবং যে পেশায় এখনো কেউ প্রবেশ করেনি। নিজের কাছে এই প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ করুন, 'এমন কোন কোন মূল্যবান কাজ আছে যা এখনো কেউ করে দেখাচ্ছে না?'

এক

ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ

আমি যখনই চাকরির জন্য কারও সাক্ষাৎকার নিই তখনই এই প্রশ্নটি করি : 'এমন কোন কোন সত্য বিষয় আছে যাতে খুব কম লোকই আপনার সাথে একমত হয়?'

প্রশ্নটি শুনতে খুব সহজ মনে হলেও উত্তর দেওয়া তত সহজ নয়। বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে এ কঠিন, কারণ কমবেশি সবাইকে বিদ্যালয়ে যা শেখানো হয় তারা তাই বলে। মানসিক দিক থেকে কঠিন কারণ যারাই এর উত্তর দিতে যাবে তখন দেখবে যে, উত্তরটি তেমন জনপ্রিয় নয়। হয়তো আপনি কোন অসাধারণ উত্তর দিতে পারবেন না। কিন্তু আপনি তো ইচ্ছা করলে সাহস দেখিয়ে যা মনে আসে তাই বলতে পারেন। আর সাহসই আপনাকে মেধাবী হওয়ার দিকে ধাবিত করে।

আমি প্রায়ই যে উত্তরগুলো শুনি :

'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা যাচ্ছেতাই। এর খুব দ্রুত সংস্কার হওয়া দরকার।'

'আমেরিকা একটি ব্যতিক্রমী দেশ।'

'আল্লাহ বলতে কিছু নেই।'

এগুলো সবই বাজে উত্তর। প্রথম দুইটি হয়তো সত্য। আর এই দুইটিতে হয়তো অনেক লোকই আপনার সাথে একমত হবে। কিন্তু তৃতীয় উত্তরটি কেবল তর্ক করার জন্য। একটি ভালো উত্তর কিছুটা এরকম হতে পারে : 'বেশিরভাগ

লোকজন "ক" এর ওপর বিশ্বাস করে, কিন্তু সত্য হচ্ছে "ক" এর বিপরীত।' আমি আমার নিজের উত্তর একটু পরে দিচ্ছি।

আসলেই তাই। আমরা বিশ্বাস করি একটা; আর সত্য হয়ে দেখা দেয় তার বিপরীতটা। এখন আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন যে এ ধরনের বৈপরীত্যমূলক একটি প্রশ্নের সাথে ভবিষ্যতের কী সম্বন্ধ? আছে। সম্বন্ধ আছে। খুব গভীর সম্বন্ধ আছে। ভবিষ্যৎ কী? সহজভাবে বললে, ভবিষ্যৎ হচ্ছে একগুচ্ছ সময় যা আসবে। কিন্তু ভবিষ্যৎকে আজকের অবস্থান থেকে আলাদা, স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ করবে কীসে? যা এখনো ঘটেনি, তাই তো। যা নতুন। যা আগে কেউ দেখেনি। যা আজকের থেকে ভিন্ন, তাই না। তাহলে এটাই যদি হয়, তবে আমাদের সমাজ যদি আগামী একশ বছর পর্যন্ত এমনই থাকে, কোন পরিবর্তন না হয় তবে আমরা ভবিষ্যৎ থেকে একশ বছর দূরে থাকবো। আর যদি আগামী এক যুগের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে, তাহলে বলতে হয় ভবিষ্যৎ আমাদের হাতের মুঠোয়। আসলে কেউই বলতে পারে না যে ভবিষ্যৎ কখন আসবে। কিন্তু আমরা অন্তত দুইটি জিনিস সম্পর্কে জানি। তা হচ্ছে : এটা ভিন্ন কিছু নিয়ে আসবে এবং এটার মূল বা শিকড় আজকের বিশ্বেই অবস্থিত। বেশিরভাগ বৈপরীত্যমূলক প্রশ্নেরই ভিন্ন ভিন্ন উত্তর থাকে। এটা একটি জিনিসকে দেখার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দেয়। যখন আমরা ভালো উত্তরগুলো খুঁজে পাবো তখন আমরা ভবিষ্যতের ঠিক ততটাই কাছে চলে যাবো।

শিকড় থেকে শিখরে :

উন্নয়নের ভবিষ্যৎ

আপনি কি কখনো ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেছেন? আমরা যখনই ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি তখনই আমরা অগ্রগতি ও উন্নতির চিন্তা করি। অগ্রগতি হবে এটা সত্য। অগ্রগতির দুইটি ধরন আছে। এরমধ্যে যেকোনো একটি ঘটবে তাও সত্য। একটি ধরন হচ্ছে অনুভূমিক অগ্রগতির বিস্তার বা সম্প্রসারণ। এর মানে হলো যে জিনিসের চাহিদা আছে, যা দরকার তার কেবল নকল করা। একে বলা যায় ১ থেকে ম তে গমন। (ম এর ব্যাখ্যা একটু পরে দিচ্ছি।) অনুভূমিক অগ্রগতি বোঝা

বেশ সহজ। কারণ এটা কেমন হবে তা আমরা আগে থেকেই জানি। সরলরেখা যে সোজা হবে তা তো আগে থেকেই অনুমান করা যায়। তবে অগ্রগতির দ্বিতীয় ধরনটি একটু ভিন্ন। এটি হচ্ছে উলম্ব বা প্রগাঢ় অগ্রগতি। মানে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা–একেই বলে ০ থেকে ১ এ গমন, শিকড় থেকে শিখরে। এই উলম্ব অগ্রগতিকে চিন্তা করা একটু কঠিন। কারণ এটা এমন কিছু যা কেউ আগে করেনি। যদি আপনি একটি টাইপরাইটার নেন এবং আরও ১০০টি টাইপরাইটার নির্মাণ করেন তবে এটা হবে অনুভূমিক অগ্রগতি। আর আপনি যদি একটি টাইপরাইটার নেন এবং একটি ওয়ার্ড প্রসেসর নির্মাণ করেন তবে এটা হবে উলম্ব অগ্রগতি।

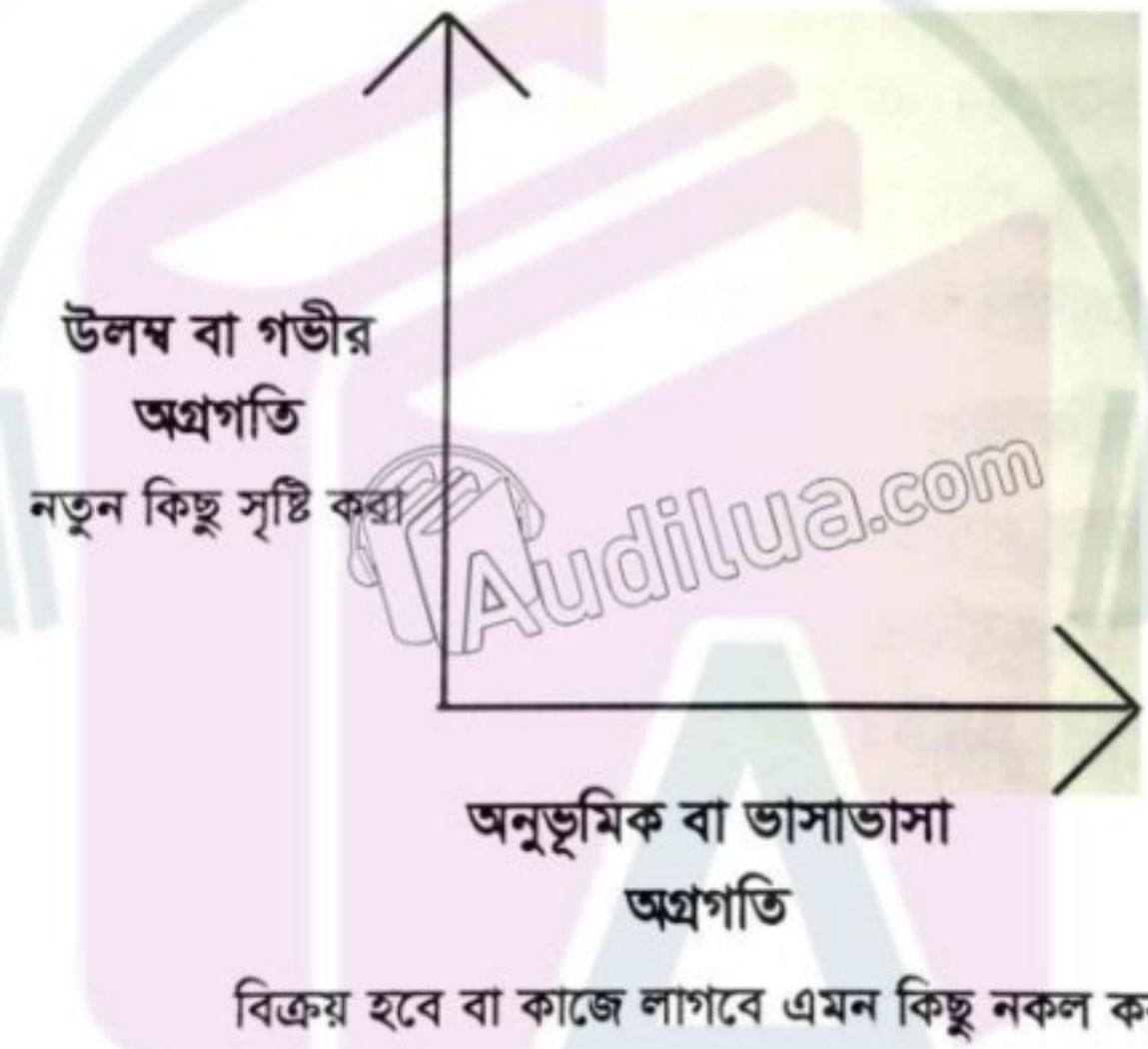

অনুভূমিক অগ্রগতি মানে ১ থেকে ম তে গমন। ম মানে মৃত। আপনি কি গেম অফ থ্রোনস (*Game of Thrones*) দেখেছেন? সেখানে 'মৃতদের সেনাবাহিনী' থাকে। এই মৃত সৈন্যরা একজনের পিছনে একজন হাঁটতে থাকে। তাদের অগ্রপথিক বা নেতা যখন হাঁটে তখন তারাও হাঁটে, নেতা যখন থামে তারাও থামে। নকল করা বা অনুলিপি করার ব্যাপারটি ঠিক একই রকম। যা আছে তাই করবেন, একই পথে হেঁটে যাবেন, একঘেয়ে অবিরাম একটি যাত্রা।

বৃহৎভাবে, অনুভূমিক অগ্রগতি হচ্ছে বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন। বিশ্বায়নে যেমনটি হয়, বিশ্বের কোথাও একটি পদ্ধতি বা ব্যবস্থা যদি সেই জায়গার সমস্যা সমাধান করতে পারে তবে ধরে নেওয়া হয় যে সেই পদ্ধতি বা ব্যবস্থা সারা বিশ্বেও কাজ করবে। ধরুন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য ভালোভাবে কাজ করলো। এখন বলা হলো সারাবিশ্বের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তন করা হোক। এটাই হচ্ছে বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে চীন; তাদের আগামী ২০ বছরের পরিকল্পনা হচ্ছে আজকের আমেরিকার মতো হবে। চীনারা এই পরিকল্পনা নিয়ে খুব দ্রুত ও সরাসরি এগিয়ে চলছে, সবকিছু নকল করে যাচ্ছে, যা কিছু উন্নয়নশীল বিশ্বের দরকার তাও নকল করে দিচ্ছে : উনিশ শতকের রেল ব্যবস্থা, বিশ শতকের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, এমনকি পুরো এক শহরেরও নকল করে ফেলেছে। এতে করে তারা হয়তো কয়েক ধাপ বাদ দিয়ে উপরে উঠছে–ল্যান্ডলাইন বাদ দিয়ে ওয়্যারলেসে চলে গেছে। আপাতত দৃষ্টিতে এটা দেখতে যেমনই হোক না কেন–তারা কিন্তু সবকিছু নকলই করে যাচ্ছে।

এবার বলি উলম্ব বা প্রগাঢ় অগ্রগতির কথা। ০ থেকে ১ এ যাবে যে অগ্রগতি তা হচ্ছে প্রযুক্তি। এই একটি শব্দ যা বিশ্বকে বদলে দিয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির যে অসামান্য অবদান গড়ে উঠেছে তার কারণ সিলিকন ভ্যালি। সিলিকন ভ্যালির মূলধন হচ্ছে 'প্রযুক্তি'। এখন প্রযুক্তি বলতে যে কম্পিউটারের মধ্যেই আটকে থাকতে হবে তা নয়। প্রযুক্তি মানে কোনো জিনিস বা কোনো কাজ করার জন্য নতুন ও উত্তম পন্থা সৃষ্টি করা।

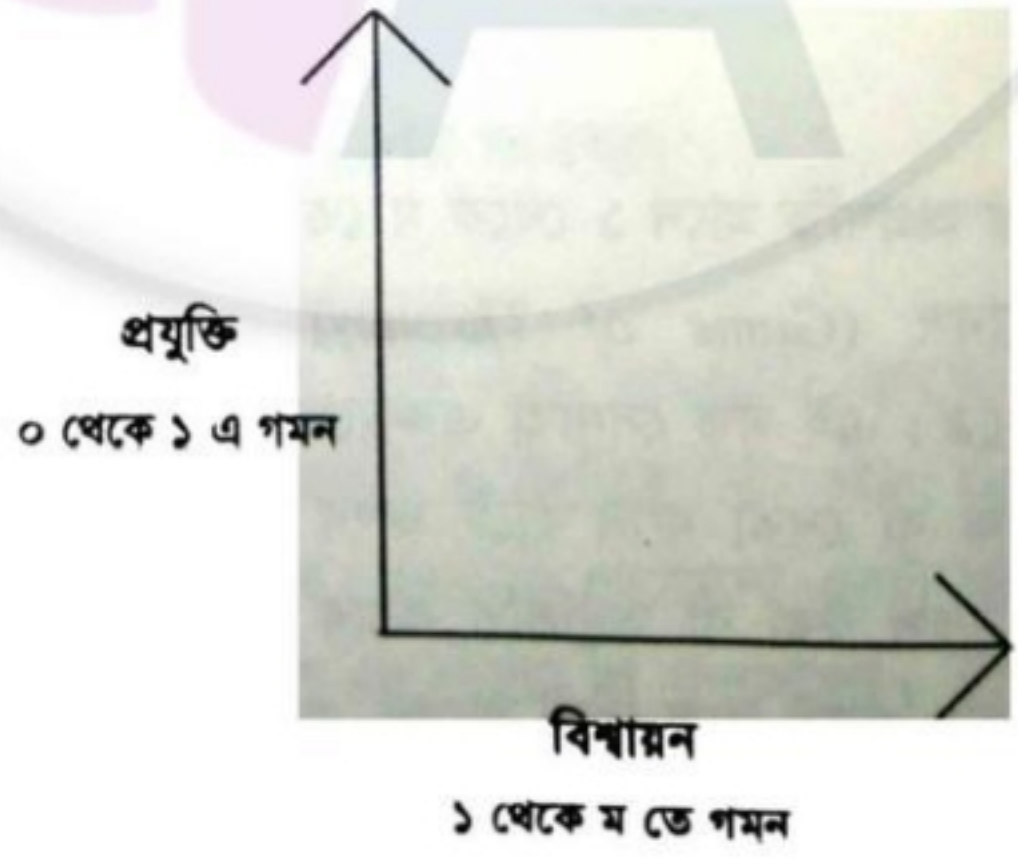

এখন বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তি যেহেতু অগ্রগতিরই ভিন্ন ভিন্ন দিক সেহেতু উভয়ই ঘটা সম্ভব। আবার যেকোনো একটি ঘটতে পারে অথবা কোনোটিই ঘটবে না এমনও হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৮১৫ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত একশ বছরে প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের দ্রুত অগ্রগতি ঘটেছে। আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি ঘটেছে, তবে বিশ্বায়নের গতি ততটা দ্রুত হতে পারেনি। এরপর ১৯৭১ সালের পর থেকে দ্রুত বিশ্বায়ন ঘটেছে। আর সাথে ছিল অল্প কিছু প্রযুক্তি। যার বেশিরভাগই আমরা দেখেছি তথ্য প্রযুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আজকের বিশ্বায়নের যুগে আগামী দশক কেমন হবে তা অনুমান করা খুব সহজ হয়ে পড়েছে। সামনে কেবল একই রকম জিনিস দেখা যাচ্ছে। এমনকি অনেকেই বলে যে প্রযুক্তির ইতিহাসও শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। এখন কী করার! বর্তমানে বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত। [এক উন্নত দেশ, যারা সবকিছু উদ্ভাবন করে ফেলেছে। আর এক উন্নয়নশীল দেশ, যারা উন্নত দেশ থেকে প্রযুক্তি নকল করার ধান্ধায় আছে বা অপেক্ষায় আছে এই পথে কবে কীভাবে উন্নতি করবে।]

[কিন্তু আমার মনে হয় উন্নতি করার জন্য এটাই যে একমাত্র পথ তা সত্য নয়। উন্নতি করার জন্য এই পথ যথেষ্ট নয়। অনেকেই মনে করে বিশ্বায়ন দিয়ে পৃথিবীকে সংজ্ঞায়িত করা হবে, বেঁধে ফেলা হবে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ হচ্ছে বিশ্বায়ন। হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। এ ধরনের বৈপরীত্যমূলক প্রশ্নের জন্য আমার উত্তর হচ্ছে পৃথিবীর কি ভবিষ্যৎ বিশ্বায়ন, আসলে তা নয়। সত্য হচ্ছে এর ঠিক বিপরীত। বিশ্বায়নের চেয়ে প্রযুক্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারি। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ছাড়া যদি চীনারা তাদের জ্বালানি উৎপাদন দ্বিগুণ করে, তবে এর সাথে সাথে তারা বায়ু দূষণও দ্বিগুণ করবে। যদি ভারতের একশজনের একজন ব্যক্তিও আমেরিকার একজন ব্যক্তি ঠিক আজকের প্রযুক্তি দিয়ে যেভাবে বাস করে সেভাবে বসবাস শুরু করে, তবে তা পরিবেশের জন্য সর্বনাশা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। শীতপ্রধান দেশে ঘরকে উষ্ণ রাখার জন্য আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয় এবং চিমনি ব্যবহার করা হয় ধোঁয়া যাওয়ার জন্য। এখন এজন্য কি গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও ঘরের ভিতর আগুন জ্বালাতে হবে? প্রযুক্তি দরকার। কিন্তু তা নিজ নিজ

স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনায় উদ্ভাবন করতে হবে, নকল নয়। পুরাতন পথে সম্পদ অর্জন করতে যাওয়া মানে হট্টগোল সৃষ্টি করা, লুণ্ঠন ও বিধ্বংসী একটি ব্যাপার। এটা কখনো একজন ব্যক্তিকে ধনী করে তোলে না, করে জোতদার। এখন এমন একটি সময় চলছে যখন বিশ্বে সম্পদ অপর্যাপ্ত। সেখানে নতুন প্রযুক্তি ব্যতীত বিশ্বায়ন ধোপে টিকবে না।

আসুন এবার আমরা একটু বিশ্ব ইতিহাসের দিকে তাকাই। আপনি দেখবেন যে ইতিহাসে কখনো নতুন প্রযুক্তি আপনাআপনি উদয় হয়নি। আমাদের আদিপুরুষদের অবস্থা ছিল স্থিতিশীল। সভ্যতার শুরুতে তারা কেবল অন্যদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়াকে সাফল্য বলে চিন্তা করতো। তারা সম্পদ আহরণের নতুন নতুন উৎস খুব কমই আবিষ্কার করেছে। এতে করে প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ বেশিদিন বাঁচতে পারেনি। তারপর ১০,০০০ বছর কেটে গেল। বন জঙ্গলের খাবার সংগ্রহের পর এলো পরিকল্পিত কৃষি ব্যবস্থাপনা, ষোড়শ শতকের জ্যোতির্বিদ্যা। তারপর হঠাৎ আধুনিক বিশ্বে এসে তারা নানাবিধ নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে সভ্যতার মোড় ঘুরিয়ে দিলো। ১৭৬০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত বাষ্প ইঞ্জিন থেকে শুরু করে মাইক্রো প্রসেসরের উদ্ভাবন ঘটলো। ফলাফল, আমরা পূর্বের যেকোনো সমাজ থেকে বেশি সম্পদশালী হয়ে উঠলাম।

এবার আসি পূর্ববর্তী দুই প্রজন্মের কথায়। আমাদের বাবা ও দাদার প্রজন্ম, ১৯৬০ সালের পূর্বের কথা। তারা আশা করেছিল যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে। তারা সপ্তাহে চারদিন কাজ করার আশা করতো, জ্বালানী শক্তি খুব সস্তা হবে এবং চাঁদে ছুটি কাটানোর আশা করতো। কিন্তু সে আশায় গুঁড়ে বালি। স্মার্টফোন আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। এমনকি আমাদের চারপাশের জিনিসগুলো যে পুরানো হয়ে গেছে সেটা পর্যন্ত আমরা ভুলে গেছি। কেবল কম্পিউটার ও তথ্য যোগাযোগে কিছু উন্নতি হয়েছে। তার মানে এই নয় যে, আমাদের অভিভাবকরা একটি উত্তম ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পারেনি–ভুলটা হয়েছে–তারা আশা করেছে সবকিছু আপনাআপনি হবে। নিজ থেকে বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিছু হয় না, নিজে করে দেখাতে হয়। আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি সৃষ্টি করা যা একুশ শতককে বিংশ শতকের

চেয়ে আরও শান্তিপ্রিয় ও সমৃদ্ধ করবে। (নতুন নতুন প্রযুক্তি সৃষ্টি করা মানে কেবল কম্পিউটারের নতুন সফটওয়্যার বা এন্ড্রোয়ডের নতুন অ্যাপ সৃষ্টি করা নয়। যেকোন ক্ষেত্রে : কৃষিক্ষেত্রে, পোশাকশিল্পে, বিক্রয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, আর্থিক ক্ষেত্রে বা আপনার নিজ গ্রামে এমন কোন নতুন উদ্যোগ যা জনগণের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করে, এমন প্রভৃতি উদ্যোগকে সৃষ্টির ব্যাপারে বলা হয়েছে।)

নতুন উদ্যোগের চিন্তা

নতুন প্রযুক্তি আসবে নতুন নতুন উদ্যোগ থেকে, নতুন কোন কাজে ঝুঁকি নেওয়া থেকে। আজকের বড় বড় রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান রয়েল সোসাইটি পর্যন্ত সব উদ্যোগই একদিন ছোট্ট একদল লোক গ্রহণ করেছিল, যারা বিশ্বকে পরিবর্তন করে আরও উন্নত করার তাগিদ থেকে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। সহজভাবে বললে এটা কিছুটা নেতিবাচক শোনাবে–বড় বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করে কোন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করা কঠিন, আর যদি আপনি নিজে করতে যান সেটা আরও কঠিন। আমলাতান্ত্রিক কাঠামো সর্বদাই ধীরে চলে, আর যেখানেই একটু ঝুঁকি দেখেছে সেখানেই দাঁড়িয়ে গেছে। আবার একজন ব্যক্তি মেধাবী হলে একটি কাজ চমৎকার ভাবে করতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো তার পক্ষে কঠিন। ঠিক এই জায়গায় একজন উদ্যোক্তার আগমন। একজন উদ্যোক্তা যে নীতির ওপর কাজ করে তা হচ্ছে *কাজ করতে গেলে আপনাকে অন্যদের সহযোগিতা নিতে হবে, কিন্তু আপনাকে দলটিকে ছোট করে রাখতে হবে যাতে আপনি নিজে কাজ করার সুযোগ পান ও কাজ করেন*।

একটি উদ্যোগ হচ্ছে আপনি যে একটি ভিন্ন ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে যাচ্ছেন সেই পরিকল্পনার ওপর অনেক লোকজনের বিশ্বাস তৈরি করা। একটি নতুন কোম্পানির সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে নতুন ধরনের চিন্তা। দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়ার চেয়েও এটা গুরুত্বপূর্ণ। ছোট ছোট কাজই কিন্তু আপনাকে চিন্তা

করার সুযোগ দেয়। এই বই হচ্ছে আপনি যখন একটি নতুন জিনিস নিয়ে ব্যবসা শুরু করবেন তখন ব্যবসাটিতে সফল হতে কী কী প্রশ্ন ও উত্তর জানতে হবে তা নিয়ে। এখানে কেবল পরিসংখ্যান থেকে তথ্য উঠিয়ে দেওয়া হয়নি বা গল্প বলা হয়নি; বরং আপনাকে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ একটি উদ্যোগ নিতে গেলে এটাই করতে হয় : প্রশ্ন করলে নতুন নতুন বুদ্ধি পাওয়া যায় এবং ব্যবসাটিকে তার আরম্ভস্থল থেকে পুনরায় চিন্তা করা যায়।

Audilua.com
Digital University

দুই

আনন্দ করুন যেন ১৯৯৯ সাল

আমাদের বৈপরীত্যমূলক প্রশ্ন–'এমন কোন কোন সত্য বিষয় আছে যাতে খুব কম লোকজনই আপনার সাথে একমত হয়?' এটার উত্তর সরাসরি দেওয়া হয়তো একটু কঠিন। তাই আরেকটু সহজ প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ করি : কীসে সবাই একমত হয়? ফ্রেডরিখ নিৎশে বলেছেন, 'একলা ব্যক্তির মধ্যে পাগলামি বিরল–কিন্তু দলবদ্ধভাবে, গোষ্ঠীগত, জাতি ও একই বয়সীদের মাঝে এটাই নিয়ম।' (তিনি অবশ্য নিজে পাগল হওয়ার আগে একথা বলে গেছেন।) যদি আপনি এমন কোন ভ্রমাত্মক বা ত্রুটিপূর্ণ জনপ্রিয় বিশ্বাস খুঁজে পান, তবে আপনি এর পিছনের সত্যটিও খুঁজে পাবেন : তাই বৈপরীত্যমূলক সত্য।

এবার একটি সহজ তত্ত্ব নিয়ে আলাপ করি : যেকোনো কোম্পানি অর্থ আয় করে বলে বেঁচে থাকে, অর্থ হারালে নয়। এটাই তো যেকোন ব্যক্তির কাছে যৌক্তিক বলে মনে হবে, তাই না? কিন্তু এর বিপরীতও আছে। ১৯৯০ সালের দিকে ঠিক এ কথাটাই তার যৌক্তিকতা হারায়। তখন এমন একটা সময় গেছে যখন লোকজন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য কোনো ক্ষতিকেই ক্ষতি মনে করত না। এই সামাজিক তত্ত্বের নাম 'নতুন অর্থনীতি' বা 'ইন্টারনেটের যুগ'। যখন লাভ-ক্ষতির হিসাবের চেয়ে অনেক বড় হয়ে দেখা দিলো পেইজ ভিউ, মানে কোম্পানির অনলাইন ওয়েবসাইট কতজন দেখছে। এই সামাজিক ধারা, গতানুগতিক বা প্রচলিত তত্ত্বে পুরো ব্যবসায়িক জগৎ মোহিত ছিল।

প্রচলিত এসব তত্ত্ব বা সামাজিক বিশ্বাসগুলো উদয় হয় যখন আমরা অতীতের দিকে ভুল দৃষ্টিকোণে তাকাই। আর যখন এ বিশ্বাস ভেঙে পড়ে তখন আমরা অর্থনীতির ভাষায় বলি, 'পুরাতন বিশ্বাসটি ছিল একটি বুদবুদ।' কিন্তু এর ফলে যে ক্ষতি হয় তার রেশ সহজে কাটে না। নব্বই দশকে ইন্টারনেটের প্রতি যে অতিমাত্রার ঝোঁক এবং এই বুদবুদের ফলে যে ব্যবসায়িক বিপর্যয় তা ১৯২৯ সালের পর সবচেয়ে বড় শেয়ারবাজার বিপর্যয়। আর এই পতনের ফলে আমাদের চিন্তার মধ্যে এমন হতাশা ও বিকৃতি ঢুকেছে যে, আমরা আর নতুন প্রযুক্তির চিন্তাই করতে পারছি না। যাইহোক, পরিষ্কারভাবে চিন্তা করার প্রথম ধাপ হচ্ছে নিজেকে জিজ্ঞেস করা যে, আমরা অতীত সম্পর্কে কতটুকু জানি।

নব্বই দশকের ইতিহাস

১৯৯০ সাল। একটি চমৎকার সময় ছিল। আমরা তখন চিন্তা করতাম ইন্টারনেটের যুগ একটি সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎ নিয়ে শেষ হবে। কিন্তু সেই বছরগুলো ততটা আনন্দদায়ক ছিল না যতটা আমরা আশা করেছিলাম। ডটকম (.com) এর অতিমাত্রার ঝোঁক শেষ হয় নব্বই দশকের শেষের দিকে। আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম যে জোয়ারের পরে ভাটা আসে।

নব্বই দশকের শুরুটা হয় ভালো একটি ঘটনা দিয়ে, বার্লিন প্রাচীর ভাঙা হচ্ছে। জার্মানির পশ্চিম বার্লিন ও পূর্ব বার্লিন একত্র হচ্ছে। কিন্তু ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকায় মন্দা দেখা দেয়। যদিও তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে মন্দা শেষ হবার ঘোষণা আসে, তবুও মন্দা পুরোপরি কাটেনি। কর্মসংস্থানের অভাব দেখা দেয়। যা জুলাই ১৯৯২ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। কারখানার উৎপাদন কমতে থাকে, সময়মতো কাজ হয় না, সেবার মান হ্রাস পেতে থাকে।

১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল কাটে প্রচণ্ড এক অস্থিরতার মধ্যে। সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে আমেরিকার সৈন্যরা মারা পড়ে। সংবাদপত্রে কেবল তাদের মৃত্যুর সংবাদ। বিশ্বায়ন ও আমেরিকার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের

কারণে আমেরিকার জনগণ ভীত হয়ে পড়ে এবং কাজ চলে যায় মেক্সিকোতে। এই হতাশার ছাপ পড়ে রাজনীতিতে। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে রোস পেরোট প্রায় ২০% ভোট পায় যা যুক্তরাষ্ট্রে গত ৮০ বছরেও ঘটেনি। এটা আর যাইহোক আশা ও আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ নয়।

সিলিকন ভ্যালির গতিও মন্থর হয়ে পড়ে। সেমিকন্ডাকটর যুদ্ধে দেখা যায় জাপান এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯২ পর্যন্ত তো ইন্টারনেট চালানো বন্ধই ছিল। কারণ একদিকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা ছিল এবং অন্যদিকে গ্রাহকদের জন্য সহজে ব্যবহারযোগ্য কোন ইন্টারনেট ব্রাউজার ছিল না। আমি যখন স্ট্যানফোর্ডে ঢুকি, তখন ১৯৮৫ সাল। তখন কম্পিউটার বিজ্ঞানের চেয়ে অর্থনীতি ছিল অনেক জনপ্রিয় পাঠ্য বিষয়। কম্পিউটার প্রযুক্তির ক্ষেত্রটিকে তখন অনেকটা কিম্ভূতকিমাকার রূপে দেখা হত। এমনকি অবিশ্বাসের সুরে এটাকে পাগলামি বলতেও অনেকে দ্বিধাবোধ করেনি।

তবে ইন্টারনেটই সবকিছুকে বদলে দেয়। ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে বের হয় মোজাইক ব্রাউজার। এটা ব্যবহার করা ছিল পূর্বের তুলনায় অনেক সহজ। এরপর ১৯৯৪ সালে মোজাইকের নাম পরিবর্তন হয়ে আসে নেটস্কেপ। নেটস্কেপের উন্নত সংস্করণের কারণে এটা খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে নেটস্কেপ ব্রাউজার মার্কেটের ২০ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ বাজার জায়গা দখল করে নেয়। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে নেটস্কেপ পুঁজিবাজারে প্রাথমিক গণপ্রস্তাব বা আইপিওর মাধ্যমে প্রবেশ করে, যদিও তখন এটি মুনাফাজনক ছিল না। মাত্র পাঁচ মাসে নেটস্কেপের শেয়ার দাম ২৮ থেকে লাফিয়ে ওঠে ১৭৪ এ গিয়ে পৌঁছায়। কম্পিউটার প্রযুক্তি অন্যান্য কোম্পানিও এগিয়ে যাচ্ছে। ইয়াহু পুঁজিবাজারে প্রবেশ করে ১৯৯৬ সালে, কোম্পানির বাজার দর ছিল ৮৪৮ কোটি টাকা। আমাজনও একই পথ অনুসরণ করে। ১৯৯৭ সালে ৪৩৮ কোটি টাকা বাজার দর নিয়ে পুঁজিবাজারে প্রবেশ করে। ১৯৯৮ সালে গিয়ে প্রতিটি কোম্পানির দাম বেড়ে যায় চারগুণ। ইন্টারনেট বিহীন কোম্পানিগুলোর চেয়ে এগুলোর আয় ও রাজস্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সংশয়ীরা প্রশ্ন তোলে, পুঁজিবাজার পাগল হয়ে গেছে।

যদিও পুঁজিবাজার দেখে তাই মনে হচ্ছিল, কিন্তু এর গভীরে আরও কিছু ছিল। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান অ্যালান গ্রিনসপান এ ব্যাপারে সতর্ক করেন যে, 'অযৌক্তিক উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাস হয়তো সম্পদের মূল্য অযথা বৃদ্ধি করবে।' কম্পিউটার প্রযুক্তিতে বিনিয়োগকারীরা একটু বেশিই উদ্দীপ্ত ছিল, তবে এটাকে ঠিক অযৌক্তিক আচরণ বলা চলে না। সামনে যখন সহজে মুনাফা করার মতো জায়গা পড়ে আছে তখন সারাবিশ্বে কী হচ্ছে তা কে দেখতে যায়।

পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয় ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে। গোষ্ঠী পুঁজিবাদ ও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণের কারণে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ায় এ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে। বিপর্যয়ের হাওয়া লাগে রাশিয়ার বাজারেও। ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসে রাশিয়ার অর্থনৈতিক বাজারে বিপর্যয় দেখা দেয়। তখন রাশিয়ার পরিস্থিতি এমন যে, দেশে টাকা নেই অথচ পারমাণবিক বোমা আছে ১০,০০০। এসব দেখে আমেরিকান বিনিয়োগকারীরা ঘাবড়ে যায়। ডো জোনস নামক শিল্প কারখানাভিত্তিক পুঁজিবাজার মাত্র দিন কয়েকের ব্যবধানে ১০ শতাংশ পড়ে যায়।

এমন অবস্থায় লোকজন উদ্বিগ্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। রাশিয়ার এই অর্থনৈতিক সংকটের কারণে আমেরিকার একটি প্রকাণ্ড অর্থ তহবিল–দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। এই তহবিল ১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে ৪ হাজার ৬০০ কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের আরও ১ লাখ কোটি টাকা বাঁচানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সহায়তা করে। ইউরোপের অবস্থাও খুব একটি ভালো যাচ্ছিল না। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে ইউরো মুদ্রা ছাড়া হয়। প্রথমে এটা ১.১৯ তে ওঠে। কিন্তু মাত্র দুই বছর পরেই ০.৮৩ এ নেমে আসে। জি৭ নামক সাতটি শিল্পোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো মিলে ইউরোর পতন ঠেকাতে লাখ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে।

এদিক দিয়ে ডটকমের একটি উন্মাদনা আরম্ভ হয়েছে। আবার বিশ্বায়নের প্রভাব। পুরাতন ব্যবসায়িক কাঠামো বিশ্বায়নের ধাক্কা সামলে উঠতে পারছিল না। কিছু একটা করা দরকার, যদি আমরা ভবিষ্যৎকে সমুন্নত দেখতে চাই তবে পাকা

একটি রাস্তা দরকার যা কাজ করে। যদিও পোক্ত প্রমাণ ছিল না তবুও দেখা যাচ্ছিল নতুন অর্থনীতির জন্য ইন্টারনেটের পথ ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

উন্মাদনা : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ - মার্চ, ২০০০

ডটকম সম্পর্কিত উন্মাদনা খুবই গাঢ় ও গভীর ছিল। কিন্তু এটা খুব অল্প সময়ই লোকজনকে মোহাচ্ছন্ন করতে পেরেছিল। এটা স্থায়ী ছিল সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ থেকে মার্চ ২০০০ সাল পর্যন্ত, আঠারো মাস ব্যপী। সিলিকন ভ্যালি একটি স্বর্ণের খনিতে পরিণত হলো। সব জায়গায় কেবল টাকা আর টাকা। প্রাচুর্যের কোনো অভাব নেই। যারা অদক্ষ তারাও ছুটছে। প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন ডজনখানেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে, ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে। (পণ্য দেখানোর নাম নেই, কেবল কোম্পানির নাম আর ডটকম দিয়েই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান চলছে।) কাগুজে কোটিপতিরা লাখ টাকা এসব অনুষ্ঠানেই খরচ করছে। তাদের কোম্পানির শেয়ার বিক্রয়ের চেষ্টা করছে, কিছু কিছু সময় এটা কাজও করছে। ঝাঁকে ঝাঁকে লোকজন তাদের ভালো বেতনের চাকরি ছেড়ে উদ্যোগ নেওয়া আরম্ভ করলো। (যেমনটি এখন বাংলাদেশে আরম্ভ হয়েছে।) আমি এমন একজনকে চিনতাম, যিনি তার চল্লিশ বছর বয়সে স্নাত্মক পাশ করেছেন এবং ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন। সাধারণত একসাথে এতগুলো কোম্পানি চালানো একটি অযৌক্তিক ব্যাপার।

কিন্তু নব্বই দশকের লোকজন (আমেরিকার জনগণ) চিন্তা করতো বিজয়ী হওয়ার জন্য অলরাউন্ডার হতে হবে। মানুষের বোঝা উচিত ছিল উন্মাদনারও একটা শেষ আছে। লোকজন ব্যবসার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি বের করলো, যাতে করে অনেকে টাকা হারালো, আবার কিছু টাকা আয়ও করলো। এখন লোকজনকে দোষ দিয়ে কী লাভ, গান যখন বাজবে তখন মন তো নাচবেই। অযৌক্তিকতাই তখন যৌক্তিক হয়ে পড়েছিল। আপনার নামের শেষে একটি '*.com*' আপনার মূল্য রাতারাতি বাড়িয়ে দিবে। তাহলে কী আর অপেক্ষা করা যায়?

ডটকম বিস্তৃতি

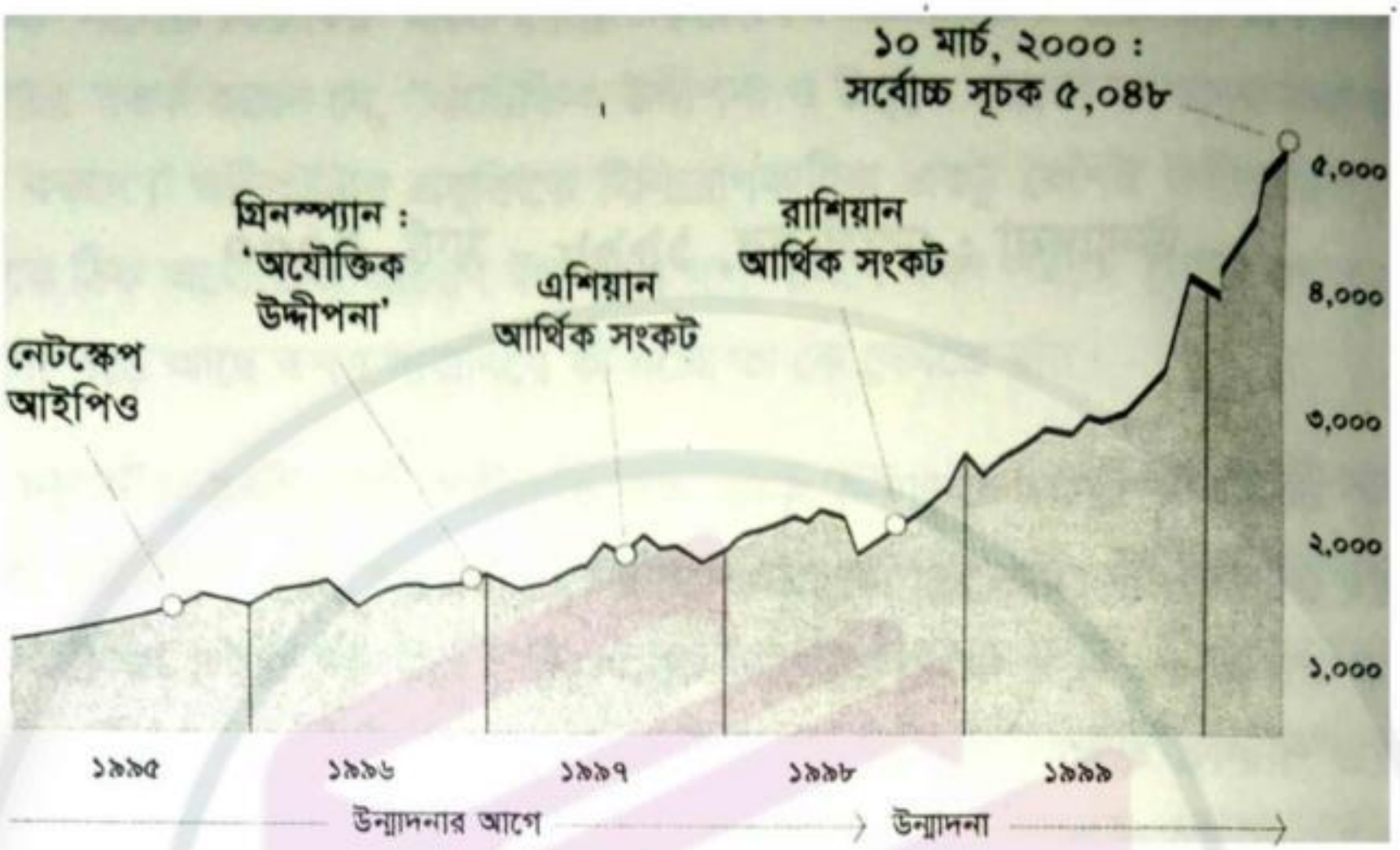

পেপাল (Paypal) উন্মাদনা

১৯৯৯ সালে যখন আমি পেপাল কোম্পানি চালাই, তখন আমি খুব আতঙ্কিত। আমি আমাদের কোম্পানিতে অবিশ্বাস করি এমন নয়; বরং আতঙ্কিত ছিলাম ... লোকজন তখন যেকোন কিছুতে বিশ্বাস করতে রাজি। সব জায়গায় লোকজন নতুন নতুন কোম্পানি খুলছে আর হুট করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় লাফ দিচ্ছে। ব্যাপারটি ছিল ভয়ানক। একবার আমার এক বন্ধু জানালো সে কীভাবে ঘুম থেকে উঠেই তার কোম্পানিকে শেয়ার বাজারে ছাড়বে বলে তার পরিকল্পনা করেছিল। অথচ তখনও সে কোনো ধরনের কোম্পানিই চালু করেনি। আর সে এটাকে পাগলামি বলেও চিন্তা করছিল না। পরিস্থিতি তখন এমন সুস্থমস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনাই ছিল অদ্ভুত।

যাইহোক, এদিক থেকে পেপাল ছিল একটি রূপকল্প বিশিষ্ট কোম্পানি। যার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। অবশ্য এজন্য তখনকার দিনে আমাদের অনেক সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। আমাদের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল–এমন একটি

নতুন ইন্টারনেট আর্থিক ব্যবস্থা চালু করা যা ইউএস ডলারকে মাত দিবে। মানে কাগজের টাকার বদলে ইন্টারনেটের অর্থ ব্যবহার হবে। আমাদের প্রথম পণ্য ছিল পাম পাইলট, যার দ্বারা লোকজন একে অপরকে টাকা পাঠাবে। যাইহোক, আমাদের পণ্যটি তখন কেউ ক্রয় করেনি, কেবল কিছু সাংবাদিক ছাড়া, যারা পত্রিকায় প্রতিবেদন দেয় যে, এটি ১৯৯৯ সালের সেরা দশ ব্যর্থ উদ্যোগের একটি। পাম পাইলট ছিল মোবাইলের মতো একটি ছোট্ট যন্ত্র, যাতে অর্থ লেনদেন করা যেত। (আজকে বাংলাদেশে বিকাশ যে কাজটি করছে অনেকটা সেরকম।) কিন্তু তখনকার দিনে (১৯৯৯ সালে) পাম পাইলট খুবই অদ্ভুত কিছু। কিন্তু ইমেইলের সুবিধা আবার লোকজন সানন্দে গ্রহণ করেছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে ইমেইলের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের একটি ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।

১৯৯৯ সালের শেষের দিকে আমাদের ইমেইল সেবা বেশ ভালোই চলছিল। যেকেউ যেকোন কম্পিউটার দিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অর্থ লেনদেন করতে পারে। কিন্তু আমাদের যথেষ্ট গ্রাহক ছিল না। অগ্রগতি খুব ধীরে হচ্ছিল। খরচ বেড়ে যাচ্ছিল। আমাদের যদি মুনাফা করতে হয় তবে আমাদেরকে কমপক্ষে দশ লক্ষ গ্রাহক যোগাড় করতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়েও কাজ হচ্ছিল না। আর বিজ্ঞাপনের খরচও অনেক বেশি পড়ে যাচ্ছিল। বড় বড় ব্যাংকের সাথেও কাজ করা যাচ্ছিল না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম পেপালের গ্রাহক হওয়ার জন্য, নিবন্ধিত হওয়ার জন্য লোকজনকে টাকা দিবো।

পেপালে যারা নতুন নিবন্ধিত হবে আমরা তাদেরকে ৮০ টাকা করে দিবো। আর কারও বন্ধু বা পরিচিত কেউ যদি তার নাম সুপারিশ করে তবে তাকেও ৮০ টাকা করে দেওয়া হবে। এতে করে আমরা হাজার হাজার গ্রাহক পেয়ে গেলাম। একেই বলে সূচকীয় অগ্রগতি। যদিও কৌশলটি সস্তা ছিল না। আর এতে যে নির্ভরযোগ্য গ্রাহক পাওয়া যাবে তারও নিশ্চয়তা নেই। তবুও আমরা গ্রাহক তো পাচ্ছি। আর খরচের কথা বলতে গেলে, তখন সিলিকন ভ্যালিতে এমন বড় বড় অংকের খরচ হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। তাছাড়া বিজ্ঞাপনে আমরা যা খরচ করতাম তা আমরা লোকজনের প্রতি খরচ করেছি। আমরা চিন্তা করলাম লোকজন থেকেই

তো আমরা আয় করবো, তাহলে তাদের পিছনে ব্যয় করাটাই যৌক্তিক হবে।

পেপালকে যদি একটি লাভজনক কোম্পানিতে পরিণত হতে হয় তবে আমাদের আরও বিনিয়োগ দরকার। এটা আমরা জানতাম। আমরা এটাও অনুভব করলাম যে, শেয়ার বাজারের আজকে যে ঊর্ধ্বগতি তা আর বেশিদিন থাকবে না। আমাদের কিছু একটা করতে হবে। বাজার ধসের আগেই বিনিয়োগ ওঠাতে হবে এবং দেখাতে হবে যে আমাদের কোম্পানি বিপর্যয়কালীন সময়েও গ্রাহকদের ভালোভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ২০০০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় পেপাল একটি উদীয়মান কোম্পানি এবং এর মূল্য প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। এই প্রতিবেদনটি আমাদের জন্য সুফল বয়ে আনে। পরবর্তী মাসেই আমরা ১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ পাই। অবস্থা তখন এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, কোন ধরনের চুক্তি বা কাগজপত্র ছাড়াই একটি দক্ষিণ কোরিয়ান ফার্ম আমাদেরকে ৫ কোটি টাকা পাঠায়। আমরা কিছু বলার আগেই এই ঘটনা ঘটে। পরে আমি যখন তাদেরকে টাকা ফেরত দিতে যাব, কারণ আমাদের আপাতত আর টাকার দরকার নেই, তখন তারা ফেরত দেওয়ার ঠিকানাও দিচ্ছিল না। ২০০০ সালের সেই মার্চ মাসেই আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে নিলাম। পেপালকে একটি সফল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে আমাদের আর্থিক যে প্রয়োজন ছিল তা মিটে গেল। আমরা সবেমাত্র চুক্তি ও কাগজপত্র শেষ করেছি, আর তখনই শেয়ার বাজারের ঊর্ধ্বগতির সেই বুদবুদটি ফেটে পড়লো।

যে শিক্ষা শিখলাম

নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ ২০০০ সালের মার্চ মাসে পৌঁছল ৫,০৪৮ সূচকে এবং এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে এসে পড়লো ৩,৩২১ সূচকে। অবশেষে ২০০২ সালের অক্টোবরে এসে ঠেকলো ১,১১৪ সূচকে। নব্বই দশকে বাজারে যে প্রযুক্তিগত উচ্চাশা তৈরি হয়েছিল তার বুদবুদ শেষ হলো সেইদিন। প্রচণ্ড লোভে উন্মত্ত সেই বাজার মুখ থুবড়ে পড়লো।

ডটকমের (.com) পতন

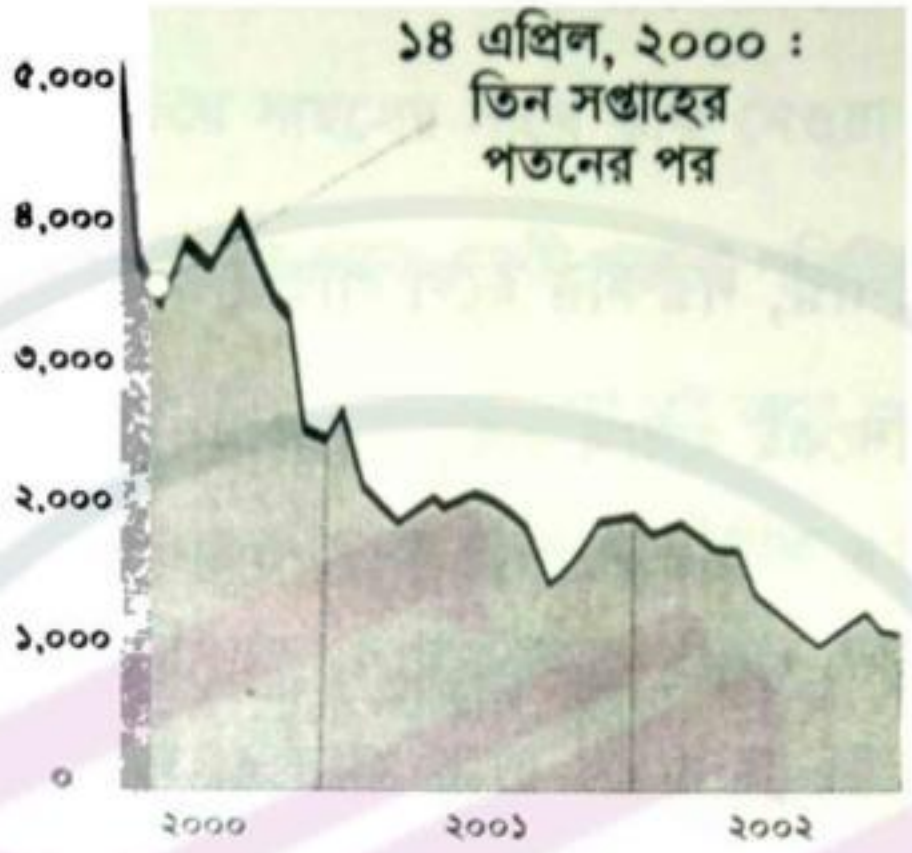

এবার সবাই ধারণা করে নিল যে, ভবিষ্যৎ আসলে অনির্দিষ্ট এবং বাৎসরিক পরিকল্পনার বদলে প্রতি তিন মাসে কী আসবে তা চিন্তা করতে লাগলো। ভবিষ্যতের আশা স্বরূপ প্রযুক্তির পরিবর্তে সবাই বিশ্বায়নের চিন্তা করতে লাগলো। নব্বই দশকে সবাই 'আবাসন থেকে কম্পিউটার' (Brick to Click) এ চলে গিয়েছিল। কিন্তু যেমনটি আশা করেছিল তেমনটি ঘটেনি। তাই বিনিয়োগকারীরা আবার আবাসন ব্যবসাতে ফিরে গেল, যা বিশ্বায়নেরই একটি অংশ। এবার নতুন বুদবুদ সৃষ্টি হলো আবাসন শিল্পে।

আর সিলিকন ভ্যালিতে যেসব উদ্যোক্তারা রয়ে গেল তারা ডটকম বিপর্যয় থেকে চারটি জিনিস শিখলো যা আজও আমাদের ব্যবসায়িক চিন্তাকে নির্দেশিত করে :

১. ক্রমবর্ধমান উন্নতি ঘটাতে হবে

অতিমাত্রার স্বপ্ন আসলে বুদবুদ তৈরি করে। যা কোনোমতেই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। কেউ যদি বলে আমি অনেক বড় কিছু করে ফেলবো তবে তা সন্দেহের

চোখে দেখতে হবে। আর কেউ যদি বলে আমি গোটা দুনিয়োকেই বদলে দিবো তবে তাকে আর বিনয়ী হতে হবে। সামনে যাওয়ার একমাত্র নিরাপদ পথ হচ্ছে ছোট ছোট পা ফেলা, নিয়মিত পথচলা।

২. প্রথমে একটু নমনীয়, দরকার হলে লাভহীন থাকো

প্রতিটি কোম্পানিকেই প্রথমে একটু জাঁকজমকহীন, চর্বিহীন মানে সাধারণ অবস্থায় থাকতে হবে। অতিরিক্ত কিছু করা যাবে না। আর যেকোনো সময় অপরিকল্পিত ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনি কখনো জানেন না সামনে আপনার ব্যবসা আপনার জন্য কী নিয়ে আসবে; তাই পরিকল্পনা করুন কিন্তু পরিকল্পনা মতোই যে সব হবে এমন নিশ্চয়তা নেই। পরিকল্পনাকে নমনীয় পর্যায়ে রাখুন। একই জিনিস বারবার করার চেয়ে নতুন কিছুর উদ্যোগ নিন। আপনি জানেন না এমন কিছু নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান।

Audilua.com

৩. বাজারের প্রতিযোগিতাকে উন্নত করুন

ধরেই নতুন বাজার সৃষ্টির চেষ্টা করবেন না। এটাকে অকালপক্ব আচরণ বলে। সত্যিকারের ব্যবসা বলতে বোঝায় যেই ধরনের পণ্যের গ্রাহক আছে। আপনাকে কেবল বিদ্যমান গ্রাহকদের আরও ভালো পণ্য দিতে হবে।

৪. পণ্যের ওপর মনোযোগ দিন, বিক্রয়ের ওপর নয়

যদি আপনার পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন বা বিক্রয়কর্মী দরকার হয় তবে এটা খুব একটা ভালো পণ্য নয়। প্রথমত, প্রযুক্তি মানে হচ্ছে পণ্যকে উন্নত করা; নাকি বিতরণ করা। বিজ্ঞাপনের পাহাড় তৈরি করে কোন লাভ নেই, এটা কেবল অপচয়। এজন্য কেবল টেকসই উন্নয়ন, ধীরে ধীরে প্রতিনিয়ত উন্নতি করে যাওয়াটাই হচ্ছে আসল অগ্রগতি।

উদ্যোক্তা বিশ্বে এই সূত্রগুলোই মূল নীতিতে পরিণত হয়েছে। আর যারা এগুলোকে মানতে অবহেলা করে তারা ২০০০ সালের মতো বিপর্যয় ডেকে আনে। তারপরেও এর বিপরীত নীতিগুলো হয়তো আরও বেশি টেকসই :

১. তুচ্ছ কাজ করার চেয়ে সাহসের সাথে ঝুঁকি নেওয়া ভালো।

২. কোন পরিকল্পনা না থাকার চেয়ে একটি খারাপ পরিকল্পনা থাকাও ভালো।

৩. প্রতিযোগিতামূলক বাজার মূলত মুনাফা নষ্ট করে।

৪. পণ্যের মান যতটা গুরুত্ব রাখে, বিক্রয়টাও ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ।

একথা সত্য যে, প্রযুক্তির যুগে একটি বুদবুদ ছিল, সেখানে অতি উচ্ছ্বাস বিদ্যমান ছিল। নব্বই দশকের সেই সময় ছিল ঔদ্ধত্যপূর্ণ। তখন লোকজন বিশ্বাস করতো ০ থেকে ১ এ তারা যেতে পারবে। অনেকেই সেই শিখরে পৌঁছাতে পারেনি যার কথা তারা বলতো। খুব কম কোম্পানিই শিকড় থেকে শিখরে পৌঁছেছে। আসলে ব্যাপারটি ছিল লোকজন বুঝতে পেরেছিল আমাদের আর কোন পথ নেই, আমাদেরকে এমন সব পথ সৃষ্টি করতে হবে যা পূর্বের তুলনায় আনকোরা। কারণ আমাদের সম্পদ কম। কম সম্পদ দিয়ে বেশি কাজ করতে হবে। এটা লোকজন ঠিকই বুঝেছিল। যদিও ২০০০ সালের মার্চ মাসের শেয়ার বাজারের যে সর্বোচ্চ সূচক সেটা আসলে উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো লোকজনের স্পষ্ট দূরদৃষ্টি ছিল। লোকজন দূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরে, তারা দেখতে পায় যে, ভবিষ্যতে তাদের নতুন নতুন প্রযুক্তি দরকার এবং আজকের এই পদক্ষেপই তাদেরকে সেখানে নিরাপদে পৌঁছে দিবে।

এখনও আমাদের কিছু টাটকা, সম্পূর্ণ নতুন কিছু প্রযুক্তি দরকার। হয়তো ১৯৯৯ সালের মতো কিছু ঔদ্ধত্য ও উদ্দীপনা দরকার তা পাওয়ার জন্য। আমরা যদি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কোম্পানিগুলোকে সৃষ্টি করতে চাই তবে ব্যবসায়িক বিপর্যয় বা শেয়ার বাজার ধসের পর যে তত্ত্বগুলো আমরা শিখেছি সেগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে। তার মানে এই নয় যে তত্ত্বগুলোর বিপরীত তত্ত্বই ঠিক। আসলে মূল জিনিসটি খুঁজে দেখতে হবে। ভয় পেয়ে কেবল এক

তত্ত্বে আটকে থাকা যাবে না। আবার আপনি যে বিপরীত পথে হাঁটলেই জানতার ভিড় থেকে বেঁচে যাবেন তা-ও নয়। এর পরিবর্তে আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন : গণমানুষের একটি ভুল প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যবসায়িক জগতের গতি কীভাবে পরিবর্তন হলো? একই প্রশ্ন একটু ভিন্নভাবে যদি বলি : কীভাবে গণমানুষের অতীতের কোনো একটি ভুল প্রতিক্রিয়ার ফলে আজকে ব্যবসায়িক জগতের গতি পরিবর্তন হচ্ছে? সবচেয়ে বৈপরীত্যমূলক জিনিস হচ্ছে ভিড়ের বিরোধিতা করা নয়; বরং নিজের জন্য চিন্তা করা।

Audilua.com

Audilua.com
Digital University

তিন

যেকোনো সফল প্রতিষ্ঠানই আলাদা

আমাদের বৈপরীত্যমূলক প্রশ্নের ব্যবসায়িক ধরনটি হচ্ছে : 'মূল্যবান এমন কোন কোম্পানি কেউ সৃষ্টি করছে না?' প্রশ্নটি যত সহজ মনে হয় আসলে ততটা সহজ নয়। কারণ অভিনব কোনো কোম্পানি সৃষ্টি করলেই হবে না, সেটাকে মুনাফাজনক প্রতিষ্ঠানেও পরিণত করতে হবে। আপনার প্রতিষ্ঠান অনেক সেবা দিতে পারে কিন্তু নিজের জন্য যথেষ্ট মুনাফা না-ও অর্জন করতে পারে। কেবল সমস্যার সমাধান করা বা সেবা প্রদান করাই যথেষ্ট নয়–আপনার নিজেকে বেঁচে থাকতে হলেও কিছু মুনাফা অর্জন করতে হবে।

এর মানে ব্যবসা অনেক বড় হলেও ব্যবসায় মন্দা ঘটতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলি ইউ.এস. আকাশ পথের ব্যবসা। এই পথে বহু কোম্পানি আছে যারা লাখো যাত্রীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা আয় করছে। কিন্তু ২০১২ সালে দেখা গেল, গড়ে প্রতি যাত্রীর ভাড়া ১৪,৫০০ টাকা অথচ একজন যাত্রী থেকে যাত্রা প্রতি মুনাফা হচ্ছে মাত্র ৩০ টাকা। এটাকে এবার গুগলের সাথে তুলনা করা যাক। গুগল আকাশ পথের বিমান কোম্পানিগুলো থেকে অনেক কম সেবা দিয়েছে। কিন্তু তার লাভের অঙ্ক বেশ বড়। গুগল ২০১২ সালে বিমান কোম্পানিগুলোর ১৬,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে ৫,০০০ কোটি টাকা আয়

করেছে, কিন্তু গুগল সেই আয় থেকে ২১% মুনাফা অর্জন করেছে। যা বিমান কোম্পানিগুলোর মুনাফার ১০০ গুণ বেশি। আর এখন তো গুগল যা টাকা আয় করে তা ইউ.এস. এর সব বিমান কোম্পানিগুলোরও তিনগুণ ছাড়িয়ে গেছে।

আকাশ পথের এই উড়োজাহাজ কোম্পানিগুলো একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে। আর গুগল ব্যবসা করে একা। অর্থনীতিতে এই পদ্ধতির একটি নাম আছে। প্রথমটি হচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে একচেটিয়া বাজার।

অর্থনীতিতে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার ব্যবস্থাকে একই সাথে আদর্শ বাজার ও ত্রুটিযুক্ত বাজার বিবেচনা করা হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাকে আদর্শ ধরা হয়। যখন উৎপাদক ও যোগান দানকারী গ্রাহকের পর্যাপ্ত চাহিদা পূরণ করে। এতে করে বাজারে একটি সাম্যবস্থা তৈরি হয়। এটি আবার একই সাথে ত্রুটিযুক্ত। কারণ আপনি থাকলেও যা, না থাকলেও তা। প্রতিটি কোম্পানি ঠিক একই পণ্য একই বাজারে বিক্রি করে যাচ্ছে। কোন বৈচিত্র্য নেই। যেহেতু কোন প্রতিষ্ঠানেরই এমন কোন মহাবল বা শক্তিশালী বল নেই যা সমগ্র বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে তখন একটি কোম্পানিকে বাজার দরেই বিক্রয় করতে হবে। এ কাজ করতে সে বাধ্য। অর্থ আয় করতে হলে কী করতে হবে? বাজারে নতুন কোম্পানি খুলবে, যোগান বাড়বে, দাম কমবে এবং মুনাফা কমে যাবে। যদিও সবাই তখন আপনার কোম্পানিকেই বিবেচনায় প্রথমে রাখবে। আর যদি অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান বাজারে প্রবেশ করে তবে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে, কিছু তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিবে এবং আবার পণ্যের দাম একটি টেকসই জায়গায় এসে স্থির হবে। এ ধরনের পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে, দীর্ঘমেয়াদে, কোন কোম্পানিই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের বিপরীতে আছে একচেটিয়া বাজার। যেখানে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের একটি কোম্পানি বাজার দরে জিনিস বেচতে বাধ্য, সেখানে একচেটিয়া ব্যবস্থার একটি কোম্পানিই তার বাজার। তাই সে নিজেই নিজের দাম ঠিক করতে পারে। যেহেতু তার কোন প্রতিযোগী নেই, সেহেতু সে পর্যাপ্ত পরিমাণ পণ্য তৈরি করতে পারে এবং দাম ঠিক করে নিজের মুনাফা বৃদ্ধি করতে পারে।

একজন অর্থনীতিবিদের কাছে একচেটিয়া সব ব্যবসাই সমান; এর প্রতিযোগীদের ধোঁকা দিয়ে বাজারের ক্ষতি করে, দেশের সরকার থেকে নিবন্ধনপত্র ও নানান সুযোগ সুবিধা নেয় বা ব্যবসায় ১ নম্বর বা শিখরে থাকার জন্য অভিনব কিছু উদ্ভাবন করে। এই বইয়ে আমরা একচেটিয়া বলতে অসাধু বা অবৈধ ব্যবসায়ীদের বোঝাচ্ছি না; বরং আমরা 'একচেটিয়া' বলতে এমন কোন কোম্পানিকে বোঝাচ্ছি যে প্রতিষ্ঠান তার পণ্য ও কাজে এতই দক্ষ, এতই অগ্রসর যে, তার আশেপাশের কোন কোম্পানিই এমন পণ্য ও সেবা গ্রাহকদের দিতে পারে না। এই ধরনের কোম্পানির খুব ভালো একটি উদাহরণ হচ্ছে গুগল; যেটা শিকড় থেকে শিখরে উঠেছে, মানে ০ থেকে ১ এ উঠেছে। এটি মাইক্রোসফট বা ইয়াহুর সাথে সেই ২০০০ সাল থেকে কোনো প্রতিযোগিতা করেনি। কিছু খোঁজার ব্যাপারে গুগল অনন্য এক কোম্পানি; মাইক্রোসফট ও ইয়াহু থেকে পুরোপুরি আলাদা, নতুন জায়গা সৃষ্টি করেছে।

প্রতিযোগিতা ও আমানতের ব্যাপারে আমেরিকান পুরাণশাস্ত্র আমাদেরকে সমাজতন্ত্র থেকে রক্ষা করেছে। আসলে পুঁজিবাদ ও প্রতিযোগিতা দুইটি বিপরীতমুখী। পুঁজিবাদের সূচনা ঘটে পুঁজি সংগ্রহ থেকে, আর পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সব মুনাফা তো প্রতিযোগিতা করতে করতেই চলে যায়। তাই এ থেকে উদ্যোক্তাদের জন্য শিক্ষাটা খুবই পরিষ্কার : যদি আপনি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সেবা দিতে চান এবং নিজের জন্য মুনাফা অর্জন করতে চান তবে কখনোই একই ধরনের ব্যবসা করবেন না বা একই ধরনের কোম্পানি সৃষ্টি করবেন না।

অসত্য কিছু কথা

বিশ্ব আসলে কতটা একচেটিয়া? কতটা পূর্ণ প্রতিযোগিতার? এটা আসলে বলা কঠিন। কারণ আমরা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে অনেক বেশি বিভ্রান্ত। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হয় সব ব্যবসা প্রায় একই রকম। তখন মনে হয় এদের মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য।

সাধারণ লোকজনের অনুমান বা ধারণা :
আম জাম প্রতিষ্ঠানগুলো সব একই রকম

প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা আরও বেশি জটিল। আসলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে বিস্তর ফারাক। আর বেশিরভাগ ব্যবসাগুলো যা চিন্তা করা হয় তা থেকে বহুদূরে।

বাস্তবতা হচ্ছে :
এক নয়, পার্থক্য অনেক বেশি গভীর

এই গড়বড় বা ভেবাচেকা পরিস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রতিযোগিতার কোম্পানি ও একচেটিয়া কোম্পানি উভয় ধরনের কোম্পানিই দায়ী। উভয় ধরনের কোম্পানিগুলো সত্যকে লুকানোর চেষ্টা করে এবং স্বপক্ষে প্রচার করে থাকে। তারা যা নয় তাই তারা প্রচার করে।

একচেটিয়া কোম্পানিগুলোর অসত্য তথ্যাবলি

একচেটিয়ারা নিজেদের রক্ষার জন্যই মিথ্যা বলে। তারা জানে তাদের আস্ফালন বা বেশি বাড়াবাড়ি তাদের ব্যবসার ক্ষতি করবে। এতে করে বিভিন্ন দিক থেকে তাদের প্রতি আঘাত আসতে পারে, জানা-অজানা নানান শত্রু সৃষ্টি হবে। যেহেতু একচেটিয়ারা চায় তাদের একচেটিয়া মুনাফায় যেন কোনো বাধা না পড়ুক, তাই তারা তাদের (অদৃশ ও অনুপস্থিত) প্রতিদ্বন্দ্বীদের দোহাই দেয়।

গুগলের কথাই চিন্তা করুন। গুগল কখনো দাবি করে না যে, তারা একচেটিয়া ব্যবসা করে। কিন্তু আসলে কী তাই? এখন দেখুন এটা নির্ভর করে কীসের ভিত্তিতে মাপা হয় তার ওপর। এখন যদি প্রশ্ন ওঠে : গুগল একচেটিয়া ব্যবসা করে কোন খাতে? তাহলে কিছু বলা যায়। ধরুন, আমরা গুগলকে একটি সার্চ ইঞ্জিন কোম্পানি হিসেবে ঠিক করলাম। ২০১৪ সালের মে মাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সার্চ মার্কেটের প্রায় ৬৮% বাজার গুগলের আয়ত্তে। (এটার ঘনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী মাইক্রোসফট ও ইয়াহু যথাক্রমে ১৯% ও ১০% বাজার জুড়ে আছে।) আর এটা যদি আপনার কাছে যথেষ্ট কর্তৃত্বপূর্ণ বলে মনে না হয় তবে এই

ব্যাপারটি চিন্তা করুন যে 'গুগল' শব্দটিকে অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানে ক্রিয়া হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। ভুলেও এটা চিন্তা করবেন না যে, মাইক্রোসফটের বিং (bing) সার্চ ইঞ্জিন নিয়েও এমন কিছু হতে পারে।

আবার ধরুন, যদি আমরা গুগলকে কেবল একটি বিজ্ঞাপন কোম্পানি হিসেবে বিবেচনা করি তবে তাতে কিন্তু চিত্রটি পুরোপুরি পাল্টে যায়। আমেরিকার সার্চ ইঞ্জিন বিজ্ঞাপনের বাজার হচ্ছে বাৎসরিক দেড় লাখ কোটি টাকার। আমেরিকার অনলাইন বিজ্ঞাপনের বাজার হচ্ছে বাৎসরিক ৩ লাখ কোটি টাকার। আমেরিকার পুরো বিজ্ঞাপনের বাজার হচ্ছে ১২ লাখ কোটি টাকার। আর সারা বিশ্বের বিজ্ঞাপনের বাজার হচ্ছে সাড়ে ৪১ লাখ কোটি টাকার। তাহলে গুগল যদি ইউ.এস. এর সার্চ ইঞ্জিন বিজ্ঞাপন বাজারে একচেটিয়া ব্যবসাও করে তবুও এটি সারা বিশ্বের বিজ্ঞাপন বাজারের কেবল ২.৪%ই দখল করতে পারছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে গুগল এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের ছোট্ট এক খেলোয়াড়।

Audilua.com

১ ডলার সমান ৮৩.৯ টাকা ধরে। সাড়ে ৪১ লাখ কোটি টাকা বুঝতে হয়ত একটু সময় লাগবে, তবুও চেষ্টা করুন। এতে করে চিন্তার যে সীমাবদ্ধতা তা দূর হবে।

এখন আমরা যদি গুগলকে বহুমুখী প্রযুক্তি বিষয়ক একটি কোম্পানি হিসেবে ধরি তাহলে কী দাঁড়ায়? আর এটার যৌক্তিকতাও আছে। গুগল সার্চ ইনজিনের পাশাপাশি অন্যান্য প্রযুক্তি নিয়েও কাজ করে। গুগল গোটা দশেক সফটওয়্যার পণ্য তৈরি করেছে; স্বয়ংক্রিয় গাড়ি, এন্ড্রয়েড মোবাইল, হাতঘড়িতে কম্পিউটার প্রভৃতি। কিন্তু গুগলের ৯৫% আয় আসে সার্চ বিজ্ঞাপন থেকে। গুগলের অন্যান্য সব পণ্য মিলে ২০১২ সালে আয় হয়েছে ২৩৫ কোটি টাকা। ভোগ্যপণ্য থেকে গুগলের আয় খুব কম। যেহেতু সারা বিশ্বে ভোগ্যপণ্যের বাজার হচ্ছে ৯৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকার। সেখানে গুগল আয় করতে পেরেছে কেবল ০.২৪% জায়গা, একচেটিয়া ব্যবসা তো বহুদূরের কথা। তাই এইভাবে গুগলকে যদি একটি প্রযুক্তি কোম্পানি হিসেবে ধরা হয় তবে গুগল সব ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত মনোযোগ থেকে বাঁচতে পারে।

অভিনব কিছু সৃষ্টি

গুগল মূলত একটি সার্চ ইঞ্জিন কোম্পানি। সার্চ ইঞ্জিন কী জিনিস? মানুষ তথ্য চায়। নানান ধরনের তথ্য, বিভিন্ন রকমের তথ্য। জানার শেষ নেই। এই অন্তহীন তথ্য খোঁজার সমস্যাটির সমাধান নিয়ে আসে গুগল। ১৯৯৬ সালে গবেষণা প্রকল্প হিসেবে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন পিএইচডি কোর্সের ছাত্র ল্যারি পেইজ ও সের্গেই ব্রিন এই প্রকল্পে কাজ আরম্ভ করেন। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আজকের এই বিশাল বহুজাতিক কোম্পানি গুগল ইনকর্পোরেটেড-এর সূচনা ঘটে একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। যদিও ১৯৯৬ সালের আগেও কিছু সার্চ ইঞ্জিন কোম্পানি ছিল, কিন্তু পেইজ ও ব্রিনের লক্ষ্য ছিল তখনকার কৌশলগুলোর চেয়ে *নতুন একটি কৌশলে* একটি সার্চ ইঞ্জিন বানানো, যাতে আরো ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। পাঠক আমি এই *নতুন একটি কৌশল* শব্দাবলির ওপর জোর দিতে চাই। এটাই হচ্ছে অভিনব কিছু সৃষ্টির চাবিকাঠি। গুগল একটি প্রকল্প হিসেবে চালু হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। ১৬ বছর পর ২০১১ সালে গুগলের আয় দাঁড়ায় ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকায়। ২০১১ সালে গুগল প্রতিমাসে ১০০ কোটি মানুষকে সেবা দিতে সক্ষম হয়।

(এবার বাংলাদেশি একটি কোম্পানির কথা বলি–বিডিজবস ডটকম।

কোম্পানিটি চালু হয় ২০০০ সালে। কোম্পানিটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উইকিপিডিয়ায় দুজনের নাম দেওয়া আছে–আহমেদ ইসলাম মুকসিত (চেয়ারম্যান) এবং একেএম ফাহিম মাশরুর (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা)। সদস্য সংখ্যা ১ লাখ ১০ হাজার। আমি নিজেও এক সময় চাকরি খোঁজার জন্য বিডিজবস এর সেবা গ্রহণ করেছি।

২০০০ সালের আগেও অনেক কোম্পানি ছিল যারা চাকরি খুঁজে দেওয়ার ব্যাপারে তথ্য দিত। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতারা খুঁজলেন *নতুন একটি কৌশল*। তারা অভিনব কিছু সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। যার ফলাফল বিডিজবস ডটকম। এরপর ব্যাঙের ছাতার মতো আরও অনেক প্রতিষ্ঠান এসেছে। পাঠক আপনি যদি শিকড় থেকে শিখরে উঠতে চান তবে নকল করা বাদ দিন। লেখক পিটার থিয়েলের দুইটি কথা আরেকবার চিন্তা করুন। আপনি নিশ্চয় অভিনব কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন।

ক : 'যদি আপনি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সেবা দিতে চান এবং নিজের জন্য মুনাফা অর্জন করতে চান তবে কখনোই একই ধরনের ব্যবসা বা উদ্যোগ নিবেন না, অথবা একই ধরনের কোম্পানি গঠন করবেন না।'

খ : 'মূল্যবান এমন কোন কোম্পানিটি কেউ সৃষ্টি করছে না?'

এবার দুইটি ব্যবসার উদাহরণ দিচ্ছি। যেগুলোকে উদ্যোগ বলে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। একজন ছাত্র, যিনি একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ পাশ করেছেন, তিনি উবার, পাঠাও এর মতো কাভার ভ্যান বা ট্রাক নিয়ে একটি সেবা দিতে চান। ট্রাকে মালামাল পরিবহনের সেবা। অনলাইনে অর্ডার নেওয়া হবে। মাত্র দুই বছরের মধ্যে একটি লাভবান কোম্পানি গড়ার পরিকল্পনা। মানুষের সমস্যা সমাধানে *নতুন একটি কৌশল* বা অভিনব কিছু সৃষ্টির চেয়ে যদি আপনার চিন্তা থাকে মুনাফার প্রতি তবে এটা কোন উদ্যোগ নয়। এটাকে উদ্যোগ বা স্টার্টআপ (startup) বলে দূষণ করবেন না।

আরেকজন ছাত্র, যিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ অধ্যয়নরত, তিনি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর একটি বই বিক্রয়ের দোকান দিয়েছেন। এই

তার উদ্যোগ। এজন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঁচ লাখ টাকা উদ্যোক্তা ঋণও পেয়েছেন। এই যদি হয় বাংলাদেশের উদ্যোগ এবং উদ্যোক্তাদের চিন্তা তবে ভবিষ্যতে অভিনব কিছু সৃষ্টির সম্ভাবনা, উদ্যোক্তাদের যে সম্ভাবনাময় বাজার তা পুরোপুরি মুখ থুবড়ে পড়বে। এজন্যই আপনাকে নতুন কোন উদ্যোগ নেওয়ার আগে পিটার থিয়েলের দুইটি কথা বিবেচনা করতে অনুরোধ করা হয়েছে। জন সি. ম্যাক্সওয়েল তার বই *ডিভেলপিং দ্য লিডার উইদিন* ইউ তেও একই কথা বলেছেন, 'কী করতে হবে তা জানা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ কী করতে হবে না তা জানা।' আসুন আবার অনুবাদে ফিরে যাই।)

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা

যেসব কোম্পানি একচেটিয়া নয়, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কোম্পানি, তারা তাদের অবস্থান তুলে ধরে একটি বিপরীত মিথ্যা কথা বলে : 'আমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করি।' উদ্যোক্তারা সবসময় প্রতিযোগিতার এই ধারণা নিয়ে বিভ্রান্তিতে থাকে। আর এই জায়গাতেই তারা সবচেয়ে বড় ভুল করে। আবার কেউ কেউ তাদের বাজারকে খুব ছোট একটি বাজার বলেও বর্ণনা করে যাতে শুরু থেকেই সে ঐ বাজারের ওপর কর্তৃত্ব চালাতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়ার একটি শহর পালো আলটো। ধরুন, আপনি এই শহরে একটি খাবারের দোকান দিতে চান, যেখানে ব্রিটিশ খাবার পরিবেশন করা হবে। আপনি হয়তো চিন্তা করলেন, 'এখানে কেউ ব্রিটিশ খাবার বিক্রয় করে না। এই সুযোগ! আমরা পুরো বাজারটি দখল করে নিবো।' কিন্তু আসলে কী তাই? এটা কেবল তখনই সত্য হত যখন সেই পুরো বাজারটি কেবল ব্রিটিশ খাবারের জন্য খ্যাত হত। যদি পালো আলটো রেস্তোরাঁ বাজার অনেক ধরনের খাবার নিয়ে সাধারণ একটি বাজার হয়ে থাকে? যদি শহরের সব রেস্তোরাঁই এই সাধারণ বাজারের অংশ হয়ে থাকে তাহলে কী হবে?

প্রশ্নগুলো একটু কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক হবে যদি আপনি এগুলো নিয়ে চিন্তা না করেন। আপনি রেস্তোরাঁ খুলতে চান। কিন্তু যখন আপনি শুনলেন কিছু রেস্তোরাঁ বছর দুই একের মধ্যে ক্ষতির মুখে পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে তখন আপনি চিন্তা করছেন, 'নাহ! আমারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে।' আপনি লোকজনকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন আমার রেস্তোরাঁ একটি ব্যতিক্রমী রেস্তোরাঁ। অথচ প্রকৃত অবস্থা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখছেন না। আর তখনই উচিত একটু বিরতি নেওয়া। একটু থেমে চিন্তা করা, যারা সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল ব্রিটিশ খাবার খায় এমন লোকজন আছে কি। হয়তো তখন দেখবেন এমন লোকই নেই।

২০০১ সালে যখন আমি পেপালে ছিলাম তখন আমি প্রায়ই আমার সহকর্মীর সাথে মাউন্ট ভিউ এর ক্যাস্ট্রো স্ট্রিটে দুপুরের খাবার খেতাম। আমাদের রেস্তোরাঁ ঠিক করা ছিল। খাবারের পদগুলোও একই থাকতো : ভারতীয় খাবার, সুশি ও বার্গার। আরও রেস্তোরাঁ ছিল। কিন্তু আমরা যদি একবার বিবেচনা করে ঠিক করে নিতাম যে, উত্তর ভারতীয় না দক্ষিণ ভারতীয়, সস্তা না স্বাদ বিবেচনা করে খাবো, তবে তাই চলতে থাকতো। এখন দেখেন, একটি স্থানীয় রেস্তোরাঁ বাজারের তুলনায় পেপাল ছিল তখন কেবল একমাত্র ইমেইল ভিত্তিক আর্থিক লেনদেনের একটি কোম্পানি। ক্যাস্ট্রো স্ট্রিটের যেকোন রেস্তোরাঁর চেয়ে আমাদের কর্মচারী সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু আমাদের ব্যবসার দাম সেখানকার সব রেস্তোরাঁর চেয়েও বেশি ছিল। এখানে একটি দক্ষিণ ভারতীয় রেস্তোরাঁ খুলে টাকা আয় করা খুবই কঠিন। আপনি যদি বাজারের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে না পারেন এবং তুচ্ছ জিনিস নিয়ে পড়ে থাকেন যে, না আমার দাদীর বা মায়ের রেসেপিতে জাদু আছে। তাহলে আপনার ব্যবসা নিয়ে টিকে থাকাটাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

চলচ্চিত্র ব্যবসাও ঠিক একই ভাবে চলে। কোন চিত্রনাট্যকারই বলে না তার কাহিনীটি পুরানো, সবসময় বলে তার কাহিনীটি পুরোপুরি আনকোরা। আসলে ব্যাপারটি হচ্ছে, পুরানো কোন কিছুকে অল্প ঘষেমেজে নতুন রূপ দেওয়া। ঘোষণাটি হয় : 'এই চলচ্চিত্রটি হচ্ছে পুরোপুরি নতুন এক পদ্ধতিতে কাহিনীর সমাবেশ।' হয়তো এটা হতেও পারে।

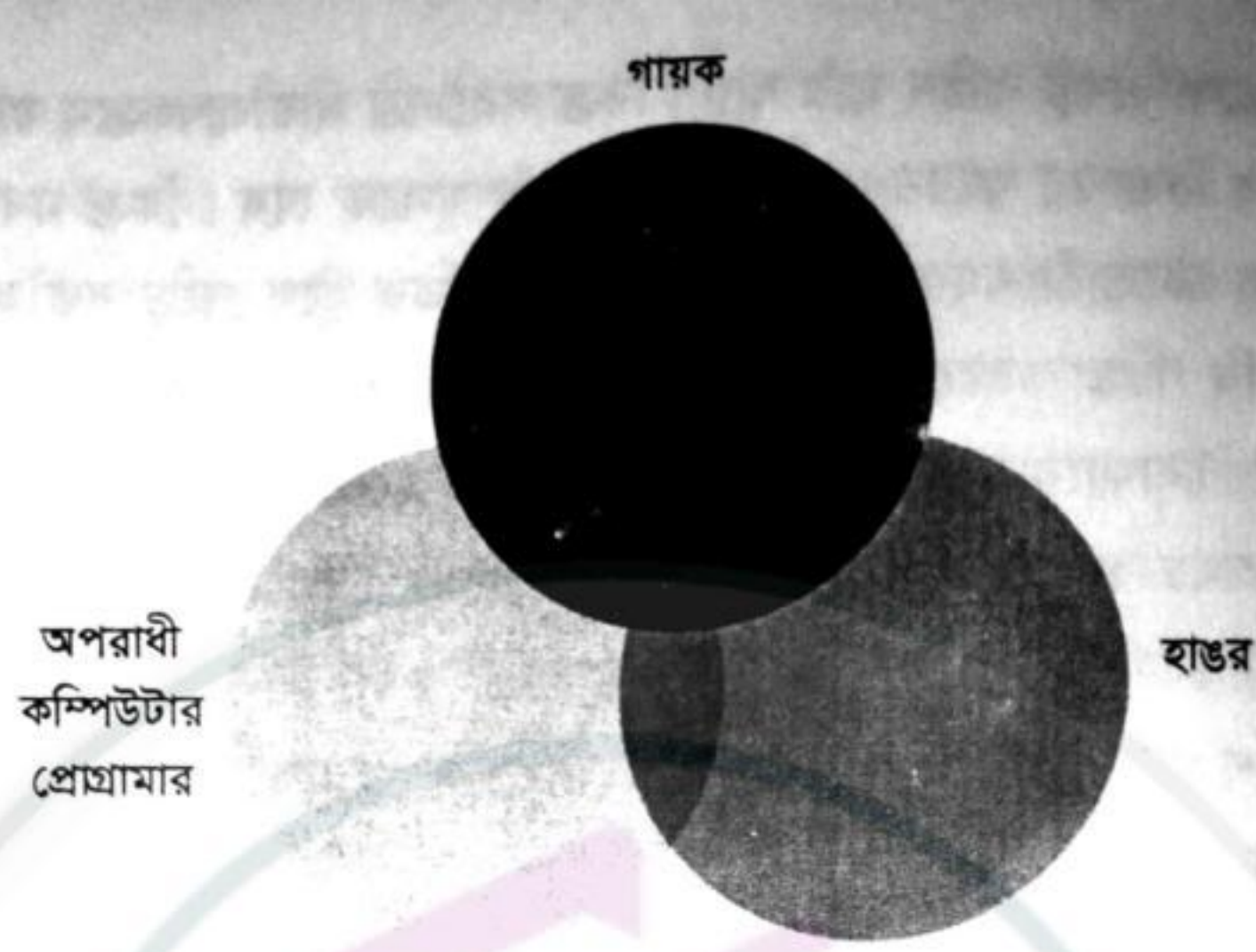

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। জে জ একজন গায়ক। হ্যাকারস ও জস হচ্ছে পর্যায়ক্রমে অপরাধী কম্পিউটার প্রোগ্রামার ও হাঙর নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র। এখন গায়ককে নিয়ে যদি প্রোগ্রামারদের সাথে মিলে হাঙরকে মারার একটি পরিকল্পনা করা হয় তবে এটাই হচ্ছে নতুন একটি কাহিনী। এটা আগে কখনো ঘটেনি। কিন্তু কাহিনীটি আসলে অভিনব নয়। এটা অনেকটা পালো আলটোতে ব্রিটিশ রেস্তোরাঁ করার মতো। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কোম্পানিগুলো নিজেদেরকে আলাদা করে বিভিন্ন ছোট ছোট মার্কেটের ইন্টারসেকশন দ্বারা।

ব্রিটিশ খাবার ∩ রেস্তোরাঁ ∩ পালো আলটো

গায়ক ∩ হ্যাকার ∩ হাঙর

অপরপক্ষে, একচেটিয়ারা বিভিন্ন বড় বড় বাজারের সমন্বয় করে নিজেদের একচেটিয়া ব্যবসা লুকানোর চেষ্টা করে।

সার্চ ইঞ্জিন U মোবাইল ফোন U বহনযোগ্য কম্পিউটার U স্বনিয়ন্ত্রিত গাড়ি

বাস্তবে তাহলে একচেটিয়াদের গল্পটি কেমন? গুগলের কথাই ধরুন। গুগলের চেয়ারম্যান এরিক স্মিডটের বক্তব্যটি তুলে ধরছি। তিনি ২০১১ সালে একটি বক্তব্য দেন :

'আমরা চরম প্রতিযোগিতাপূর্ণ একটি বাজারে আছি। যেখানে গ্রাহকরা তথ্য খুঁজে পেতে বিভিন্ন উপায়, পদ্ধতি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করছে।'

অথবা, সোজা বাংলা করলে যা দাঁড়ায় :

'তথ্য বাজারের মতো বড় একটি জায়গায় গুগল একটি ছোট্ট দোকান। আমাদেরকে যেকোনো সময় যেকেউ গিলে ফেলতে পারে। সরকার আসলে একচেটিয়া বলতে যা খুঁজছে, গুগল আসলে তা নয়।'

নিষ্ঠুর লোকজন

একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারের সমস্যা হচ্ছে পর্যাপ্ত মুনাফার অভাব। ধরুন, আপনি যদি পালো আলটোর সেই রেস্তোরাঁগুলোর যেকোনো একটির মালিক হন তবে আপনি আপনার প্রতিযোগীদের থেকে খুব একটা ভিন্ন নন। আপনাকে মার্কেটে টিকে থাকতে হলে প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হবে। যদি আপনি অল্প লাভেও খাবার বিক্রি করেন তবে আপনাকে আপনার কর্মচারীদের কম বেতন দিতে হবে। আর আপনাকে প্রতিটি দিক থেকেই অনেক সঞ্চয়ী ও দক্ষ হতে হবে। এজন্যই ছোট ছোট রেস্তোরাঁয় দাদি-নানিকে ক্যাশ কাউন্টারে বসায় আর ভিতরে বাচ্চাদের দিয়ে বাসন-কোসন মাজায়। বড় বড় রেস্তোরাঁগুলোও খুব একটা ভিন্ন নয়। আর এখন তো মিসেলেনের তারকা ব্যবস্থার রিভিউ ও রেটিং ব্যাপারটিকে আরও মারমুখী করে তুলছে। ফ্রান্সের একজন শেফ, বারনার্ড লুয়েসিউ তার রেস্তোরাঁর তিন তারকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 'আমি যদি একটি তারকাও হারাই তবে আমি আত্মহত্যা করবো।' মিসেলেন তার তারকা ব্যবস্থা নিয়ে ঠিকই টিকে ছিল কিন্তু লুয়েসিউ ২০০৩ সালে আত্মহত্যা করে। কারণ প্রতিবেশী একটি রেস্তোরাঁর কারণে তার রেস্তোরাঁর একটি তারকা খোয়া যায়। যাইহোক আমি বলতে চাচ্ছি, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা লোকজনকে নিষ্ঠুরতা বা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

অপরপক্ষে, একচেটিয়া ব্যবস্থা, যেমন গুগল, কিছুটা ভিন্ন। যেহেতু তাকে

প্রতিযোগিতা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না সেহেতু গুগল তার কর্মচারীদের ভালো বেতন দিতে পারে, আরও উন্নত পণ্য ও গবেষণার দিকে মনোযোগ দিতে পারে। যেমন গুগলের ব্যবসায়িক প্রতিপাদ্য–'শয়তান হয়ো না'–এটা তাদের কাজ করার একটি ধরনে পরিণত হয়েছে। আবার একই সাথে গুগল এই প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে ব্যবসায় তাদের নীতি ও দর্শন অত্যন্ত গুরুতরভাবে বজায় রেখেছে। ব্যবসায় হয় টাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অথবা টাকাই সব। একচেটিয়ারা এখানে টাকা আয়ের পাশাপাশি অন্যকিছু চিন্তা করারও সুযোগ পায়। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার কোম্পানিগুলো এই সুযোগ পায় না। আর তাছাড়া পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিটি কোম্পানি আজকের আয়-ব্যয় হিসাব নিয়ে এতবেশি চিন্তিত যে তারা কখনো একটি দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যতের চিন্তাই করতে পারে না। প্রতিদিনকার আয়-ব্যয়, লাভক্ষতির মতো একটি বর্বর ব্যাপার, পুরোপুরি একটি সংগ্রামের এই অবস্থা এড়ানো যায় কেবল একচেটিয়া মুনাফা দিয়ে।

Amadilua.com

একচেটিয়া পুঁজিবাদ

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একচেটিয়া ব্যবসা ভিতর থেকে ব্যবসায়ীদের জন্য ভালোই। এবার আসি বাইরের কথায়। বাইরের অবস্থা কী? যেহেতু টাকা সব গ্রাহকের পকেট থেকেই আসে তাহলে সমাজের ওপর এই একচেটিয়া মুনাফার প্রভাব কী? দেখেন, মুনাফা আসে কোথা থেকে? মুনাফা বলেন, আর টাকাই বলেন, আসে তো সেই গ্রাহকের পকেট থেকেই। একচেটিয়ারা তখনই খারাপ হয়ে ওঠে যখন বাজারের কোন পরিবর্তন ঘটে না, পুরোপুরি স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজমান।

(বাস্তবে স্থিতিশীল অবস্থা কখনোই ভালো নয়। ধরুন, আপনি গাছ থেকে একটি পেয়ারা পেড়েছেন। সাথে সাথে খান, দেখবেন কচকচে, মজাদার। হয়তো একটু কষকষ লাগতে পারে। কিন্তু সেই একই পেয়ারা না খেয়ে, কোন প্রক্রিয়াজাতকরণ ছাড়াই রেখে দেন, দেখবেন সাতদিন পরে, প্রথমে একটু কালচে

হবে, তারপর পচন ধরবে। আমি পেয়ারা ভালোবাসি, তাই পেয়ারার উদাহরণ দিলাম। কিন্তু মূল বক্তব্য হচ্ছে প্রকৃতি কখনো কোন জিনিসকে আজীবনের জন্য সংরক্ষণ করে না। যার জন্ম আছে তার মৃত্যু প্রকৃতির হাতে ঘটবেই। মৃত্যু না চাইলে মানুষকে হাত লাগাতে হবে। মানুষের হাত দেওয়া মানে তার উদ্ভাবনী চিন্তা, অভিনব কিছু সৃষ্টি।

এখন, বাজার যদি স্থিতিশীল হয় তবে একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা কেবল ভাড়া সংগ্রাহকে পরিণত হয় আর আপনার কাছে যদি এমন পণ্য থাকে যা বাজারে আর কারও কাছে নেই তবে আপনি ইচ্ছামতো দাম বাড়িয়ে দিতে পারেন, লোকজন আপনার কাছ থেকে কিনতে বাধ্য। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা এটা বেশ ভালোই পারে।

কিন্তু আজকের বিশ্ব ছোট নয়। পুরো বিশ্বই এক বাজারে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ এই বিশ্ব বাজারের একটি অংশ এবং এতে প্রগতিশীল হাওয়া লেগেছে। আর প্রগতিশীল বাজারের সবচেয়ে ভালো লক্ষণ হচ্ছে এখানে আপনি নতুন ও আরও ভালো জিনিস উদ্ভাবন করতে পারবেন। নতুন এক ব্যবসায়িক প্রজন্ম সৃষ্টি হচ্ছে যারা গ্রাহকদের আরও নিত্যনতুন সেবা দিতে প্রস্তুত।)

একচেটিয়াদের কথায় ফিরে আসি। সৃজনশীল একচেটিয়ারা কেবল সমাজের জন্য মঙ্গলজনকই নয়; বরং সমাজকে আরও উত্তমরূপে সৃষ্টি করতে তারা শক্তিশালী ইঞ্জিন রূপে কাজ করে।

এমনকি সরকারও এটা জানে। তাই তো তাদের একটি বিভাগ চেষ্টা করে একচেটিয়া ব্যবসায়ী তৈরি করার (নতুন নতুন উদ্ভাবিত পণ্যের মেধাস্বত্বের অধিকার দিয়ে), আর আরেকটি বিভাগ রয়েছে যারা অতিমুনাফা লোভীদের শিকার করে বেড়ায় (জরিমানা করে বা মালামাল ক্রোক করে)। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কাউকে কি সত্যিই আইনত একচেটিয়া ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া উচিত? দেওয়া যায়, যেমন অ্যাপলের একচেটিয়া মুনাফা আসে আইফোনের নকশা, পণ্য ও বাজারজাতকরণ থেকে। তবে অ্যাপল পণ্যের কৃত্রিম বাজার সংকট তৈরি করে না। আবার গ্রাহকরাও বেশি দাম দিয়ে তাদের কাজে লাগে এমন একটি স্মার্টফোন

কিনে সন্তুষ্ট।

অ্যাপল একচেটিয়া কোম্পানি হলেও তাদের অভিনব পণ্য, উদ্ভাবনী নকশা নতুন কিছু সৃষ্টির পথকে রুদ্ধ করেনি; বরং অতীতের যেসব একচেটিয়া কোম্পানি অভিনব কিছু সৃষ্টির পথকে আটকে রেখেছিল সেগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছে। অ্যাপলের যে আইওএস সফটওয়্যার তা মাইক্রোসফটের বহু বছরের কর্তৃত্বকে বহুলাংশে হ্রাস করেছে। ষাট ও সত্তর দশকে আইবিএমের হার্ডওয়্যার একচেটিয়া কর্তৃত্ব করেছে। এরপর মাইক্রোসফটের সফটওয়্যার তার অবসান ঘটায়। বিংশ শতাব্দীর প্রায় পুরোটা জুড়ে এটিএন্ডটি কোম্পানি টেলিফোন ব্যবসায় রাজত্ব করেছে। কিন্তু এখন যেকেউ খুব সহজেই একটি মোবাইল কিনতে পারে এবং পূর্বের চেয়ে অনেক কম খরচে যোগাযোগ করতে পারে। একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা যদি অগ্রগতিকে বেঁধে রাখে, উন্নয়নকে এগিয়ে যেতে না দেয় তবে এটা খুবই বিপজ্জনক, আমাদেরও এমন ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অধিকার আছে। তবে উন্নয়নের ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই এমন দুষ্ট একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের উত্তম একচেটিয়া ব্যবসায়ীরাই প্রতিস্থাপিত করেছে। এজন্যই উত্তম একচেটিয়া ব্যবসায়ীরাই সভ্যতার জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

একচেটিয়ারাই উন্নয়নকে বেগবান করে। কারণ তাদের মুনাফা। তারা বছরের পর বছর, এমনকি যুগ যুগ ধরেও এই মুনাফা পেতে থাকে। এমন নিশ্চিত মুনাফা তাদেরকে অভিনব কিছু সৃষ্টির প্রতি উৎসাহিত করে। তাদের মুনাফা তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে ও সেই পরিকল্পনার পিছনে বিনিয়োগ করতে সাহস জোগায় যা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কোম্পানিগুলো কখনো স্বপ্নেও দেখতে পারে না। এজন্যই একচেটিয়া কোম্পানিগুলো যেকোনো ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী গবেষণা প্রকল্প হাতে নিতে পারে।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে অর্থনীতিবিদরা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের জন্য এত আগ্রহী কেন? কেন তারা প্রতিযোগিতাকেই একটি আর্দশ অবস্থা মনে করে? এটা আসলে ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষ। অর্থনীতিবিদরা তাদের চিন্তা চেতনা ও গাণিতিক সূত্রগুলো ধার করেছে উনিশ শতকের পদার্থবিদদের

কাছ থেকে। তারা ব্যক্তি মানুষ ও ব্যবসাকে পারস্পরিক পরিবর্তনশীল পরমাণু হিসেবে ধরেছে। যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে পানি হয়। আবার পানি থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যক্তি মানুষ ও ব্যবসা তো কেবল রূপ পরিবর্তনই করে না, তারা অনন্য, তারা সৃজনশীল। ব্যক্তি মানুষ ও ব্যবসা থেকে অভিনব কিছু সৃষ্টি হতে পারে। অর্থনীতিবিদদের তত্ত্ব অনুযায়ী একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করবে। এই তত্ত্ব দেওয়ার কারণ কী? কারণ এটাকে সহজেই নমুনা হিসেবে দাঁড় করানো যায়। এটাই যে ব্যবসার জন্য সবচেয়ে ভালো নমুনা তা কিন্তু নয়। অনেকটা ১ কেজি মিষ্টি কিনতে না পেরে ২ টাকার চকলেট কিনে খাওয়ার মতো। সবচেয়ে ভালো নমুনা বের করতে না পেরে বলে দিলাম প্রতিযোগিতাই ভালো। উনিশ শতকের পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব ছিলো অনেকটা এরকমই। সব ধরনের জ্বালানি, সবার মাঝে, সমানভাবে পৌঁছে দেওয়া হবে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪২.৬ ডিগ্রি। ধরুন, সবার মাঝে, সমানভাবে পৌঁছে দেওয়া হবে, এই বলে সারা পৃথিবীর তাপমাত্রা ৪২.৬ ডিগ্রি হয়ে গেলে কী অবস্থা হবে। পৃথিবীর অবস্থা যাইহোক না কেন, কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে সাম্যবস্থা এক ধরনের স্থিতিশীলতা আনে, আর এই স্থিতিশীলতা মৃত্যু ঘটায়, ব্যবসায়িক বিপর্যয় ডেকে আনে। আপনার কোম্পানি যদি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সাম্যবস্থায় থাকে, যদি আপনার কোম্পানি মরেও যায় তাতেও এই বিশ্বের কিছুই যায় আসে না। আপনার কোম্পানি আজকে ধসে পড়েছে, কালকে আরেক প্রতিযোগী কোম্পানি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যাবে। আপনার কোম্পানির কোন নাম গন্ধও থাকবে না।

পূর্ণাঙ্গ সাম্যবস্থা দিয়ে হয়তো এই মহাবিশ্বের শূন্য বা খালি অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যায়। হয়তোবা কিছু কিছু ব্যবসার বৈশিষ্ট্যকেও তুলে ধরা যায়। কিন্তু অভিনব কিছু সৃষ্টির ব্যাপারটি সাম্যবস্থা থেকে বহুদূরে। অর্থনীতির তত্ত্বের বাইরে বাস্তবে জগতের চিত্র হচ্ছে : প্রতিটি সফল ব্যবসার সাফল্যের কারণ হচ্ছে তারা এমন কোন সমস্যার সমাধান করতে পারছে যা অন্যরা পারে না। এজন্যই একচেটিয়া ব্যবসা কোন বিকারতত্ত্বও নয় বা কোন ব্যতিক্রমী কিছুও নয়। একচেটিয়া হচ্ছে প্রতিটি সফল ব্যবসার অন্যতম শর্ত।

খ্যাতিমান রুশ লেখক লিও তলস্তয় তার উপন্যাস আন্না কারেনিনাতে লিখেছেন, 'প্রতিটি সুখী পরিবার ঠিক একই ধরনের; প্রতিটি অসুখী পরিবার তাদের নিজ নিজ ভিন্ন ভিন্ন কারণে অসুখী।' ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বিপরীত। প্রতিটি সুখী কোম্পানি ভিন্ন; প্রত্যেকেই কোনো না কোনো উপায়ে একটি বিশেষ সমস্যার সমাধান করছে এবং একচেটিয়া আয় করছে। আর সব ব্যর্থ কোম্পানি ঠিক একই রকম; তারা প্রতিযোগিতা থেকে বের হতে পারেনি।

Audilua.com

Audilua.com
Digital University

চার

প্রতিযোগিতার মূলনীতি

সৃজনশীল একচেটিয়া মানে অভিনব কিছু সৃষ্টি করা, নতুন কোনো পণ্য যা লোকজনের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করে এবং এর সৃষ্টিকর্তা ভালোভাবে বেঁচে থাকবে তেমন একটি মুনাফা। আর প্রতিযোগিতা মানে কারও জন্য কোনো মুনাফা নেই, পণ্যে পণ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং বেঁচে থাকার জন্য পুরো এক সংগ্রাম করতে হয়। তাহলে এরকম অবস্থার পরেও কেন লোকজন প্রতিযোগিতাকে ভালো মনে করে? উত্তরটি হচ্ছে, এটি কেবল একটি অর্থনৈতিক মতবাদ বা সাধারণ লোকজন ও কোম্পানিগুলোর জন্য একটি ঝামেলাই নয়; বরং এটা তারচেয়েও বেশি কিছু। প্রতিযোগিতা হচ্ছে একটি চিন্তারীতি, ভাবাদর্শ–যা আমাদের সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে এবং আমাদের চিন্তাকে বিকৃত করেছে। আমরা প্রতিযোগিতার কথা প্রচার করেছি, এটার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে বের করেছি এবং এর বিধি-নিষেধকে আইনত বিধিবদ্ধ করেছি; এতে করে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ফাঁদে ফেলেছি–যদিও আমরা জানি যে, আমরা যত বেশি প্রতিযোগিতা করবো তত কম আমরা পাবো।

এটা খুব সহজ সরল একটি সত্য, তবুও আমরা নিজেদের এমন ভাবে প্রশিক্ষিত করেছি যাতে এই সত্যকে উপেক্ষিত করা যায়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তো পুরোপুরি প্রতিযোগিতার প্রতিফলন এবং সেই দিকেই ছাত্রদের ঠেলে দিচ্ছে।

জিপিএ বা গ্রেডিং পদ্ধতি প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বিচার করছে, যারা সর্বোচ্চ নম্বর পায় তাদেরকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে এবং আলাদা চোখে দেখা হচ্ছে। আমরা প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে ঠিক একই বিষয়, ঠিক একই ভাবে শিখিয়ে যাচ্ছি। স্বতন্ত্র কোনো ছাত্রের মেধা বা বিশেষ কোনো গুণের মূল্যায়ন করছি না। যারা চেয়ার টেবিলে বসে শিখছে না তাদেরকে নিকৃষ্ট চোখে দেখা হচ্ছে। শিশুদেরকে আমরা প্রথাগত নিয়মে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে মেপে যাচ্ছি। শিশুদেরকে আলাদাভাবে বিচার না করে, কেবল তাদের কিছু প্রাতিষ্ঠানিক মানদণ্ডে বিচার করে যাচ্ছি।

(এই সম্পর্কে আলবার্ট আইনস্টাইন একটি উপযুক্ত বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেকের মধ্যেই মেধা আছে, প্রত্যেকেই প্রতিভাবান। কিন্তু আপনি যদি একটি মাছকে তার গাছে ওঠার সামর্থ্য দিয়ে বিবেচনা করেন তবে মাছটি তার সারা জীবন ধরে এই চিন্তা নিয়েই বেঁচে থাকবে যে, সে একটি অক্ষম প্রাণী।')

প্রতিযোগিতার এই খেলা আরও নোংরা হয়ে ওঠে যখন ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর শ্রেণিতে ওঠে। অভিজাত ছাত্ররা আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এমন একটি সাধারণ জায়গায় পৌঁছায় যেখানে তাদের স্বপ্ন পূরণ হবে, ততক্ষণ তারা নির্বিঘ্নে পড়ালেখা করে যায়। উচ্চতর শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীরা বড় বড় পরিকল্পনা নিয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে একটি তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে। ঠিক একই পর্যায়ের ও মেধার ছাত্রদের সাথে নম্বর নিয়ে তীব্র লড়াই হয়। আর এইভাবে প্রথা অনুযায়ী পড়ালেখা করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের অঢেল টাকা খরচ করতে হয় যা অর্থনৈতিকভাবে মুদ্রাস্ফীতিকে বাড়িয়ে তোলে। আমরা কেন নিজেদের সাথেই এমনটি করছি?

ইস, আমি যদি আমার তরুণ বয়সে নিজেকে এই প্রশ্নটি করতাম! আমার পথ এতটাই নির্দিষ্ট ছিল যে, যখন অষ্টম শ্রেণি পাস করি তখন আমার এক বন্ধু একদম যথার্থভাবেই আমার ভবিষ্যৎ বলে দিয়েছিল। বলেছিল আমি স্ট্যানফোর্ড থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে বের হবো। আমি ঠিকই প্রথাগতভাবে স্ট্যানফোর্ড ল কলেজে ভর্তি হলাম, যেখানে আমি ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য আরও বেশি পরিশ্রম করতে লাগলাম।

আইন বিষয়ক শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ কী ঘটবে তা পুরোপুরি একটি স্পষ্ট ব্যাপার। প্রতি বছর দশ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র কয়েক কুড়ি শিক্ষার্থী সুপ্রিম কোর্টে ক্লার্কশিপ করার জন্য সুযোগ পায়। এক বছর জজ কোর্টে ক্লার্কশিপ করার পর আমি সুপ্রিম কোর্টে ক্লার্কশিপ করার জন্য সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাই। আমার সাক্ষাৎকার নেয় বিচারপতি কেনেডি ও স্কালি। বিচারপতিদের সাথে আমার সাক্ষাৎকার বেশ ভালোই গেলো। আমি প্রতিযোগিতার একদম শেষ ধাপে ছিলাম। আমি চিন্তা করলাম, যদি আমি ক্লার্কশিপটি পেয়ে যাই, তাহলে আমার জীবনটি পুরোপুরি সেট হয়ে যাবে, আর কোনোকিছুর চিন্তা নেই। কিন্তু আমি কাজটি পেলাম না। তখন আমি হতাশায় বিধ্বস্ত হয়ে গেলাম।

এরপর ২০০৪ সালে, যখন আমি পেপাল বিক্রি করে দিয়েছি, তখন একদিন আমার এক পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা হয়। সে ছিল আমার ল কলেজের বন্ধু। সে আমাকে আমার ক্লার্কশিপের কাগজপত্র তৈরিতে সহায়তা করেছিল। প্রায় এক দশক পরে তার সাথে আমার দেখা হলো। সে আমাকে *কেমন আছো?* বা *কতদিন পরে দেখা হলো?* তা জিজ্ঞেস না করে একটু ভেংচি কেটে জিজ্ঞেস করলো : 'কী পিটার, ক্লার্কশিপটি না পেয়ে তোমার তো ভালোই হয়েছে, কী বলো?' আসলে আমরা দুজনেই জানি যে, আমি যদি ক্লার্কশিপটি পেতাম তবে আমার জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটতো, আর পরিবর্তনটি ঘটতো খারাপ দিকে। যদি আমি সুপ্রিম কোর্টে কাজ করতাম তবে আমি আমার সারা জীবন অন্যদের ব্যবসায়িক চুক্তিগুলো নিয়ে পড়ে থাকতাম, অভিনব কিছুই সৃষ্টি করতে পারতাম না। এটা ঠিক বলা কঠিন জীবন তখন কতটা ভিন্ন হতো, কিন্তু সেই সুযোগ যদি আমি গ্রহণ করতাম তবে সেটার অনেক বেশি দাম পরিশোধ করতে হত। আমার মতো যতো লোকজন আছে তাদের প্রত্যেকেরই অতীত জীবনে উজ্জ্বল একটি ভবিষ্যৎ ছিল যা তারা গ্রহণ করেনি।

অধ্যাপকেরা হয়তো এই ব্যাপারটি বুঝতে পেরে তাদের পাঠ্যক্রমে কিছুটা পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকেরা কখনো ব্যবসাকে যুদ্ধের সাথে তুলনা করতে ক্ষান্ত হয়নি। এমবিএ কোর্সের শিক্ষার্থীরা ক্লজউইটজ ও সান জু'র বই নিয়ে মহাব্যস্ত। যুদ্ধে যেসব রূপক, উপমা ব্যবহৃত হয় সেসব শব্দাবলি আমাদের প্রতিদিনকার ব্যবসায়িক ভাষায় হানা দিয়েছে : আমরা গ্রাহকদের গলা কাটতে সদা প্রস্তুত, আমরা বিক্রয়কে এতবেশি প্রণোদনা দিচ্ছি যে, তারা গ্রাহকদের চাহিদার বাজারকে জেলখানায় পরিণত করেছে এবং গ্রাহকদের করেছে বন্দী কয়েদি। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের একজনকে হত্যা করা আর একটি বিক্রয় সম্পন্ন করা তাদের কাছে একই জিনিস। কিন্তু এটা ব্যবসা নয়, এটা হচ্ছে একটি প্রকৃত প্রতিযোগিতা, যা অনেকটা যুদ্ধের মতো। যেন প্রয়োজনীয়, মনে হয় এটা একটি বীরোচিত কাজ, কিন্তু এটা আসলে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কাজ।

তাহলে লোকজন কেন একে অপরের সাথে পাল্লা দেয়, রেষারেষি করে? কার্ল মার্কস ও উইলিয়াম শেকসপিয়ার দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তারা যেকোনো ধরনের দ্বন্দ্বকে বোঝার জন্য দুইটি ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব দিয়েছেন।

মার্কসের মতে, লোকজন লড়াই করে কারণ তারা একে অপরের থেকে ভিন্ন। গরিব শ্রেণি ধনী শ্রেণির সাথে লড়াই করে, কারণ তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তা করে এবং তাদের লক্ষ্যও ভিন্ন (আর্থিক ও সম্পত্তির কারণেও তারা ভিন্ন)। এই ভিন্নতা যত বড় হবে দ্বন্দ্বটাও তত বিশাল হবে।

এর বিপরীতে হচ্ছে শেকসপিয়ারের তত্ত্ব। তার মতে, সব প্রতিদ্বন্দ্বীরা দেখতে মূলত কমবেশি একই রকম। তাদেরকে যে কেন লড়াই করতেই হবে, এটা ঠিক পরিষ্কার নয়, কারণ তাদের মধ্যে লড়াই করার মতো এমন কিছুই নেই। রোমিও এন্ড জুলিয়েট নাটকের প্রথম চরণগুলো লক্ষ করুন : 'দুইটি বংশ, গৌরভ ও মর্যাদায় তারা একই রকম।' তারা ভিন্ন ভিন্ন দুই বাড়ির লোক, তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রায় একই রকম, কিন্তু তারপরেও তারা একে অপরকে ঘৃণা করে। একে অপরের সাথে ঝগড়া বিবাদ করেই তারা বেড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তারা সেই কারণটাই ভুলে যায় যে কারণে তারা লড়াইটি আরম্ভ করেছিল।

ব্যবসায়িক জগতে শেকসপিয়ারের তত্ত্বটাই বেশি কাজে দেয়। একটি কোম্পানির অভ্যন্তরে, কর্মচারীরা পদোন্নতির জন্য একে অপরের সাথে টেক্কা দেয়, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে। তারপর আবার সেই কোম্পানি বাজারের অন্যান্য কোম্পানির সাথে রেষারেষি করে। এই ধরনের নাটকীয়তা সব মানুষের মধ্যেই বিরাজমান। প্রকৃতপক্ষে কী দরকার লোকজন তা ভুলে গিয়ে কেবল প্রতিপক্ষের দিকেই মনোনিবেশ করে।

একজন উদ্যোক্তা যখন প্রথম উদ্যোগ নেয় তখন তার চিন্তা থাকে জনগণের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করা। দ্বিতীয়ত নিজের জন্য মুনাফা অর্জন করা। সে একটি সাধারণ সমস্যা নেয় এবং সে সমস্যার সেরা সমাধান নিয়ে গ্রাহকদের সামনে উপস্থিত হয়। ধীরে ধীরে যখন তার প্রতিষ্ঠান বড় হতে থাকে তখন তার মনোযোগ 'জনগণের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করা' থেকে সরে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর পড়ে। অভিনব কিছু সৃষ্টি করা, উন্নত পণ্য তৈরি করার বদলে তখন তার চিন্তা থাকে প্রতিদ্বন্দ্বীরা কী করছে, তারা কী পণ্য তৈরি করছে তা দেখা। ঠিক এই জায়গা থেকেই প্রতিষ্ঠানের অবনতি আরম্ভ হয়। যেমন হয়েছে মাইক্রোসফট ও গুগলের ক্ষেত্রে।

আসুন, এবার দেখি বাস্তব জগতে শেকসপিয়ারের তত্ত্ব কেমন কাজ করে। আমরা দুইটি বংশের স্বরূপ হিসেবে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে নিচ্ছি : মাইক্রোসফট ও গুগল। ধরে নিচ্ছি গেটস হচ্ছে রোমিও এবং স্মিডট হচ্ছে জুলিয়েট। মন্টাগুয়ে পরিবার হচ্ছে মাইক্রোসফট এবং কাপুলেট পরিবার হচ্ছে গুগল। দুইটি বড় পরিবার, স্বনামধন্য বংশ, খুবই দক্ষ লোকজন দ্বারা পরিচালিত, মনে হচ্ছে এক সময় না এক সময় বিরোধ লাগবেই।

দ্বন্দ্ব আসলে ঘটে কেন? কারণ প্রতিযোগিতার জন্য। যদিও এই দ্বন্দ্ব কিন্তু পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া যায়। কীভাবে? এই পরিবারগুলো এসেছে কিন্তু দুইটি ভিন্ন জায়গা থেকে। মন্টাগুয়ে পরিবার মানে মাইক্রোসফট বানায় অপারেটিং সিস্টেম ও দাপ্তরিক কাজকর্মের জন্য অফিস অ্যাপ্লিকেশন। আর অন্যদিকে কাপুলেট পরিবার মানে গুগল একটি সার্চ ইঞ্জিন তৈরি করেছে। তাহলে, এখানে লড়াইয়ের কী আছে?

আছে। সাধারণ একটি উদ্যোগ যখন নেওয়া হয়, তখন সে একাই চলে। অন্যদের এড়িয়ে স্বতন্ত্রভাবে পথ চলে। কিন্তু যখনই তার প্রতিষ্ঠান আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে তখন সে অন্যদের দিকে তাকানো আরম্ভ করে। মন্টাগুয়ে দেখে কাপুলেটকে, কাপুলেট দেখে মন্টাগুয়েকে। বাংলায় বললে, চৌধুরী বংশ দেখে সৈয়দ বংশকে। আর সৈয়দ বংশ দেখে চৌধুরী বংশের লোক কী করছে। ফলাফল? উইন্ডোজ বনাম ক্রোম ওএস, বিং বনাম গুগল সার্চ, এক্সপ্লোরার বনাম ক্রোম, অফিস বনাম ডক এবং সারফেস বনাম নেক্সাস।

যুদ্ধে যেমনটি হয়, প্রচুর খরচ, তেমনই মন্টাগুয়ে ও কাপুলেট পরিবারের সন্তানদের এই খরচ যোগাতে হয়, মাইক্রোসফট ও গুগল তাদের খাতগুলো থেকে এই অর্থ ব্যয় করে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যায়। আর তৃতীয় পক্ষ, অ্যাপল এসে দাঁড়ায় এবং সবকিছু নিয়ে নেয়। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে অ্যাপলের বাজার মূলধন ছিল ৪০,০০০ কোটি টাকা (চল্লিশ হাজার কোটি টাকা), যখন গুগল ও মাইক্রোসফট উভয়ের একত্রিত বাজার মূলধন ৩৭,৩৬০ কোটি টাকা। অথচ মাত্র তিন বছর আগে মাইক্রোসফট ও গুগল প্রত্যেকে একাই অ্যাপলের চেয়ে বেশি মূল্যমানের ছিল। তাহলে বুঝতেই পারছেন, যুদ্ধ একটি ব্যয়বহুল ব্যবসা।

ব্যবসায় রেষারেষির কারণে আমরা পুরাতন সুযোগগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিই এবং পুরাতন পদ্ধতিতেই কাজ করে যাই। সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কিছুদিন আগে মোবাইলে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের জন্য একটি যন্ত্র আনা হয়। একটি কোম্পানি এই নতুন উদ্যোগটি নেয়। যন্ত্রটি ছিল স্কয়ার আকৃতির। ২০১০

সালের অক্টোবর মাসে যন্ত্রটি ছাড়া হয়। ছোট্ট একটি যন্ত্র। এতে করে আইফোন ব্যবহারকারীরা মোবাইল থেকেই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের সুযোগ পায়। মোবাইল সেট দিয়ে আর্থিক লেনদেনের জন্য এটা খুব ভালো একটি উদ্যোগ ছিল। এটা দেখে নকলবাজরা খুব দ্রুত তাদের হাত-পা চালানো শুরু করলো। নেটসিকিউর নামক কানাডিয়ান একটি কোম্পানি অর্ধচন্দ্রাকৃতির একটি যন্ত্র বাজারে ছাড়ে। উদ্দেশ্য একই, মোবাইল দিয়ে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার। ইনটুইট কোম্পানি আনে সিলেন্ডার আকৃতির যন্ত্র। ২০১২ সালের মার্চ মাসে ইবে কোম্পানি পেপাল নাম দিয়ে আনে ত্রিভুজ আকৃতির একই যন্ত্র। এসব দেখে আপনার হয়তো মনে হতে পারে বানরগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত সব আকারের যন্ত্র বানিয়ে শেষ না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই নকলবাজি চলতেই থাকবে।

নকলবাজদের এইসব প্রতিযোগিতা থেকেই আমরা বুঝতে পারি কেন সিলিকন ভ্যালিতে সামাজিকভাবে মিশতে অপারগ লোকদের বেশি মূল্যায়ন করা হয়। ব্যাপারটি হচ্ছে আপনি যত কম সমাজের ইঙ্গিত ও সম্ভাবনা বুঝতে পারবেন, আপনি তত কম নকল করবেন। আপনি যদি অভিনব কিছু সৃষ্টি করে মজা পান বা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর মতো কোন কাজ করেন তবে আপনি অন্যদের মতো একমুখী চিন্তা কম করবেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় এমন ব্যক্তি তার নিজ দক্ষতাকে আরও উন্নত করতেই ব্যস্ত। তাই সে যখন নিজের দক্ষতাকে সকলের সামনে তুলে ধরে তখন সে নিজের আত্মশক্তিতেই বলীয়ান। নকল করে, সাময়িকভাবে কিছু মুনাফা করেই সে চলতে চায় না। আপনি যদি এমন একজন হন তবে আপনি সহজেই প্রতিযোগিতার ভিড় থেকে ভিন্ন পথে এগিয়েও জয়ী হবেন।

ব্যবসায় রেষারেষি করলে একটি সমস্যা আছে। রেষারেষি আস্তে আস্তে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, লোকজন মরীচিকা দেখে, দৃষ্টিভ্রম ঘটে—যেখানে সুযোগ নেই সেখানেও লোকজন সুযোগ দেখে। নব্বই দশকের পাগলামিটাই দেখুন। এই সময় অনলাইনে পোষা প্রাণীদের অনলাইন দোকান খোলার একটি হিড়িক পড়ে যায়। কিছু কোম্পানির নাম উল্লেখ করছি—Pets.com বনাম PetStore.com বনাম Petopia.com বনাম এ ধরনের আরও অসংখ্য নামের

অনলাইন দোকান। প্রতিটি কোম্পানিই তাদের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে প্রস্তুত। তারা লড়াই করতে এটাই উদ্গ্রীব হয়ে পড়ে যে, বাস্তবে কোনদিকে তাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার তাই তারা ভুলে যায়। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়—কুকুর জাতীয় খেলনার দাম সবচেয়ে কম রাখতে পারবে কোন কোম্পানি? কোন কোম্পানি সবচেয়ে ভালো রাগবি খেলার বলের বিজ্ঞাপন তৈরি করতে পারে?—এই কোম্পানিগুলো বাস্তবতা ভুলে দিগ্‌বিদিকশূন্য হয়ে পড়েছে। মূল প্রশ্ন হচ্ছে আসলে পোষা প্রাণীদের অনলাইন মার্কেটের চাহিদা আছে কি নাই। দেখেন জয়ী হওয়াটা তো নিশ্চয় পরাজয়ের চেয়ে ভালো। কিন্তু যেখানে সবাই হেরে যায় সেখানে আসলে লড়াই করাটাই বৃথা। যখন ডটকম নিয়ে ব্যবসায়িক বিপর্যয় ঘটলো তখন Pets.com এর দুই হাজার চারশ কোটি টাকার বিনিয়োগও এই ধসের সাথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

(Pets.com কোম্পানিটি ১৯৯৮ সালে বিরাট বিজ্ঞাপন নিয়ে বাজারে আসে। কিন্তু মাত্র দুই বছর তিন মাসের মাথায় ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে দেউলিয়া হয়ে যায়। আর এরই সাথে সাথে ডুবে যায় বিনিয়োগকারীদের দুই হাজার চারশ কোটি টাকা।)[১]

রেষারেষির আরো খারাপ দিক আছে। এখন অন্য একটি দিক চিন্তা করি। রেষারেষির ফলে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে সরে যাই এবং অদ্ভুত ও মারাত্মক ভুল করে বসি। আরও একটি উদাহরণ দিচ্ছি যেখানে শেকসপিয়ারের দ্বন্দ্ব তত্ত্ব কাজে লাগানো হয়েছে। ওরাকল (Oracle) কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী ল্যারি এলিসন এবং ওরাকল কোম্পানিরই উচ্চপদস্থ একজন বিক্রয় ব্যবস্থাপক থমাস সিবেল। এদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটে। সিবেল ১৯৯৩ সালে সিবেল সিস্টেমস (Siebel Systems) নামক একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। এতে করে এলিসন প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। কারণ তিনি চিন্তা করলেন সিবেল তার সাথে বেইমানি করেছে। আর সিবেল তার পূর্বোক্ত বস এলিসনের ছায়াতলে থাকাটা অপছন্দ করতেন। তারা দুজনেই যথেষ্ট সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। উভয়ই শিকাগোবাসী যারা বিক্রয় করার কাজটিকে ভালোবাসেন এবং

---

[১] https://en.wikipedia.org/wiki/Pets.com

হেরে যাওয়াটাকে ঘৃণা করেন। এজন্যই তাদের রেষারেষি আর দীর্ঘায়িত হলো। নব্বই দশকের অর্ধেক সময় ধরেই—এলিসন ও সিবেল—একে অপরের সাথে লড়াই করে চলেন। একবার তো এলিসন সিবেল কোম্পানির সামনে ট্রাকভর্তি আইসক্রীম স্যান্ডউইচ পাঠান যাতে সিবেল কোম্পানির কর্মচারীরা সিবেল কোম্পানি ছেড়ে ওরাকলে চলে আসে। স্যান্ডউইচ মোড়ানো কাগজে লেখা ছিলো—'আপনার কর্মজীবনকে সমৃদ্ধ করতে ওরাকলে যোগ দিন।'

এদিক দিয়ে ওরাকল ইচ্ছাকৃতভাবে আরও শত্রু তৈরি করলো। এলিসনের কথা হচ্ছে শত্রু থাকা ভালো যতক্ষণ না সে আপনাকে ঘায়েল করার মতো সক্ষম হয়। এতে করে কর্মচারীরাও উৎসাহ পায়। এজন্যই হয়তো এলিসন রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন যখন ১৯৯৬ সালে একটি ছোট ডাটাবেস কোম্পানি, নাম ইনফরমিক্স, ওরাকলের বিরুদ্ধাচরণ করে। ওরাকল কর্পোরেশনের হেড কোয়াটার হচ্ছে রেডউড নদীর তীরে। ওরাকল অফিসের রাস্তার সামনে ইনফরমিক্স একটি বিলবোর্ড টাঙায়। তাতে লেখা, 'সাবধান! ডাইনোসর আছে!' অন্য একটি বিলবোর্ডে লেখা, 'আপনি এইমাত্র রেডউড তীর পার করেছেন! আমরাও করেছি!'

ওরাকল এর বিপরীতে একটি বিলবোর্ড টাঙায় যেখানে বোঝানো হয় যে ইনফরমিক্সের সফটওয়্যার শামুকের চেয়েও ধীরে চলে। এরপর ইনফরমিক্সের প্রধান নির্বাহী ফিল হোয়াইট ঝগড়াটিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে গেলেন। কিছুদিন পরে হোয়াইট জানতে পারলেন ল্যারি এলিসন জাপানিজ সামুরাই খুব পছন্দ করেন। তিনি এবার একটি বিলবোর্ড টাঙালেন যেখানে একটি ভাঙা সামুরাই তলোয়ারের সাথে ওরাকলের লোগোকে দেখানো হচ্ছিল। যদিও বিলবোর্ডের বক্তব্যটি পুরোপুরি ওরাকলকে তাক করে দেওয়া হয়নি; বরং এলিসনকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু হোয়াইট হয়তো প্রতিযোগিতা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন এবং বিলবোর্ড বানানোর দিকে এত মনোযোগী ছিলেন যে, ইনফরমিক্সের অভ্যন্তরে বিশাল এক আর্থিক কেলেঙ্কারি ঘটে যায় অথচ তিনি টেরই পাননি। আর এই আর্থিক কেলেঙ্কারির জন্য হোয়াইটকে দ্রুতই জেলখানার হাওয়া খেতে হয়।

আপনি যদি একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাতে না পারেন, তবে সবচেয়ে ভালো

হয় তার সাথে একত্রিত হয়ে ব্যবসা করুন। আমি আমার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ম্যাক্স লেভচিনের সাথে মিলে ১৯৯৮ সালে কনফিনিটি নামক একটি কোম্পানি চালু করি। যখন আমরা এখান থেকে ১৯৯৯ সালে পেপাল পণ্যটি ছাড়লাম, তখন আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো ইলন মাস্কের এক্স ডটকম। এক্স ডটকম আমাদের অফিস থেকে মাত্র চারটি রাস্তা পার হলেই দেখা যায়। আমরা যাই বানাই, এক্স ডটকম হুবহু তার নকল করে যাচ্ছিল। ১৯৯৯ সালের শেষের দিকে, এই লড়াই চলাকালীন আমাদের অনেককে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। যদিও আমাদের মনোযোগ যে কেবল আমাদের নিজেদের পণ্যে উন্নতির দিকে ছিল তা বলা চলে না; আমরা বরং এক্স ডটকমকে কীভাবে পরাজিত করা যায় তাই চিন্তা করছিলাম। আমাদের এক প্রকৌশলী তো আস্ত এক বোমা তৈরি করে ফেলে যাতে এক্স ডটকমের অফিসকে উড়িয়ে দেওয়া যায়। যাইহোক, ব্যাপারটিকে আমরা পুরোপুরি নাকচ করে দিই।

কিন্তু এরচেয়েও ভয়ানক ব্যাপার হলো শেয়ার বাজারের ঊর্ধ্বগতি। তখন ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। আমি ও ইলন একে অপরের চেয়ে শেয়ার বাজারে যে প্রযুক্তিগত বুদবুদ তৈরি হচ্ছে তাই নিয়ে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ি। আমরা দুজনেই বুঝতে পারছিলাম এই বুদবুদ যখন ফেটে পড়বে তখন নিশ্চিত একটি ধস নেমে আসবে যা আমাদের লড়াই শেষ করার আগেই আমাদের উভয়কে ধ্বংস করবে।

ধরুন, পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও লর্ড ক্লাইভের যুদ্ধ হচ্ছে। এমন সময় প্রকাণ্ড এক ঘূর্ণিঝড়ে উভয় দলের সব সৈন্যরা মারা গেল। তাহলে যুদ্ধে কে জিতবে? উভয়ই পরাজিত। বাস্তবে এমন না হলেও ব্যবসায়িক জগতে এটা একটি সাধারণ ঘটনা। দুই কোম্পানি লড়াই করছে। হঠাৎ শেয়ারবাজার ধসে উভয় কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেলো। তাহলে লড়াইয়ের আর কী থাকে।

আমি (পিটার থিয়েল) ও ইলন মাস্ক উভয়ই এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলাম। তাই আমরা মার্চ মাসে এমন এক জায়গায় দেখা করলাম যেখানে বসে আলাপ

করা যায়। সাক্ষাতের জায়গাটি দুই অফিসের ঠিক মাঝখানে একটি রেস্তোরাঁয় ঠিক করা হলো। যদিও পূর্বের শত্রুতা ভুলে একত্রে কাজ করার চিন্তা করা কঠিন। তারপরও সমস্যা যেহেতু আমাদের একদম সামনে এসে পড়েছে তাই আমরা উভয়ই এই উপলব্ধি থেকে একত্রে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এজন্যই আমরা একত্রে থেকে, দলবদ্ধভাবে ডটকম ধসের মধ্য দিয়েই ভালোভাবে বেঁচে ফিরতে পেরেছি।

দেখুন, কিছু সময় তো লড়াই করতেই হয়। এটা হয়তো তখন আবশ্যিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে, আপনাকে লড়াই করেই জিততে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো আপনি কোন সমঝোতার জায়গা পাবেন না। তখন হয় আপনি কোনো মারামারি করবেন না; না-হয় এমন আঘাত করুন যাতে লড়াইটি একবারেই শেষ হয়ে যায়।

যদিও পরামর্শটি মেনে চলা কঠিন কারণ আপনার গর্ব ও সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। এজন্যই *হ্যামলেটে* আছে :

Audilua.com

Exposing what is mortal and unsure
To all that fortune, death, and danger dare,
Even for an eggshell. Rightly to be great
Is not to stir without great argument,
But greatly to find quarrel in a straw
When honor's at the stake.

হ্যামলেটের ব্যাপারটি হচ্ছে, মহান বলতে তিনি এমন একটি ইচ্ছাকে বুঝিয়েছেন, যে ইচ্ছার কারণে মানুষ ডিমের খোসার মতো পাতলা কারণেও লড়াই করে। গুরুতর ব্যাপার নিয়ে তো যেকেউ লড়াই করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত নায়ক তো সেই যে নিজের ব্যক্তিগত সম্মানকে এতটাই গুরুতরভাবে নেয় যে, সে এমন

জিনিসের জন্যও লড়াই করে যা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে ততটা গুরুতর মনে হয় না। এটা মানব চরিত্রের একটি বিচিত্র দিক। কিন্তু তাই বলে এটা ব্যবসায়ও খাটবে তা নয়। ব্যবসায় এই গুণটি একটি সর্বনাশা ব্যাপার। যদি আপনি প্রতিযোগিতাকে নিজের কোম্পানি ও পণ্যের উন্নতির জন্য দেখেন তাহলে ভালো; নাহলে এই দৃষ্টিভঙ্গিই আপনার কোম্পানির জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। এই নেতিবাচক মনোভাব আপনাকে পাগল করে তুলবে। আগামী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে কীভাবে আপনি আপনার মাথাকে শান্ত রেখে একটি একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে তুলতে পারেন।

Audilua.com

পাঁচ

শেষে থাকলে যে সুবিধা

এখন আপনি নিশ্চয় প্রতিযোগিতা থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চান। বেশ ভালো। এতে করে আপনি একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারবেন। ছোট ছোট ক্ষেত্রে অনেকে একচেটিয়া ব্যবসাও করতে পারে। কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসাও একটি বিশাল বড় কোম্পানিতে পরিণত হতে পারে যদি এটা ভবিষ্যতেও টিকে থাকার চিন্তা করে। আমি এখানে নিউইয়র্ক টাইমস (New York Times) কোম্পানি ও টুইটারকে (Twitter) তুলনা করছি। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই কয়েক হাজার লোকজনকে কাজ দিচ্ছে এবং লাখো লোকজনকে সংবাদ পাওয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু টুইটার যখন ২০১৩ সালে শেয়ার বাজারে এলো তখন এর মূল্য ধরা হয় ১ লাখ ৯২ হাজার কোটি টাকা (ডলার প্রতি ৮৮০ ধরে)। টাইমসের বাজার মূল্যের ১২ গুণ বেশি। যদিও টাইমস এর আগের বছর ২০১২ সালে ১ হাজার চৌষট্টি কোটি টাকা আয় করে এবং টুইটার কিছু আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তারপরেও পরের বছর টুইটারের শেয়ার বাজার মূল্য কতটা বিশাল!

এটার কারণ হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো। প্রথমে শুনলে হয়তো অদ্ভুত লাগবে যে, টাইমস তখন লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিলো কিন্তু টুইটার ততটা ছিলো না। তারপরেও টুইটারের মূল্য অনেক বেশি। তার কারণ একটি কোম্পানি তখনই বিশাল বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় যখন *এর ভবিষ্যৎ মূল্য* বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগকারীরা দেখলেন টুইটার আগামী দশকে পুরোপুরি একচেটিয়া

ব্যবসা করবে, যেখানে সংবাদপত্রের দিন শেষ হয়ে আসছে।

সোজা কথায় বললে, একটি ব্যবসার বর্তমান মূল্য হচ্ছে যা কিছু ভবিষ্যতে আয় করবে। আপনি যদি একটি ব্যবসার মূল্য নির্ধারণ করতে চান তবে ব্যবসাটির ভবিষ্যৎ চিন্তা করুন। কারণ আজকে ১ কোটি টাকার যে মূল্য তা ভবিষ্যতের ১ কোটি টাকার চেয়ে বেশি মূল্যবান। কারণ আজকের ১ কোটি টাকার বিনিয়োগ, যত সময় গড়াবে তত বেশি এর মূল্য বাড়বে।

নিম্ন মানের উদ্যোগ আর উচ্চ মানের উদ্যোগের মধ্যে তফাত করে দেয় এই ভবিষ্যৎ মূল্য—ভবিষ্যতে একটি কোম্পানি কতটা আয় করবে। বেশিরভাগ নিম্ন মানের উদ্যোগে চিন্তা করা হয় অল্প সময়ের মধ্যে কতটা আয় করে নেওয়া যায়। ধরুন সংবাদপত্রের মতো একটি ব্যবসায়িক কোম্পানি, যাকে আমরা পুরাতন অর্থনীতির একটি ব্যবসা বলে সংজ্ঞায়িত করি, তা বেশি হলে পাঁচ-ছয় বছর লাভজনক হিসেবে থাকবে। যদি এটা তার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে তো। এসব ক্ষেত্রে যেকোনো সময় নতুন কোন প্রতিযোগী এসে তার মুনাফা থেকে ভাগ নিতে পারে। আরও ভালো উদাহরণ হচ্ছে নাইটক্লাব বা রেস্তোরাঁগুলো। এগুলোতে হয়তো আপনি একরাতে অনেক টাকা মুনাফা করতে পারেন। কিন্তু আগামীদিন মুনাফা করবেন এটা বলা যায় না। কারণ সামনে এমন একদিন আসবে যখন গ্রাহকরা অন্য কোন নতুন রেস্তোরাঁ বা ক্লাবে সময় কাটাবে।

কোম্পানির ভবিষ্যৎ মূল্য
কীভাবে হ্রাস হচ্ছে তার চিত্র

কিন্তু প্রযুক্তিগত কোম্পানিগুলোর চিত্র এটার ঠিক উল্টো। প্রায়ই দেখা যায় প্রযুক্তিগত একটি কোম্পানি প্রথম কিছু বছর কেবল *লস* দিয়ে যায়। মূল্যবান জিনিস তৈরি করতে সময় লাগে। এর মানে হচ্ছে মুনাফা আসতে দেরি আছে। এজন্য বেশিরভাগ প্রযুক্তিগত কোম্পানিগুলোর মূল্য বোঝা যায় কমপক্ষে ১০-১৫ বছর পরে।

২০০১ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। তখনও পেপাল এতটা মুনাফা করেনি। কিন্তু আমাদের আয় প্রতি বছর বছর ১০০% করে বাড়ছে। যখন আমি ভবিষ্যৎ আয়ের একটি চিত্র আকঁলাম, তখন দেখলাম আমাদের কোম্পানির আসল মুনাফা আসবে ২০১১ সালের পর। একটি কোম্পানি যার বয়স মাত্র ২৭ মাস, তার জন্য এই ধরনের চিন্তা করা কঠিন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো আমি যে অনুমান করেছিলাম তারচেয়েও বেশি মুনাফা এসেছে। আজ পেপাল প্রতি বছর ১৫% করে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই এই পর্যবেক্ষণ থেকে বলা যায়, বেশিরভাগ প্রযুক্তিগত কোম্পানিগুলো মূল্য আসবে ২০২০ সালের পর থেকে।

আরেকটি ভালো উদাহরণ হচ্ছে লিংকডইন (LinkedIn), যার পুরো মূল্যই নিহিত অদূর ভবিষ্যতে। ২০১৪ সালের শুরুর দিকে এর বাজার মূলধন ছিলো ১ লাখ ৯৬ হাজার কোটি টাকা। অথচ ২০১২ সালে তাদের মোট আয় ছিলো ১শ ৭২ কোটি ৮০ লাখ টাকা। আপনি যখন এই সংখ্যা দেখছেন তখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এমন একটি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার জন্য বিনিয়োগকারীরা পাগল হয়ে ওঠে। তবে আপনি যখন লিংকডইনের ভবিষ্যৎ মূল্য বিবেচনা করবেন তখন এই পাগলামির যথার্থতা ধরতে পারবেন।

একটি প্রযুক্তিগত কোম্পানির ভবিষ্যৎ মূল্য কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার চিত্র (লিংকডইন)

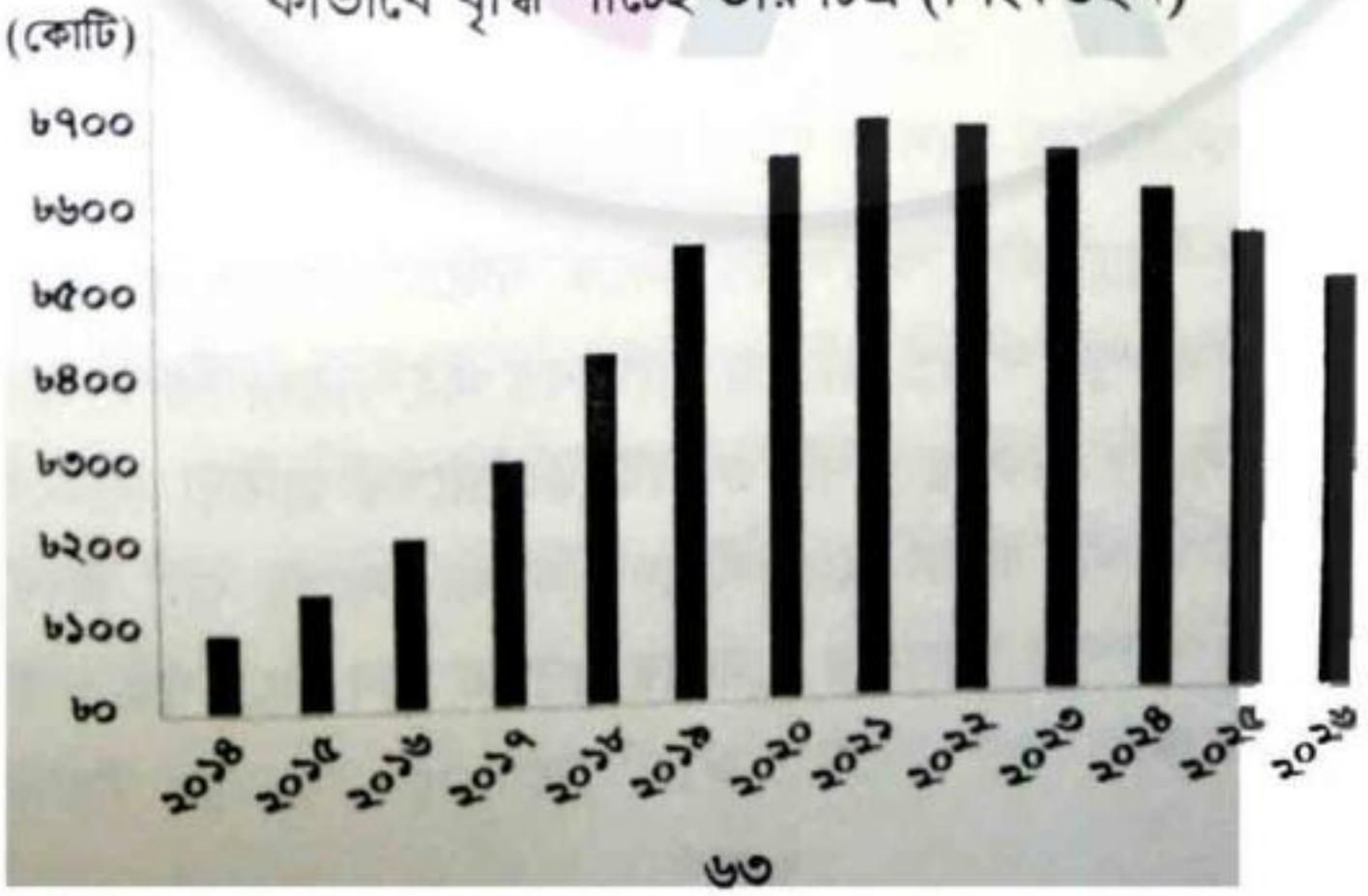

ভবিষ্যৎ মুনাফা বিবেচনা করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি এটা সিলিকন ভ্যালির যেকোনো প্রযুক্তিগত কোম্পানির জন্যই সত্য। একটি কোম্পানিকে মূল্যবান হতে গেলে একে অবশ্যই বেড়ে উঠতে হবে ও টিকে থাকতে হবে। কিন্তু বেশিরভাগ উদ্যোক্তারা কেবল স্বল্পমেয়াদি চিন্তা করে। তারা নানান অজুহাত দিয়ে যায়। আসল কথা হচ্ছে অগ্রগতি তো সহজেই পরিমাপ করা যায়, কিন্তু স্থায়িত্ব থাকবে বা টেকসই হবে কিনা তাই তো মূল প্রশ্ন। কিছু অপরিপক্ক লোক আছে যারা পাগলের মতো কতো লোক এক সপ্তাহে ওয়েবসাইট দেখে, মাসিক আয় কত, তিনমাসের আয়ের প্রতিবেদন দেখেই বিনিয়োগ করে ফেলে। যাইহোক, এই পরিসংখ্যান তো যেকেউ দেখতে পারে, কিন্তু তারপরেও সবচেয়ে গভীর যে ব্যাপারটি তা হলো, ভবিষ্যতে এমন কী সমস্যা আসবে যা অতিক্রম করে আপনার কোম্পানিটি টেকসই হবে।

স্বল্পমেয়াদি চিন্তার দুইটি উদাহরণ দিচ্ছি। গ্রুপঅন (Groupon) ও জিংগা (Zynga) কোম্পানি এই স্বল্পমেয়াদির ভালো উদাহরণ। জিংগা কোম্পানি হচ্ছে একটি গেম উৎপাদনকারী কোম্পানি। তাদের সবচেয়ে দ্রুত চলা গেম হচ্ছে ফার্মভিল। তাদের দাবি ছিলো গেমটি মানুষের 'বুদ্ধিমত্তাকে বাড়িয়ে তুলছে।' তাই তারা তৎক্ষণাৎ ফলাফল দেখে একই ধরনের আরও গেম বানাতে লাগলো। অবশেষে তারা সেই একই সমস্যায় পড়লো যে সমস্যার মুখোমুখি হয় প্রতিটি হলিউড স্টুডিও—একটি পরিবর্তনশীল দর্শকের জন্য কীভাবে আপনি বিনোদনের ধারা বজায় রাখবেন? (এটা কেউই জানে না।) অন্যদিকে গ্রুপঅন কোম্পানিও ছিলো দ্রুত এগিয়ে যাওয়া একটি কোম্পানি। কিন্তু বারবার গ্রাহকদের ক্রয়ের জন্য ফিরিয়ে আনাটাই তার জন্য অনেক বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা ব্যাপারটিকে যতটা কঠিন চিন্তা করেছিলো আসলে ঘটনা তারচেয়েও ভয়াবহ।

আপনি যদি স্বল্পমেয়াদি অগ্রগতির দিকে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেন তবে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন : এই ব্যবসা কি আজকে থেকে এক যুগ পরেও চলবে? এক যুগ পরেও এই উদ্যোগের চাহিদা থাকবে কিনা? ওয়েবসাইটের ভিউ সংখ্যা বা ব্যবহারকারীদের সংখ্যা দেখেই এই উত্তর দেওয়া যায় না। আপনাকে অবশ্যই আপনার ব্যবসার গুণগত মান নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

একচেটিয়া কোম্পানির বৈশিষ্ট্য

ভবিষ্যৎ মূল্য বেশি এমন একটি কোম্পানিকে আমরা চিনবো কী করে? প্রতিটি একচেটিয়া কোম্পানিই অনন্য, অসাধারণ, কিন্তু তারা সাধারণত কিছু নীতি অনুসরণ করে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে—প্রযুক্তির মালিকানা, সংঘবদ্ধ প্রভাব, অর্থনীতির মাত্রা এবং সুনাম তৈরি করা।

তারপরেও আমাকে বলতে হচ্ছে, এটা এমন কোন নিশ্চিত তত্ত্ব নয় যে, এগুলো মানলেই আপনার কোম্পানি রাতারাতি দাঁড়িয়ে যাবে—একচেটিয়া ব্যবসার কোন শটকাট নেই। তবুও এই বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে রাখা ভালো। কারণ এগুলো আপনাকে চিন্তা করতে সহায়তা করবে—কীভাবে আপনি আপনার কোম্পানিকে টেকসই করবেন।

১। প্রযুক্তির মালিকানা

একটি কোম্পানির জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে প্রযুক্তির মালিকানা থাকা। কারণ এর ফলে আপনার পণ্যের নকল হওয়া কঠিন বা অসম্ভব হয়ে যায়। গুগলের সার্চ এলগরিদমের কথাটি চিন্তা করুন। গুগলের সার্চ পেইজটি খুবই সহজ, সরল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লোড হয়ে যায়। ২০০০ সালের শুরুর দিকে গুগল যখন অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিন কোম্পানির পাশাপাশি বাজারে আসে, তখন গুগল যা করেছে তা অন্য কোন কোম্পানির জন্য কঠিন ছিলো। (কোনো রকম বিজ্ঞাপন না দিয়ে কেবল সার্চ করার জন্য একটি পৃষ্ঠা আনা কঠিন। কারণ বিজ্ঞাপন থেকেই তো টাকা আয় হয়।)

যেহেতু আমাদের আজকের বাজার অনেক বেশি ভিড়ে পরিপূর্ণ, তাই কোনো রকম ঠিকঠাক করে আনা একটি পণ্য বাজারে বিক্রয় করা কঠিন। কিন্তু আপনি যদি ১০ গুণ উন্নত কোনো পণ্য আনেন এবং এই প্রযুক্তির মালিকানা আপনার থাকে তবে এটাই আপনাকে একটি সত্যিকার একচেটিয়া ব্যবসার দিকে নেতৃত্ব দিবে।

বুঝতেই পারছেন, ১০ গুণ উন্নত কোনো পণ্য আনতে হলে সবচেয়ে

সরাসরি পথ হচ্ছে অভিনব কিছু উদ্ভাবন করা। যদি আপনি এমন কোন মূল্যবান পণ্য উদ্ভাবন করতে পারেন যা আগে কেউ করে দেখাতে পারেনি, তবে এটা দ্বারা মুনাফার পরিমাণও হবে অসীম। উদাহরণ স্বরূপ, ঘুম যাওয়ার জন্য কোনো ধরনের নিরাপদ ঔষধ বা টাক দূর করার কোনো সমাধান। এই ধরনের উদ্ভাবন নিঃসন্দেহে একচেটিয়া ব্যবসা দাঁড় করাবে।

অথবা আপনি বিদ্যমান কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেন। আর যখন সমাধানটি ১০ গুণ উন্নত হয়ে যাবে তখন আপনি প্রতিযোগিতার ভিড় থেকে বের হয়ে যাবেন। আপনি হয়ে উঠবেন একজন একচেটিয়া ব্যবসায়ী। ধরুন, পেপাল। পেপালের কারণে ই-বে এর পণ্য বেচা-কেনা প্রায় ১০ গুণ সহজ ও উন্নত হয়ে যায়। আগে ই-বে তে ডাকে চেক পাঠাতে হতো। যাতে ৭ থেকে ১০ দিন সময় যেতো। কিন্তু পেপালের কারণে ক্রেতারা খুব সহজেই, খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদের টাকা পরিশোধ করার সুযোগ পায়। বিক্রেতারা সাথে সাথেই টাকা পেয়ে যায়। চেকের জন্য দীর্ঘ সময় তাদেরকে অপেক্ষা করতে হয় না।

ঠিক একইভাবে আমাজনও ১০ গুণ উন্নত সুবিধা নিয়ে হাজির হয়। তারা যেকোনো বই দোকানের চেয়ে ১০ গুণ বেশি বই নিয়ে পাঠকের সামনে হাজির হয়। ১৯৯৫ সালে আমাজন যখন তার ওয়েবসাইট প্রকাশ করে, তখন এর ভাষ্য ছিল 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান'। তখন এর অধীনে বই ছিল ১,০০,০০০। আমাজনের কোনো বাস্তবিক দোকান দরকার হয়নি। এটা খুব সহজেই বইয়ের তালিকা করে, পাঠক বইয়ের শিরোনাম লিখে বইটির জন্য অনুরোধ করে এবং আমাজন প্রকাশক থেকে বইটি নিয়ে আসে। এই পদ্ধতি এতই উন্নত ছিল যে, আমাজন শেয়ারবাজারে আসার ঠিক তিনদিন আগে একজন অসন্তুষ্ট প্রকাশক আমাজনের নামে মামলা করে। প্রকাশকের অভিযোগ ছিল আমাজন নিজেকে 'বইয়ের দোকান' দাবি করে। অথচ তা কেবল একটি 'বই বিক্রয়ের মাধ্যম'।

যাইহোক, আমাজন যে টিকে আছে তা দেখেই বোঝা যায় এমন অভিযোগের ভিত্তি খুবই দুর্বল। এবার অন্য একটি দিক নিয়ে আলোচনা করি। আপনি ইচ্ছা করলে নকশা করেও একটি বিরাট পরিবর্তন আনতে পারেন। ২০১০ সালে আগে টেবলেট কম্পিউটারের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। মাইক্রোসফটের

উইন্ডোজ টেবলেট বা নোকিয়ার ইন্টারনেট টেবলেট, কোনটাই চালানো সহজ ছিল না। এরপর এলো অ্যাপল আইপ্যাড। যদিও নকশার দিক থেকে উন্নতিটা পরিমাপ করা কঠিন ছিল কিন্তু এর ব্যবহারিক দিক ছিল চমৎকার। অবশেষে এমন টেবলেট এলো যা ব্যবহার করা সহজসাধ্য।

২। নেটওয়ার্কের প্রভাব

একটি পণ্য যত বেশি ব্যবহারযোগ্য হবে তত বেশি লোকজন এটা ব্যবহার করবে। আর এখানেই আপনার নেটওয়ার্ক তৈরি হবে। পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণে এই নেটওয়ার্ক আপনাকে অনেক সুবিধা দিবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি আপনার বন্ধু-বান্ধব সবাই ফেসবুক চালায় তবে দেখা যাবে আপনিও ফেসবুকে যোগ দিবেন। এখানে অন্য কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা অদ্ভুত দেখায়।

হ্যাঁ এটা সত্য যে, নেটওয়ার্কের প্রভাব খুব শক্তিশালী একটি ব্যাপার। কিন্তু এটা তখনই শক্তিশালী হয়ে উঠবে যখন আপনার পণ্যটি আসলেই মানুষের কাজে লাগে এমন একটি পণ্য হবে। ধরুন, যানাডু প্রকল্প। এই প্রকল্প আরম্ভ হয় ১৯৬০ সালের দিকে। তখনও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ছিল না, লেখার জন্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতো সফটওয়্যার ছিল না। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন টেড নেলসন। তিনি একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরির চেষ্টা করছিলেন। তবে প্রযুক্তির একটাই সমস্যা—নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হলে সবগুলো কম্পিউটারকে ঠিক একই সময়ে লগ ইন করতে হবে। যা সম্ভব ছিল না। তাই প্রকল্পটি বরফে ঢাকা পড়ে গেল।

এর বিপরীত একটি উদাহরণ দিচ্ছি। নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য আপনাকে প্রথমে খুব ছোট ও বিশেষ জায়গা থেকে আরম্ভ করতে হবে। যেমন হার্ভাডের ছাত্র—মার্ক জাকারবার্গ ফেসবুক দিয়ে আরম্ভ করেন। তার প্রথম গ্রাহক ছিল সহপাঠীরা। প্রথমে তিনি পুরো বিশ্বের মানুষকে যুক্ত করার চেষ্টা নিয়ে নামেননি। এজন্যই এমবিএ এর ছাত্রদের দিয়ে ব্যবসার জন্য সফল নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায় না। প্রাথমিকভাবে এই ধরনের বাজারগুলো এত ছোট থাকে যে, এখানে কোন সুযোগ থাকতে পারে এটাই বোঝা যায় না।

৩। অর্থনৈতিক মাত্রা বা পরিধি

এবার বলি আয়-ব্যয় নিয়ে। একটি একচেটিয়া ব্যবসা যত শক্তিশালী হয়ে ওঠে ততই বড় হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে পণ্য উৎপাদনের খরচ (বাজারজাত, ব্যবস্থাপনা, অফিস খরচ) স্থির হয়ে যায়। তখন থেকেই মুনাফা আসা আরম্ভ হয়। একটি সফটওয়্যার নির্মাণের কথা বলি। এটা বেশ সুবিধাজনক। কারণ একবার আপনি একটি সফটওয়্যার নির্মাণ করলেন, এরপর কেবল কপি করে যাবেন। অথচ পণ্যের উৎপাদন খরচ প্রায় শূন্যের ঘরে।

অবশ্য অনেক ব্যবসাই আছে যেগুলোতে এভাবে কপি করা যায় না বা সুবিধাগুলো একদম সীমিত থাকে। যেমন সেবামূলক ব্যবসাগুলোর জন্য একচেটিয়া ব্যবসা করাটা একটু কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি যদি একটি যোগব্যায়াম কেন্দ্র খোলেন, আপনি কেবল একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকজনকে সেবা দিতে পারবেন। আপনি হয় আরও প্রশিক্ষক নিয়োগ দিলেন এবং অন্যান্য জায়গায়ও এটার শাখা খুললেন কিন্তু তারপরেও আপনার মুনাফা খুব কমই থাকবে। আপনি কখনোই লাখো লোককে সেবা দিতে পারবেন না, যেটা করা একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে খুব সহজ।

একটি ভালো উদ্যোগের লক্ষণ হচ্ছে সম্ভাবনা। উদ্যোগের শুরু থেকেই এর মধ্যে একটি উদীয়মান সম্ভাবনা বিরাজ করবে। আজকে টুইটারের ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি মানুষ। টুইটারের মধ্যে আর কোন অতিরিক্ত জিনিস যোগ করার দরকার নেই। আর এজন্যই টুইটারের অগ্রগতি কখনো থামবে না।

৪। মার্কা

একটি কোম্পানি তার মার্কার মধ্যেই কোম্পানির সংজ্ঞা প্রদান করে থাকে। কোম্পানির নামের মধ্যে, ব্যবহৃত প্রতীকের মাধ্যমে ও স্লোগানের মাধ্যমে তার প্রতিষ্ঠানের সুনাম সৃষ্টি করে। আজকের দিনে সবচেয়ে শক্তিশালী মার্কা হচ্ছে অ্যাপল। (এটা লেখক পূর্বের তথ্য দিয়েছেন। বর্তমানে ২০১৭ এর প্রতিবেদনে সবচেয়ে শক্তিশালী মার্কা হচ্ছে গুগল।) যাইহোক, অ্যাপল সম্পর্কেই বলি। অ্যাপল খুব সতর্কভাবে তাদের পণ্যগুলো চয়ন করেছে, যেমন আইফোন ও

ম্যাকবুক, অ্যাপলের বিক্রয়কেন্দ্রগুলো, নকশায় পরিবর্তন করেছে এবং গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা থেকে পণ্যের উন্নয়ন। অ্যাপলের বিজ্ঞাপনও ছিল সর্বত্র বিরাজমান। আর এর সাথে ছিল স্টিভ জবসের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও সাধনা। এভাবে অ্যাপল নিজেই নিজের একটি মার্কামারা সুনাম তৈরি করতে সক্ষম হয়।

অনেকেই অ্যাপলের সাফল্য থেকে শেখার চেষ্টা করেছে—বিজ্ঞাপনে অনেক খরচ করেছে, বিক্রয়কেন্দ্র নিয়েছে, পণ্য তৈরিতে দামী উপাদান ব্যবহার করেছে, টাকা দিয়ে প্রতিবেদন ছাপিয়েছে এবং বহু টাকা খরচ করে নকশাও নকল করেছে। কিন্তু অ্যাপলের হার্ডওয়্যার (যেমন উন্নতমানের টাচস্ক্রিন) ও সফটওয়্যার (যেমন টাচস্ক্রিন ইন্টারফেস, কেবল বিশেষ বিশেষ উপাদানেই তা কাজ করে) উভয়ই খুবই জটিল প্রকৃতির। এটা এত পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করতো যাতে এই ধরনের জটিল জিনিস বানানো উৎপাদন খরচ ও পণ্যের দাম আয়ত্তের মধ্যে থাকে। অ্যাপল তার নেটওয়ার্কের প্রভাবও খুব ভালোভাবে কাজে লাগায়। হাজারো ডেভেলপার অ্যাপলের জন্য সফটওয়্যার বানাতো এবং লাখো ব্যবহারকারী অ্যাপলের পণ্য ব্যবহার করতো। ব্যবহারকারীরা অ্যাপলের সাথে আছে, কারণ যা যা দরকার তার সবই এখানে পাওয়া। একচেটিয়া ব্যবসার এই দিকটিও বেশ সুবিধাজনক। মার্কার কারণে এটা হয়েছে তা বলা যায় না। এই ব্যাপারগুলো পুরোপুরি মৌলিক। ব্যবহারকারীরা, সফটওয়্যার ডেভেলপাররা ও অ্যাপল স্টোরের অ্যাপগুলো অ্যাপলের মার্কাকে আর শক্তিশালী করে তোলে। আর এটাই অ্যাপলের একচেটিয়া ব্যবসাকে ত্বরান্বিত করে। এখন আপনি বাংলায় মার্কা বলেন বা ইংরেজিতে ব্র্যান্ড বলেন, যাই বলেন না কেন, যদি আপনার কোম্পানির পণ্য মানুষের জন্য কোন উপকারী সেবা সম্পন্ন করতে নাই পারে তবে এর কোন মূল্য নেই। এখন এমনই একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

যেকোনো কোম্পানির সারবস্তু বাদ দিয়ে যদি মার্কা নিয়ে ব্যবসা করতে চান তা হবে খুবই বিপদজ্জনক। যেমন ইয়াহুর সিইও ম্যারিসা ম্যায়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি ২০১২ সালের মাঝামাঝি থেকে ইয়াহুর সিইও পদে বসেন। তিনি একটি ছোট্ট টুইট দিয়েই তার পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেন—'মানুষ, তারপর পণ্য, তারপর আরও মানুষ ওয়েবসাইট দেখতে আসবে, তারপর আয় বাড়বে'। নতুন করে ইয়াহুর লোগো নকশা করা হয়। এটা অনেকটা তরুণ ইয়াহু হিসেবে দেখানোর

চেষ্টা করা হয়। অনেকটা টাম্বলার (Tumblr) কোম্পানির উদ্যোগের মতো। ইয়াহু নতুন করে মিডিয়ার নজরে পড়ে। এটার কারণও আছে, ম্যায়েরে নিজস্ব নেটওয়ার্কের কারণে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে ইয়াহু আসলে কী উৎপাদন করে! যখন স্টিভ জবস অ্যাপলে ফিরে আসে সে কেবল অ্যাপলকে কাজ করার জন্য একটি অসাধারণ জায়গায় পরিণত করেনি; বরং সে অন্য বহু জিনিসও বাদ দিয়েছে যাতে অল্প কিছু পণ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া যায় এবং ১০ গুণ উন্নত পণ্য নির্মাণ করা যায়। কোন প্রযুক্তিগত কোম্পানিই কেবল মার্কার ওপর বেঁচে থাকতে পারে না।

একটি একচেটিয়া ব্যবসা নির্মাণ

আমরা এখানে মার্কা, অর্থনৈতিক পরিধি, নেটওয়ার্ক ও প্রযুক্তি দিয়ে একটি একচেটিয়া ব্যবসার সংজ্ঞা দিলাম। কিন্তু এগুলোকে নিয়ে একত্রে কাজ করতে গেলে আপনাকে একটি বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে। সেটা হচ্ছে–আপনার বাজার। আপনার বাজারটিকে খুব সতর্কতার সাথে চয়ন করতে হবে এবং এটাকে ধীরে ধীরে বড় করতে হবে।

ছোট্ট কোনো জায়গা থেকে আরম্ভ করুন এবং একচেটিয়া চালিয়ে যান

আপনি যেকোনো উদ্যোগের দিকে তাকান, দেখবেন প্রতিটি উদ্যোগই প্রথম প্রথম খুব ছোট্ট জায়গা থেকে আরম্ভ হয়েছে। *এজন্যই, প্রতিটি উদ্যোগের উচিত খুব ছোট্ট একটি বাজার দিয়ে আরম্ভ করা।* প্রথম প্রথম আপনি ভুল করবেন এটাই স্বাভাবিক। তাহলে তা ছোট জায়গা থেকেই করছেন না কেন? এটার সুবিধাও আছে। আপনি একটি বড় বাজারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট বাজার নিয়ে যদি কাজ করেন তবে বাজারের ওপর আপনি খুব সহজেই কর্তৃত্ব করতে পারবেন। আর আপনি যদি চিন্তা করেন আপনার প্রাথমিক বাজার হয়তো খুব বড় হতে পারে, তাহলে দেখা যায় বাজার আসলেই বড় এবং সেই বড় বাজারে আপনার দোকানটি কোনো এক কোণার ছোট্ট দোকান।

এখন ছোট্ট মানে বাজারবিহীন কিছু নয়। আমরা পেপালের শুরুর দিকে ঠিক এই ভুলটিই করেছিলাম। আমাদের প্রথম পণ্য ছিল পামপাইলটস (PalmPilot)। এর মাধ্যমে লোকজন টাকা লেনদেন করত। এটা বেশ আকর্ষণীয় একটি পণ্য ছিল। আর আমরা ছাড়া এটা তখন অন্য কেউই করত না। যাইহোক, আমাদের লাখো ব্যবহারকারী ছিল যারা পামপাইলটস ব্যবহার করত, কিন্তু তারা কোনভাবেই একে অপরের সাথে সংযুক্ত ছিল না। এমনকি দেখা গেল, তারা পামপাইলটস হঠাৎ হঠাৎ ব্যবহার করত। আস্তে আস্তে দেখা গেল, আমাদের পণ্যটি কারও দরকার নেই, তাই আমাদের কোন গ্রাহকও নেই।

এই সমস্যা থেকে আমরা আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করি। এরপর আমরা ইবে'র (ebay) নিলামের দিকে নজর দিই, যেখানে আমরা আমাদের প্রথম 'সাফল্য' খুঁজে পাই। সেই ১৯৯৯ সালের দিকে, ইবে'তে বেশ ভালো 'ক্রেতা-বিক্রেতা' ছিল। আমরা টানা তিন মাস কঠোর পরিশ্রম করি। এতে করে আমরা ইবে'র ক্রেতা-বিক্রেতাদের প্রায় ২৫% কে সেবা দেওয়ার সুযোগ পেলাম। এতে করে আমরা বুঝতে পারলাম, আমাদের পণ্য যেখানে দরকার এমন জায়গায়, নির্দিষ্ট জায়গায় হাজার খানেক লোকজনকে যদি সেবা দেওয়া যায়, তা অনেক ভালো ফলাফল নিয়ে আসবে। লাখো বিক্ষিপ্ত জনগণের চেয়ে নির্দিষ্ট জায়গার হাজারো লোক অনেক ভালো।

একটি উদ্যোগের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বাজার হচ্ছে একটি ছোট্ট জায়গার বিশেষ কিছু লোকজন, যেখানে অন্য কেউ সেবা দেয় না বা কোনো প্রতিযোগী নেই। উদ্যোগের প্রথম দিকে যেকোনো ধরনের বড় বাজার চয়ন করাটা ঠিক সিদ্ধান্ত নয়। কারণ বড় বাজারগুলো এমনিতেই প্রতিযোগী কোম্পানি দিয়ে ভরপুর। তাই যখনই কোন উদ্যোক্তা একটি ১০০ কোটি টাকার বাজারের ১% পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলে, তাকে এড়িয়ে চলুন। কারণ বাস্তব চিত্র পুরোপুরি ভিন্ন। একটি বড় বাজার দিয়ে আরম্ভ করলে হয় সে আরম্ভটি ভালো করে করতে পারে না, না-হয় সে নিজেকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ঠেলে দিয়েছে যেখান থেকে ১% অর্জন করাও খুব কঠিন। আর যদি আপনি সামান্য কিছু লাভ করেও থাকেন তবে আপনাকে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কারণ বাজার চরম প্রতিযোগিতাপূর্ণ। বাজার যখন চরম প্রতিযোগিতাপূর্ণ তখন মুনাফা থাকে শূন্যের কোটায়।

পরিধি বা বিস্তৃতি বাড়ানো

এবার আপনি যখন একটি নির্দিষ্ট বাজার নিয়ে কাজ করছেন, এই বাজারে কর্তৃত্ব করছেন, তখন আপনি ধীরে ধীরে আপনার বাজারটিকে বড় করবেন। আপনার বাজারের আশেপাশে আনুষঙ্গিক বিষয়ের দিকে নজর দিন। আস্তে আস্তে আপনার সেবার পরিধি বৃদ্ধি করুন। এটা কীভাবে করতে হয় তা আমরা আমাজন থেকে শিখতে পারি। জেফ বেজোসের রূপকল্প ছিলো সে পুরো অনলাইন মার্কেটে রাজত্ব করবে, কিন্তু সে সবকিছু নিয়ে আরম্ভ করেনি; বরং সে কেবল বই নিয়ে আরম্ভ করেছে। যদিও বইয়ের প্রকার, ধরন ও বিষয় অনেক, লাখো বই বাজারে আছে, তবুও তাদের বিন্যাস করাটা সহজ। এছাড়াও এগুলো পাঠানো, সংগ্রহ করা ও বিক্রয় করা সুবিধাজনক। এমনকি বাস্তবে একটি দোকান নিয়ে বসে থাকার চেয়ে অনলাইনে লাখো গ্রাহকের কাছে পৌঁছানো একটি সাধারণ ব্যাপার। আবার কিছু দুর্লভ বইও আছে। এভাবে আমাজন খুব নির্দিষ্টভাবে কিছু আগ্রহী লোকজনকে সেবা দেয় যারা বই সম্পর্কে আগ্রহী। এভাবে আমাজন আস্তে আস্তে বইয়ের জগতে কর্তৃত্ব করা শুরু করল। আপনি যতদূরেই থাকেন না কেন, আপনার আশেপাশে কোন বইয়ের দোকান থাকুক আর নাই থাকুক অথবা আপনি যত দুর্লভ জিনিসই খোঁজেন না কেন, আপনি আমাজনে পাবেন। এই বিশ্বাস ও আস্থা আমাজন তৈরি করেছে। এরপর আমাজনের হাতে ছিল দুইটি সুযোগ–এক, যারা বই পাঠ করে তাদের সংখ্যা বাড়ানো; দুই, বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত বাজার নিয়ে কাজ শুরু করা। আমাজন কোনটি চয়ন করেছে? আপনি ঠিকই ধরেছেন—দ্বিতীয়টি। আমাজন বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত বাজার নিয়ে কাজ শুরু করল : সিডি, ডিভিডি ও সফটওয়্যার। আমাজন এইভাবে আস্তে আস্তে তাদের পণ্য তালিকা বৃদ্ধি করতে লাগল। আর ধীরে ধীরে আমাজন হয়ে উঠল বিশ্বের একটি মুদি দোকান। (মুদি দোকান মানে যে দোকানে সবই পাওয়া যায়।) এমনকি আমাজন নামটির মধ্যেও এর পরিধি ও পরিকল্পনা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। আমাজন বনের বৈচিত্রতা যেমন আমাদের মুগ্ধ করে তেমনি আমাজন ডটকমের প্রথম লক্ষ্য ছিল বিশ্বের প্রতিটি বইকে তাদের বই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা। আর এখন এটা বিশ্বের প্রতিটি পণ্যের সম্ভার হিসেবে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে।

এবার ইবে'র কথা যদি বলি, ইবেও কিন্তু একটি ছোট্ট ও নির্দিষ্ট বাজার নিয়ে আরম্ভ করে। যখন এটা, ১৯৯৫ সালের দিকে, তাদের নিলাম সম্পর্কিত কাজকর্ম আরম্ভ করে তখন ইবে (ebay) চায়নি সারাবিশ্ব তাদেরকে গ্রহণ করে নিক। তারা খুব নির্দিষ্ট ও ছোট্ট একটি বাজার দিয়ে আরম্ভ করে, খুব আগ্রহী কিন্তু অল্প কিছু লোকজন নিয়ে আরম্ভ করে। যেমন : টেডি বিয়ার পুতুল। আর একবার যখন ইবে (ebay) টেডি বিয়ার পুতুলের বাজারটি ঠিকমতো দখল করল, সে সাথে সাথেই গাড়ির ব্যবসায় ঝাঁপ দেয়নি। (তার বিক্রয় তালিকায় গাড়ির নাম যোগ করেনি।) ইবে ধীরে ধীরে শৌখিন লোকজনের ছোট ছোট শখগুলো পূরণের চেষ্টা করল। ইবে এটা ততক্ষণ চালিয়ে গেল যতক্ষণ না একটি আস্থাযোগ্য বাজার হয়ে উঠছে।

ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর মধ্যেও অনেক গোপন বাধা থাকে। গত কয়েক বছরে ইবে এই শিক্ষাটি গ্রহণ করেছে। সব বাজারের মতো একচেটিয়া বাজারেরও কিছু মূল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিলামের ক্রেতারা বিক্রেতার সাথে দেখা করে পণ্য ক্রয় করতে চায়। আবার বিক্রেতারাও তাই চাই। কিন্তু ইবে দেখলো নিলামের ব্যবসা সবচেয়ে ভালো চলে কিছু দুর্লভ ও শৌখিন জিনিসে। যেমন বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ও ডাকটিকেটের ক্ষেত্রে। সাধারণ জিনিস যেমন কলম, পেনসিল প্রভৃতি কেউ নিলামে কিনে না। ইবে এখনো একটি স্বনামধন্য একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান হিসেবেই রয়েছে, কিন্তু ২০০৪ সালে লোকজন যতটা আশা করেছিল তত বড় নয়; বরং তারচেয়ে কিছুটা ছোট পরিসরেই ইবে তার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

ব্যবসার পরিধি বাড়াতে গেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হয়। সবচেয়ে সফল কোম্পানিগুলো প্রথমে তাদের ভিত্তিপ্রস্তর মজবুত করে। তারা প্রথমে একটি কাজে, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করে যায়। তারপর সেই কাজে সফল হলে ধীরে ধীরে তাদের পরিধি বাড়ায়।

ঝামেলা কোরো না

অনুবাদে যাওয়ার আগে আমি একটু ওমর খৈয়ামের কথা বলতে চাই। আমি আজ মোহম্মদ বরকতুল্লাহর বই *পারস্য প্রতিভা* পাঠ করছিলাম। বই থেকে কিছু লেখা উল্লেখ করছি, যা আপনার চিন্তা চেতনার জগৎকে প্রসারিত করবে।

'অতএব পরলোকের ভরসায় জীবনকে সুখ হইতে বঞ্চিত করিও না। মুহূর্তের পর মুহূর্তের ভিতর দিয়া জীবন ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। এ জীবনের সার্থকতা কর। প্রতি মুহূর্তটিকে আঁকড়িয়া ধরিয়া উপভোগ কর—স্ফূর্তি কর, আনন্দ কর। যে-মুহূর্ত পিছনে পড়িল উহা আর ফিরিয়া আসিবে না, উহার জন্য অনুশোচনা করিও না। কবি বলেন :

সাকী গমে ফারদায়ে হারিফান চে খোরী
পেশ আর পেয়ালারা কে শব মিগোজারাদ। —খৈয়াম।

কালি কী হইবে সেই ভয়ে আজ
অনুশোচনায় কী ফল বল;
আয়ু নিশীথিনী অবসান হয়—
হে সাকি, পেয়ালা অধরে তোল।

'কবির মতে যাহারা পার্থিব রাজত্ব বা ঐশ্বর্যের জন্য, ভাবী সুখের আশায়, বর্তমানে কঠোর সাধনায় জীবনের মুহূর্তগুলি ব্যয় করিতেছে; অথবা যাহারা পরলোকে স্বর্গলাভাশায় এ জীবনে ঘোর তপস্যায় কাল হরণ করিতেছে, সর্ববিধ ভোগের পথ রুদ্ধ করিয়া জীবনকে নিষ্পেষিত করিতেছে—তাহারা সকলেই ভ্রান্ত। সুখের মাহেন্দ্রযোগ হেলায় হারাইয়া তাহারা দূর অনাগতের আশায় বসিয়া আছে। হা! হা! কী দুরাশা!

এই রচনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে বর্তমানের গুরুত্বকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। আপনি অতীতের সমস্যার কারণে অনুশোচনা করতে পারেন বা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ভয়ে ভীত হতে পারেন। কিন্তু এগুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার বর্তমানের সুখ ও সমৃদ্ধি ধ্বংস করছেন। মহান ব্যক্তিদের জীবনী ও

Audilua.com

তাদের মহান কর্ম সম্পর্কে নিয়মিত পাঠ করুন। এতে করে নিজের মধ্যেও মহান কাজ করার প্রেরণা সৃষ্টি হবে। আমি কয়েকজন বিত্তশালী লোককে চিনি যাদের টাকা আছে কিন্তু মানসিকভাবে তারা অসুখী। অর্থ আয় করুন তবে তা যেন আপনার মানসিকতাকে অসুস্থ না করে।

আবার অনুবাদে ফিরে যাচ্ছি। সিলিকন ভ্যালিতে এখন ঝামেলার কোনো শেষ নেই। মূল ইংরেজি শব্দটি হচ্ছে *disruption* যার বাংলা মানে হচ্ছে ভাঙ্গন, চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থা বা ঐক্যনাশ। *disruption* দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে একটি কোম্পানি নিম্ন মানের একটি পণ্য বাজারে এনে নিম্ন দামে বিক্রয় করে। তারপর আস্তে আস্তে পণ্যের মান উন্নয়ন করে। পর্যায়ক্রমে দেখা যায় পণ্যটি অন্যান্য ভালো ভালো স্বনামধন্য কোম্পানির পণ্যকেও পিছনে ফেলে দিচ্ছে। ঠিক এটাই ঘটেছে মেইনফ্রেম কম্পিউটার ও পারসোনাল কম্পিউটারের ক্ষেত্রে। প্রথমে পারসোনাল কম্পিউটার একটি অবাঞ্ছিত পণ্য ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তা বাজারে একটি কর্তৃত্ব সৃষ্টি করল। আজকে হয়তো মোবাইলও পারসোনাল কম্পিউটারের সাথে ঠিক একই কাজ করছে।

এটা তো একটি সামাজিক ঝোঁক বর্ণনা করলাম। কিন্তু একজন উদ্যোক্তার জন্য বা ব্যবসায়ীর জন্য এ ধরনের কাজ খাটে না। এজন্য আপনাকে পুরোপুরি ঠিকঠাক একটি পণ্য নিয়ে বাজারে নামতে হবে। আর সে পণ্য যদি পুরাতন কোনো কোম্পানির থেকে থাকে তবে এটা তো আর একচেটিয়া ব্যবসা হবে না।

অবশ্য এ ধরনের ঝামেলাদায়ক পণ্য আরও ঝামেলা আকর্ষণ করে। যেমন ছিদ্রান্বেষী লোকজন সমস্যা খোঁজে, তারা আরও সমস্যা খুঁজে পায়। আবার অমনযোগী ছাত্রদের যেমন প্রায়ই অধ্যক্ষের কক্ষে যেতে হয়। এ ধরনের সমস্যা ব্যবসায়িক জগতেও হয়। ঝামেলাদায়ক কোম্পানি প্রায়ই এমন এমন লড়াইয়ে লিপ্ত হয় যাতে তারা কখনো জয়ী হতে পারে না। ধরুন, নেপস্টার (Napster)। নামটার মধ্যেই কেমন ঝামেলা ঝামেলা মনে হয়। ১৯৯৯ সালে তারা সংগীত রচনাকারী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে বাজারে নামে। এর পরের বছর টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে আসে। তারপর বছর দেড়েক পরেই তারা দেউলিয়া হয়ে যায়।

পেপালকেও হয়তো ঝামেলাদায়ক মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা কখনো

কোন বিরাট কোম্পানিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করিনি। এটা সত্য যে, আমরা ভিসা কার্ডের কিছু ব্যবসা কমিয়ে দিয়েছি। তবে আমরা বাজারে অনলাইনে ক্রয় করার ক্ষেত্রে যতটা এগিয়ে গেছি ততটাই ভিসা কার্ডের জন্য বাজার প্রসারিত হয়েছে। আমরা ভিসা কার্ড প্রতিষ্ঠান থেকে যতটা নিয়েছি তারচেয়েও বেশি দিয়েছি। দেখা গেল পুরো ব্যাপারটিই ইতিবাচকভাবেই ঘটেছে। কিন্তু নেপস্টার আমেরিকার সংগীত রচনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে একটি নেতিবাচক প্রতিযোগিতায় নামে। তাই এই ঘটনার মূল শিক্ষা হচ্ছে ঝামেলা করবেন না; যতটা সম্ভব প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলবেন।

যে শেষে যায় সেই প্রথম হয়

বাংলায় প্রবাদ আছে, *'আগে গেলে বাঘে খায়, পরে গেলে স্বর্ণ পায়!'* যাইহোক, আপনি হয়তো এই কথাটি অনেকবারই শুনেছেন। তবে আজ ব্যবসায়িক জীবনে এর গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। অনেকে অবশ্য বলে *'প্রথমে কাজ করার সুবিধা বেশি।'* কিন্তু এটা সত্য নয়। আপনি যখন একটি বাজারে প্রবেশ করবেন তখন আপনি যে সাথে সাথেই ভালো মানের মুনাফা নিয়ে বাড়ি ফিরবেন, তা নয়। তবে প্রথমে চলাটা একটি কৌশল, এটাই লক্ষ্য নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আপনার আয় যেন ভবিষ্যতেও নিয়মিত আসে। তাই প্রথমে কাজ আরম্ভ করা খুব একটা ভালো জিনিস না, যদি অন্য কেউ এসে আপনাকে পথে বসিয়ে দেয় তবে তো কথাই নেই। তাই শেষে পদক্ষেপ নেওয়াই সবচেয়ে উত্তম। একটি নির্দিষ্ট বাজারের প্রতি, একটি নির্দিষ্ট চাহিদার প্রতি সবশেষে আপনি যে পদক্ষেপ নিবেন তাই হবে সবচেয়ে সুবিধাজনক। কারণ তখন আপনি অন্যদের দেখে শিখেছেন কী কাজে লাগবে; আর কী কাজে লাগবে না। এটাই হচ্ছে ছোট বাজার নিয়ে রাজত্ব করা এবং ধীরে ধীরে বড় কোনো স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যাওয়া। এইক্ষেত্রে ব্যবসা হচ্ছে দাবা খেলার মতো। বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন জোসে রাউল কাপাব্লাঙ্কা এটাকে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, **'আপনাকে অবশ্যই শেষ চাল, মানে বাজিমাতের চালটি অন্য সবকিছুর আগে চিন্তা করে রাখতে হবে।'**

অনুবাদক তার বাস্তব জীবনের একটি চরম শিক্ষা বর্ণনা করছে। আমি ২০১৫ সালে আমার প্রথম অনূদিত বই *'চিন্তা করুন এবং ধনী হোন'* প্রকাশ করি। এই বইটি যে *Think and Grow Rich* এর বাংলা অনুবাদ এটা বোঝাতে আমার অনেক বেগ পেতে হয়েছে। আমি চিন্তা করেছিলাম এই বইটি বিক্রি করে আমি আমার জীবনের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে ৬৪টি অনুপ্রেরণার বই অনায়াসে প্রকাশ করবো। কিন্তু তা মোটেই ঘটেনি। তখন কেবল আমিই এই বইটি প্রথম বাংলা অনুবাদ করে প্রকাশ করি। যেহেতু আমার শিরোনামে ইংরেজি নামটি ছিল না সেহেতু অন্যরা এটা অনুবাদ করে বাংলিশ শিরোনাম দিয়ে বই প্রকাশ করে। আমার বইটি যে বাংলিশ শিরোনামের কারণে চলেনি তা বুঝতে আমার দুই বছর লেগেছে। তো যাইহোক, আমি পরবর্তীতে যে বই অনুবাদ করেছি সেগুলো বাংলিশ নামেই প্রকাশ করেছি এবং পাঠক দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু এই *'চিন্তা করুন এবং ধনী হোন'* বইয়ের শিরোনাম পাল্টে *'থিংক এন্ড গ্রো রিচ'* শিরোনাম দিয়ে আমি আবার নতুন করে, নতুন বাক্য বিন্যাস করে, আরও পরিশ্রম করে অনুবাদকে সহজসাধ্য করতে হয়েছে।

তবে আমিও লেখক পিটার থিয়েলের সাথে একমত যে প্রথমে চলাটা একটি কৌশল, তবে এটা লক্ষ্য নয়। আমার লক্ষ্য হচ্ছে ২০৩০ সাল এবং ৬৪টি বই। আমি শুরু করেছি এবং একদিন শেষও করবো। তবে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করা। আর বাংলাদেশের প্রকাশক, লেখক সহ সকলকে এটা দেখানো যে, বাংলাদেশের মানুষের জন্য আরও ব্যক্তিগত উন্নয়নমূলক রচনা, বই প্রভৃতি দরকার।

মানুষকে তাদের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য, তাদের জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য লেখকদের উচিত আরও বাস্তবভিত্তিক, চিন্তাশীল রচনা সৃষ্টি করা। মানুষকে অনুপ্রাণিত করা, উচ্চাকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে মানুষকে উৎসাহী করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা যেন কেবল বিদেশি লেখকদের, মহান ব্যক্তিদের দেখে তাদের পূজা না করি, তাদের দেখে শিখি এবং সেই শিক্ষা নিয়ে আমরাও যেন মহান ব্যক্তি হয়ে এই বিশ্বে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। আমি কয়েকদিন আগে একটি বই পড়েছিলাম। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অনূদিত এসকিলাসের *শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস*। প্রমিথিউস একজন গ্রিক দেবতা। তার একটি কথা আমার

কানে প্রায়ই বাজে। কথাটি হচ্ছে,

'মৃত্যু আমার বিধিলিপি নয়।'

আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের প্রতিটি উদ্যোক্তা একদিন এমন করেই বলবে,

'পরাজয় আমার বিধিলিপি নয়।'

তারা সকলেই তাদের জীবনের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করে বলবে আমি সফল হয়েছি, আমি মানুষের জন্য ও নিজের জন্য যা করতে চেয়েছি তা করেছি।

Audilua.com

ছয়

আপনি লটারির কোনো টিকেট নন

ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্নটি করা হয় তা হচ্ছে সাফল্য কি ভাগ্য থেকে আসে; নাকি দক্ষতা থেকে আসে।

আসুন দেখি সফল লোকজন কী বলে। ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েল একজন সফল লেখক। তিনি তার লেখা *আউটলায়ার্স* বইতে লিখেছেন সাফল্য হচ্ছে 'ভাগ্যবান কিছু সুযোগ ও ইচ্ছামত কিছু সুবিধার মিশ্রণ।' বিখ্যাত বিনিয়োগকারী ওয়ারেন বাফেট নিজেকে 'একটি বীর্যবান সঙ্ঘের একজন ভাগ্যবান সদস্য হিসেবে অভিহিত করেছেন।' আর নিজেকে 'লটারি জয়ী' হিসেবেও উল্লেখ করেন। আমাজন ডটকমের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসও তার প্রতিষ্ঠানের সাফল্যকে 'অবিশ্বাস্য একটি সরলরেখা' বলে উল্লেখ করেন। তিনি প্রায়ই মজা করে বলেন যে এটা ছিল 'অর্ধেক ভাগ্য, অর্ধেক ঠিক সময়; আর বাকিটা ছিল মস্তিষ্ক।' বিল গেটস তো আরও এগিয়ে গিয়ে বলেন তিনি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেন, কারণ তিনি এমন কিছু নির্দিষ্ট দক্ষতা নিয়ে জন্মেছিলেন।' যদিও এটা ঠিক পরিষ্কার নয় এমনটা সম্ভব কিনা।

হয়তো এই ব্যক্তিরা একটু কৌশলগত দিক দিয়ে বিনয়ী। তাই তারা এমনটা বলছেন। যাইহোক, আমরা যদি আমাদের বিগত বছরের উদ্যোক্তাদের দেখি তবে দেখবো সাফল্য হচ্ছে সুযোগ দ্বারা তৈরি একটি পণ্য। মানে সুযোগ কাজে লাগাবেন তো সাফল্য অর্জন করবেন। শত শত লোক হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসা আরম্ভ করে। কিন্তু খুব অল্পই, যেমন স্টিভ জবস, জ্যাক ডোরজি ও ইলন মাস্ক, তারা হাজারকে লাখ কোটি টাকার ব্যবসায় পরিণত করতে পেরেছেন। যদি সাফল্য কেবল ভাগ্যের ওপর নির্ভর করত তবে আজকে এই ধরনের সফল উদ্যোক্তাদের আমরা খুঁজেই পেতাম না।

২০১৩ সালে, টুইটার ও স্কয়ার ইনকর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক ডোরজি

তার বিশ লক্ষ অনুসারীদের জন্য লিখেন, 'সাফল্য কখনো দুর্ঘটনাবশত ঘটে না।'

উত্তরে বেশিরভাগ মন্তব্যই ছিল নেতিবাচক। যেমন ধরুন *দি আটলান্টিক* ম্যাগাজিনের সাংবাদিক আলেক্সিস মাদ্রাজল বলেছেন, "কোটিপতি সব সাদা পুরুষরা বলেছেন, 'সাফল্য কখনো দুর্ঘটনাবশত ঘটে না।'" এটা সত্য যে, যারা ইতোমধ্যেই সফল তাদের জন্য নতুন কিছু করা তেমন কঠিন কিছু নয়। কারণ তাদের সম্পদ আছে, লোকজনের সাথে পরিচিতি আছে এবং অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু আমরা হয়তো ব্যাপারটিতে একটু বেশি তাড়াহুড়া দেখাচ্ছি। কেউ যদি বলে সে পরিকল্পনা অনুযায়ী সফল হয়েছে তবে আমরা খুব তাড়াতাড়ি তার আশেপাশের সুবিধা দেখিয়ে তার সাফল্যের কারণ বর্ণনা করতে চাই। আসলে কী তাই!

এই সন্দেহকে কি বাস্তবে সমাধান করা সম্ভব? দুর্ভাগ্যবশত তা করা সম্ভব নয়। কারণ কোম্পানি এমন এক জিনিস যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় নয়। বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা কী করি? আমরা একটি জিনিসের ১,০০০টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। যাতে বিভিন্ন অবস্থায় তার বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে বোঝা যায়। কিন্তু কোম্পানির ক্ষেত্রে কি তা হয়? ধরুন, ফেসবুক। আমরা সেই ২০০৪ এ ফিরে গেলাম। ১,০০০টি বিশ্ব বিবেচনা করলাম। তারপর, এই ১,০০০ বিশ্বে ১,০০০টি ফেসবুক চালু করলাম। এবার দেখবো কোন বিশ্বে ফেসবুক কেমন করছে! কিন্তু বাস্তবে এই ধরনের পরীক্ষা অসম্ভব। প্রতিটি কোম্পানিকেই একটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে তার কাজ আরম্ভ করতে হয় এবং প্রতিটি কোম্পানিই মাত্র একবার আরম্ভ করা যায়। তাই নমুনা যদি কেবল একটি হয় তখন সেখানে পরিসংখ্যান কাজ করে না।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একটি রেনেসাঁ শুরু হয়। যাকে আলোকপ্রাপ্ত যুগও বলা হয়। তখন থেকে আমরা জানি ভাগ্য হচ্ছে এমন কিছু যার ওপর কর্তৃত্ব হবে, ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করতে হবে। আমরা সকলেই এই ব্যাপারে সম্মত ছিলাম, যা করা সম্ভব তাই করা উচিত, আর যা করা সম্ভব নয় তার দিকে মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই। রালফ ওয়াল্ডো এর্মাসনও তাই বলেছেন, 'দুর্বল লোক ভাগ্যে বিশ্বাস করে, পরিস্থিতির ওপর বিশ্বাস করে ... কিন্তু শক্তিশালী লোক কাজ ও কারণের ওপর বিশ্বাস করে।' রুয়াল আমুনসেন ছিলেন একজন বিখ্যাত নরওয়েজীয় মেরু অভিযাত্রী। তিনি ১৯১২ সালে প্রথম দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ করেন। তিনি লিখেছেন, 'বিজয় কেবল তার জন্যই অপেক্ষা করে যার সবকিছু প্রস্তুত আছে—লোকজন অবশ্য এটাকে ডাকে ভাগ্য বলে।' এটা কেউ বলতে

পারবে না যে, দুর্ভাগ্য নেই। তবে আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম মনে করতো তারা তাদের কঠোর পরিশ্রম দ্বারা নিজেদের ভাগ্য গড়বে।

আপনি যদি মনে করেন আপনার জীবন হচ্ছে কেবল হঠাৎ কোন ঘটনা দ্বারা সৃষ্ট একটি জীবন। তবে কেন এই বইটি পড়ছেন? উদ্যোগ সম্পর্কে পড়াটা আপনার জন্য অহেতুক একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আপনি যদি বিশ্বাসই করেন যেসব লোকজন সাফল্য অর্জন করেছেন তারা কেবল লটারির টিকেটের মতো রাতারাতি জয়ী হয়েছেন, তাহলে কীভাবে উদ্যোগ নিতে হয় তা জেনে আপনার কী লাভ! স্লট মেশিন নামক এক ধরনের লটারি ধরার যন্ত্র আছে। আপনি সেটা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আপনি *হাবলুদের জন্য স্লট মেশিন বা Slots for Dummies* নামক বইটি পড়ে দেখতে পারেন। এটা আপনাকে যন্ত্র সম্পর্কে বলবে, কোন প্রতীকের কী মানে তা বলবে; কিন্তু এটা আপনাকে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে না।

আপনার কি মনে হয় বিল গেটস কেবল বুদ্ধিমত্তার জোরে জিতে গেছেন? নাকি শেরিল স্যান্ডবার্গ, ফেসবুকের প্রধান অপারেটিং অফিসার, সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নিয়েছেন? নাকি তার ঝোঁকটি জন্ম থেকেই এদিকে ছিল? আমরা যখন এ ধরনের ঐতিহাসিক প্রশ্ন নিয়ে তর্ক করবো, তখন দেখবেন ভাগ্য আসলে অতীত একটি ব্যাপার। এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে—তাদের সাফল্য কি হঠাৎ কোনো সুযোগ দ্বারা সৃষ্ট, না তাদের নকশা করা?

আপনি কি আপনার ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন?

আপনি ভবিষ্যৎকে একটি নির্দিষ্ট আশা আকাঙ্ক্ষায় বাঁধতে পারেন অথবা আপনি চিন্তা করতে পারেন যে, ভবিষ্যৎ হচ্ছে একটি অনিশ্চিত বিষয়। যদি আপনি ভবিষ্যৎকে নির্দিষ্টভাবে চিন্তা করেন, তাহলে আপনি আগে থেকেই একটু সতর্ক হতে পারবেন এবং এটাকে নিজের মতো করে নির্মাণ করতে কাজ করবেন। আর যদি আপনি একে অনিশ্চিত একটি বিষয় রূপে চিন্তা করেন তবে আপনার ভবিষ্যৎ হবে যাচ্ছেতাই একটি ব্যাপার, আপনি এর ওপর কর্তৃত্ব করার বদলে আশা ছেড়ে দিবেন।

(ইসলামী বিশ্বাসেও ভাগ্যের পিছনে না ছুটে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। তিরমিযী শরিফের ২৫১৭ নং হাদিসে আছে :

আনাস ইবনু মালিক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো একজন

লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! আমি কি সেটা (উট) বেঁধে রেকে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করবো, না বাঁধন খুলে রেখে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করবো? তিনি বললেন, তুমি সেটা বেঁধে রেখে (আল্লাহ তা'আলার উপর) ভরসা করবে।)

আমাদের অনির্দিষ্ট মনোভাব থেকে আজকের এই অরাজকতাপূর্ণ বিশ্ব তৈরি হয়েছে। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিলাম। তাই আজকের বিশ্ব একটি যাচ্ছেতাই জায়গা হয়ে উঠেছে। এটার মূল সারবস্তু হচ্ছে : লোকজন যখন কাজ করার মতো পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে না তখন তারা পূর্বেকার কিছু নিয়ম নীতি মেনে একটি অবস্থা তৈরির চেষ্টা করে। যেমন আজকের আমেরিকা। আমরা এখন আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে 'অতিরিক্ত কর্মসূচি' বা extracurricular activities এ বেশি উৎসাহ দিচ্ছি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে দেখা যায় যেসব ছাত্ররা উচ্চাকাঙ্ক্ষী তারা আরও দক্ষ ছেলেদের সাথে পাল্লা দিচ্ছে। এভাবে সে যখন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঠে, তখন সে একযুগেরও বেশি সময় শেষ করেছে তার সিভিতে 'অতিরিক্ত কী কী করেছে' তার একটি তালিকা তৈরি করতে। সে একটি অপরিচিত ও অজানা ভবিষ্যতের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। যাই আসুক না কেন—সে প্রস্তুত। আসলে সে কোনকিছুর জন্যই প্রস্তুত নয়।

	নির্দিষ্ট	অনির্দিষ্ট
আশাবাদী	ইউ.এস., ১৯৫০ থেকে ১৯৬০	ইউ.এস., ১৯৮২ থেকে বর্তমান
নিরাশাবাদী	চিন, বর্তমান	ইউরোপ, বর্তমান

এখন এর বিপরীতে কিছু কথা বলি। আর এই কথাগুলো আমার দৃঢ় বিশ্বাস থেকে বলা। মধ্যবিত্ত লোকজনের মতো সবকিছুর পিছনে ধাবিত হওয়া এবং একে 'সর্বগুণসম্পন্ন' বলে প্রশংসা করা মোটেও উপযুক্ত নয়। একজন

ব্যক্তিত্ববান পুরুষ কেবল একটি জিনিসেই দক্ষ হতে চায় এবং হয়। সে অবিশ্রান্তভাবে বিভিন্ন ধরনের কাজে মন না দিয়ে কেবল একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করে। সে হয়ে ওঠে একজন একচেটিয়া ব্যক্তি। আজকের তরুণরা অবশ্য একাজ করে না। কারণ তাদের আশেপাশের সবাই নির্দিষ্টতার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। কেউই আজকে আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেবল একটি বিষয়ে দক্ষ হতে যায় না। অবশ্য আপনি যদি কেবল ছক্কা মারতে পারেন তাহলে ভিন্ন কথা।

আপনি ভবিষ্যৎকে আজকের থেকে ভালোও আশা করতে পারেন অথবা খারাপ। আশাবাদীরা ভবিষ্যৎকে সাধুবাদ জানায়; আর নিরাশাবাদীরা এটাকে ভয় পায়। এই ব্যাপারটি নিয়েই আমাদের সামনে চারটি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলো নিয়েই বলছি :

অনির্দিষ্ট নিরাশাবাদ

প্রত্যেক সংস্কৃতিরই একটি উপকথা থাকে। যাকে বলা হয় সোনালি যুগ। বাঙলায় যেমন *দুধ ভাতে বাঙালি*। অথবা *টাকায় এক মণ চাল*। সব সংস্কৃতিতেই মনে করা হয় যে আমরা সেই সোনালি যুগ থেকে ধীরে ধীরে পিছয়ে যাচ্ছি। এজন্যই বিশ্বের অধিকাংশ লোক নিরাশাবাদী। এমনকি আজকের এই বিশ্বেও আমাদের জনজীবনের অনেকাংশ নিরাশা কর্তৃত্ব করে। একজন নিরাশাবাদী লোক ভবিষ্যতের দিকে বিবর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু সে যে কী করবে সেই ব্যাপারেও সে নিশ্চিত নয়। ১৯৭০ সাল, মানে গত শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে ইউরোপ মহাদেশ আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ভুগছে; আর তখন থেকেই এই নিরাশাবাদী শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। আজকে পুরো ইউরোপ ধীর গতিতে বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং কেউ এই ব্যাপারে কোনো দায় নিচ্ছে না। এ ব্যাপারে ইউরোপের কেন্দ্রিয় ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা না করে তাৎক্ষণিক কিছু একটা করে চাপা দিতে চাচ্ছে। আমেরিকার ডলারের মধ্যে সাধারণত লেখা থাকে : 'আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি'। ইউরোপের কেন্দ্রিয় ব্যাংকও ইউরোতে এরকম কিছু লিখতে পারে : 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'।

আপাতত ইউরোপিয়ানদের আচরণ দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। তারা ঘটনা ঘটার পর প্রতিক্রিয়া করে এবং আশা করে যেন এরচেয়ে খারাপ কিছু না ঘটে। অনির্দিষ্ট নিরাশাবাদীরা এই অপরিহার্য পিছিয়ে পড়া পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু

বলতে পারে না। তারা এটাও জানে না এটা কী দ্রুত ঘটবে, না ধীরে ঘটবে; এটা কী আকস্মিক ঘটবে, না পর্যায়ক্রমে ঘটবে। সে যা করতে পারে তা হচ্ছে শুধু অপেক্ষা করা। তাহলে এই অবসরে কী কী করা যায়—খাও, দাও আর ঘুমাও। ওহ! এর মধ্যে বিয়েও করা যায়। যেমনটি এখন পুরো ইউরোপ জুড়ে হচ্ছে। কেবল ঘুরে বেড়াও, আর বেড়াও।

নির্দিষ্ট নিরাশাবাদ

একজন নির্দিষ্ট নিরাশাবাদী বিশ্বাস করে যে ভবিষ্যৎকে জানা যায়, কিন্তু যেহেতু ভবিষ্যৎ বর্ণহীন, নিরানন্দ, তাই তাকে অবশ্যই এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আশ্চর্যজনকভাবে বর্তমানের চীন দেশ এই নির্দিষ্ট নিরাশার জন্য সবচেয়ে ভালো উদাহরণ। যখন আমেরিকার জনগণ দেখলো যে, চীনের অর্থনীতি ২০০০ সালের পর থেকে ১০% বাৎসরিক হারে বাড়ছে, তখন আমরা চিন্তা করলাম একটি আত্মবিশ্বাসী দেশ তার ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে তা নয়। এর কারণ হচ্ছে আমরা, আমেরিকানরা যেহেতু এখনও আশাবাদী, তাই আমরা আমাদের আশাবাদ চীনের ওপর আরোপ করেছি। আর চীনের দৃষ্টিকোণ থেকে, এখনও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিটি পুরোপুরি ঘটেনি। অন্যান্য সব দেশ ভয়ে আছে যে, চীন সারা বিশ্বের ওপর রাজত্ব করবে; আর চীন ভয়ে আছে সে এটা করতে পারবে না বলে।

চীন এত দ্রুত উন্নতি করতে পারছে কারণ এটার আরম্ভ বিন্দু বা মূল ভিত্তি ততটা মজবুত নয়। চীনের জন্য অগ্রগতির সবচেয়ে সহজ মাধ্যম ছিল বিরামহীনভাবে সবকিছু নকল করা, যা পশ্চিমের দেশগুলো ইতোমধ্যেই শেষ করে ফেলেছে এবং চীন তা করেছে। বেশি বেশি কাঠ দিয়ে চুলার আগুন বাড়িয়েছে। আরও কারখানা, আরও উঁচু উঁচু আকাশচুম্বী ভবন নির্মাণ করেছে। কিন্তু চীনের যে বিশাল জনসংখ্যা, তার নিত্যনতুন চাহিদার চাপে সম্পদ সীমিত হয়ে এসেছে, দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত দেশগুলোর জনগণের যে জীবনমান রয়েছে তা চীন কখনো তার জনগণকে দিতে পারবে না এবং এটা চীনও জানে।

এজন্যই চীনের নেতৃত্ব নির্দিষ্ট নিরাশাবাদের এই পদ্ধতির মধ্যে ডুব দিয়েছে এবং ব্যাপারগুলো এখন আরও খারাপের পথে যাচ্ছে। চীনের পূর্বতন সব নেতাই ছোটবেলায় দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে। তাই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন তাদের নেতার দিকে তাকায়, দেশের ভবিষ্যতের দিকে তাকায় তখন অনিবার্য

ধ্বংস এড়ানোর কোন পথ খুঁজে পায় না। এমনকি চীনের জনগণও ব্যাপারটি অনুভব করে যে, শীঘ্রই শীতকাল আসছে। অবশ্য বাইরের লোকজন চীনের ভিতরে এত সব উন্নয়ন দেখে খুবই মুগ্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু তারা এটা দেখছে না যে, চীনের ধনবান লোকেরা দেশ থেকে টাকা নিয়ে সরে পড়ার পাঁয়তারা করছে। অপেক্ষাকৃত গরিব লোকেরা যতটুকু সম্ভব সঞ্চয় করার চেষ্টা করছে। তারা আশা করছে এটা হয়তো যথেষ্ট হবে। চীনের প্রায় প্রতিটি শ্রেণির নাগরিক চীনের ভবিষ্যৎ নিয়ে মারাত্মক সচেতন।

নির্দিষ্ট আশাবাদ

একজন নির্দিষ্ট আশাবাদীর কাছে বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ উত্তম হবে যদি সে এটাকে উত্তম করার জন্য পরিকল্পনা ও কাজ করে। একদম সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ১৯৫০ বা ষাটের দশক পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্বকে নির্দিষ্ট আশাবাদীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক এবং ব্যবসায়ীরা বিশ্বকে আরও ধনী, স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘআয়ু করেছে যা পূর্বের লোকজন কল্পনাও করেনি। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস উভয়ই উনিশ শতকের ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মধ্যে এটা স্পষ্টভাবে দেখতে পান।

> পূর্বতন যেকোনো প্রজন্মের চেয়ে বর্তমানের প্রজন্ম বড় বড় প্রকাণ্ড সব উৎপাদনশীল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করছে। মানুষ প্রকৃতির অধীনতাকে কমিয়ে এনে যন্ত্রপাতি ও কারখানা নির্মাণ করেছে, রসায়ন বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে এবং কৃষিকাজে প্রয়োগ করেছে। বাষ্পকে পরিচালিত করেছে, রেললাইন তৈরি করেছে, ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ সৃষ্টি করেছে এবং পুরো মহাদেশকে চাষাবাদের জন্য নদীর সাথে খাল খনন করে প্রস্তুত করেছে। পূর্বে পৃথিবীর জনসংখ্যা কম ছিল। কিন্তু এখন তা বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা এতটাই বিস্ময়কর যে, আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম এরকম একটি প্রকাণ্ড উৎপাদন ব্যবস্থা যে সৃষ্টি করা সম্ভব তা সম্পর্কে পুরোপুরি অসচেতন ছিল।

প্রতিটি প্রজন্মের উদ্ভাবক এবং অগ্রদূতগণ পূর্ববর্তী প্রজন্মকে ছাড়িয়ে গেছে। ১৮৪৩ সালে লন্ডনের লোকজন টেমস নদীর নিচে সুড়ঙ্গ তৈরি করে, ১৮৬৯ সালে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে জাহাজ চলাচলের সুবিধার জন্য সুয়েজ

খাল খনন করা হয়। ১৯১৪ সালে পানামা খাল খনন করা হয়। এতে করে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর সংযুক্ত হয়। এমনকি ১৯২৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় যে ব্যবসায়িক বিপর্যয় ঘটে তাও আমেরিকার বিরামহীন অগ্রগতিতে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। ১৯২৯ সালে দি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংএর নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় ১৯৩১ সালে। ভবনটি ১০২ তলা। ১৯৩৩ সালে দ্য গোল্ডেন গেট ব্রিজ নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় ১৯৩৭ সালে। এটা তখনকার দিনের সবচেয়ে বড় ঝুলন্ত ব্রিজ ছিল। এরপর ১৯৪১ সালে আরম্ভ হয় ম্যানহাটন প্রকল্প এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯৪৫ সালে এ প্রকল্প থেকে বের হয় বিশ্বের প্রথম আণবিক বোমা। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে, শান্তিকালীন সময়েও আমেরিকা এগিয়ে যেতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের সবগুলো রাজ্যের মধ্যে মহাসড়ক নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়। এটা ১৯৫৬ সাল থেকে আরম্ভ হয় এবং ২০,০০০ মাইলের এই মহাসড়ক নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৬৫ সালে। এমনকি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে এই গ্রহ থেকেও বের হওয়া সম্ভব। ১৯৬১ সাল থেকে নাসা অ্যাপোলো প্রকল্প চালু করে। যে প্রকল্প থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ১২ জন পুরুষ চাঁদে পা রাখে।

সাহসী প্রকল্প যে শুধু রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি বিজ্ঞানীদের দখলে থাকতে হবে তাও নয়। ১৯৪০ সালের শেষের দিকে ক্যালিফোর্নিয়ার এক ব্যক্তি, নাম জন রেবের, সান ফ্রান্সিস্কোর ভূপ্রকৃতি পুনরায় আবিষ্কার করে। রেবের ছিলেন বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, অপেশাদার নাট্য পরিচালক এবং একজন স্ব-শিক্ষিত প্রকৌশলী। যদিও সে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেট পায়নি, তবুও সে নির্ভীকভাবে সান ফ্রান্সিস্কোর সমুদ্রতটে দুইটি বিশাল বিশাল বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব দেয়। সে ঘোষণা করে যে, এতে করে শহরের লোকজন বিপুল পরিমাণ বিশুদ্ধ পানীয় জল পাবে এবং কৃষি জমিতেও সেই জল ব্যবহার করা যাবে। সে দাবি করে এই বাঁধগুলো করা হলে প্রায় ২০,০০০ একর জমির উন্নয়ন সম্ভব। যদিও রেবের কোন রাজনৈতিক বা সরকারি কর্মকর্তা ছিল না, তবুও তিনি তার প্রস্তাব পূরণে একান্তভাবে চেষ্টা করেন। ক্যালিফোর্নিয়ার সংবাদ সংস্থাও এ ব্যাপারে অনেক সংবাদ ছাপায়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারও এই প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা নিয়ে একটি কমিশন গঠন করে এবং এর ওপর আলোচনা হয়। এরপর সেনাবাহিনীর

প্রকৌশলীদের বিশেষজ্ঞ দল ১৯৬০ সালে এর একটি নমুনা তৈরি করে, প্রায় ১.৫ একরের। কিছু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পরীক্ষাটি অসফল হয়। তাই পরিকল্পনাটিকে আর সামনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, আজকে কি কেউ এ ধরনের এত বড় প্রকল্প নিয়ে চেষ্টা করতে পারবে? কেউ কি এ ধরনের প্রকাণ্ড কোন রূপকল্পকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে পারবে? ১৯৫০ সালের লোকজন বড় বড় প্রকল্পকে সাধুবাদ জানাতো এবং জিজ্ঞেস করতো যে এটা কি ঠিকভাবে কাজ করবে। কিন্তু আজকে একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষকের এমন প্রস্তাব প্রথমেই বাতিল করা হবে, ময়লার ঝুঁড়িতে ফেলা হবে; আর কেউ দীর্ঘমেয়াদি কোন রূপকল্প নিয়ে আসলে তাকে বলা হয় ঔদ্ধত্যকারী, অযথা গর্বকারী। আপনি ইচ্ছা করলে বাঁধ তৈরির এই নমুনাটি দেখে আসতে পারেন। এটি ক্যালিফোর্নিয়ার একটি শহর, সাসালিটোর গুদামঘরে রাখা আছে। এটি সবার জন্য উন্মুক্ত। জায়গাটি এখন একটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়ে। ভবিষ্যতের জন্য সৃষ্টি করা এসব বড় বড় প্রকল্প এখন জাদুঘরে রাখার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। (আপনি উইকিপিডিয়ায় *Reber Plan* নাম দিয়ে সার্চ দিলেই ছবিসহ বিস্তারিত দেখতে পাবেন।)

অনির্দিষ্ট আশাবাদ

আমেরিকানরা ১৯৭০'এর পর থেকে নির্দিষ্ট আশাবাদ থেকে সরে যেতে থাকে। ১৯৮২ থেকে আমেরিকান চিন্তাধারায় অনির্দিষ্ট আশাবাদ রাজত্ব করা শুরু করে। তখন থেকেই শেয়ার বাজারের গতি ঊর্ধ্বমুখী। এরপর থেকে আমাদের অর্থনীতিতে বা যদি বলি শেয়ার বাজারে ব্যবহারিক গণিত, পরিসংখ্যান, অর্থনীতির নানান তত্ত্ব, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও নানা ধরনের কম্পিউটার প্রোগামের প্রচলন শুরু হয়। একে বলা হয় অর্থনৈতিক প্রকৌশল বিজ্ঞান। তো ১৯৮২ সালের পর থেকে ভবিষ্যতে পৌঁছানোর রাস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই গ্রহণ লাগা অর্থনৈতিক প্রকৌশল বিজ্ঞান। গ্রহণ লাগা কেন বলছি? তারও উত্তর দিচ্ছি। একজন *অনির্দিষ্ট আশাবাদী* জানে যে, ভবিষ্যৎ আরও ভালো হবে। কিন্তু আসলে ঠিক কী হবে তা

জানে না। তাই সে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও বানায় না। সে ভবিষ্যৎ থেকে মুনাফা নিতে চায় কিন্তু একে দৃঢ়ভাবে নকশা করে ফলাফল বের করে আনার কোনো কারণ দেখে না।

একটি পণ্যকে যে বহু বছরের শ্রম দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তার পরিবর্তে অনির্দিষ্ট আশাবাদী কেবল যা ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে তার ওপরই বিনিয়োগ করে। যেমন ব্যাংকের লোকজন কেবল সেগুলোতেই বিনিয়োগ করে যা ইতোমধ্যে অর্থ আয় করেছে। আইনজীবীরা পুরাতন মামলা নিয়েই ব্যস্ত। এমনকি ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী ও পরামর্শ প্রতিষ্ঠানগুলোও নতুন কোনো ব্যবসা আরম্ভ করতে রাজি নয়। ইতোমধ্যে আমাদের দেশে যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে তা হচ্ছে অনেকটা আখ নিংড়ে রস বের করার মতো। এখন যদি ঐ একই আখ থেকে রস বের করতে হয় তবে আপনি কেবল আখের খোসাকেই শুকনো বানাচ্ছেন, রস আর পাচ্ছেন না। এজন্যই দেখা যায় প্রথাগত ব্যবসাগুলোতে ইদানিং এত বেশি প্রতিযোগিতা। সবাই পূর্বের জায়গা থেকে, পূর্বের আখ থেকে রস বের করতে উঠেপড়ে লেগেছ।

এমনকি আমাদের স্নাত্মক পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতাও তাদের সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত পথগুলোতে চলতে উৎসাহিত করে। এটা অদ্ভুত হলেও সত্য যে, আমাদের ইতিহাস এক নতুন ধরনের অভিজাত শ্রেণি সৃষ্টি করছে। যারা ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে জন্ম নিয়েছে তাদেরকে প্রথম ১৮ বছর কিছুই করতে হয়নি। বছরকে বছর সবকিছু এমনিতেই উত্তরোত্তর উন্নত হচ্ছিল। তখন ছিল প্রযুক্তি ঊর্ধ্বমুখী একটি সময়। আপনাকে কিছুই করতে হয়নি। তাই তখনকার প্রজন্ম অনেক বেশি প্রত্যাশা ও অল্পকিছু নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু ১৯৭০ সালে যখন প্রযুক্তিগত (টেকনোলজিকাল) অগ্রগতি থমকে দাঁড়ায়, তখন অভিজাত শ্রেণির এই প্রজন্ম অত্যধিক আয় নিয়ে তাদের সাথী সঙ্গীদের রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। এই প্রজন্মের বয়স্করা ধীরে ধীরে আপনাআপনি ভাবেই ধনী এবং আরও ধনী ও সফল হতে লাগলো। আর পরবর্তী প্রজন্ম পিছনে পড়ে রইল। এই অভিজাত প্রজন্ম যারা সংবাদ মাধ্যমগুলোকে তৈরি করে, তারা তাদের আশাবাদকেই সাফল্য বলে তুলে ধরেছে এবং কেউ এই ব্যাপারে কোন প্রশ্নও তুলছে না। যেহেতু প্রথাগত পেশাই তাদের জীবনে কাজে

লেগেছে, সেহেতু তারা চিন্তাই করতে পারছে না তাদের সন্তানদের জন্য এটা কেন কাজ করবে না।

ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েল একজন খ্যাতিমান লেখক। তিনি বিল গেটসের সাফল্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন, 'আপনি তার ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রগুলোকে না দেখলে তার সাফল্য সম্পর্কে বুঝবেন না। বিল একটি ভালো পরিবারে বেড়ে ওঠে, সে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে যেখানে কম্পিউটারের সুবিধা ছিল এবং পল অ্যালেন ছিলেন তার বাল্যকালের বন্ধু। পরবর্তীতে পল অ্যালেন বিল গেটসের সাথে মিলে মাইক্রোসফট কোম্পানি গঠন করে।' (এই সম্পর্কে আরও পাঠ করতে দেখুন ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েলের *আউটলায়ার্স* বই। অনুবাদ : এ.এম. নাইম হোসেন ও ফজলে রাব্বি। সাফল্য প্রকাশনী, ঢাকা।) তবে আপনি নিশ্চয় জানেন, বক্তার বক্তব্য বুঝতে হলে আপনাকে বক্তা সম্পর্কেও একটু জানতে হবে। ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েলের জন্ম ১৯৬৩ সালে। সেই অভিজাত প্রজন্মের সময়কার। তাই যখন সেই প্রজন্মের কেউ সাফল্য সম্পর্কে বক্তব্য দেয় তখন সে একটি দিক সম্পর্কেই বলতে চায় এবং সেটা হচ্ছে উক্ত ব্যক্তির সাফল্যের কারণ হচ্ছে সুযোগ। কিন্তু তারা সামগ্রিক চিত্রটি সম্পর্কে বলতে ভুলে যায়। এই পুরো প্রজন্মটি শিশুকাল থেকেই শিখেছে সুযোগের ক্ষমতা বেশি এবং পরিকল্পনার গুরুত্ব কম।

আপনি লটারির কোনো টিকেট নন

আমাদেরকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে এবং তা করার জন্য দেশের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন দরকার।

কিন্তু শুরু করবো কোথা থেকে? আমাদের প্রথমে দর্শন থেকে আরম্ভ করতে হবে। আমাদের সফল ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই এটা বুঝতে হবে যে, সাফল্য কখনো কেবল সুযোগের অধীনে নয়; বরং একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে সাফল্য লাভ করা সম্ভব। কিন্তু এমন এক বিশ্ব যেখানে সবাই তার নিজ নিজ প্রথাগত পথে

প্রতিষ্ঠিত সেখানে তাদেরকে বুঝিয়ে বলা, পরিবর্তন সৃষ্টি করা আসলেই খুব কঠিন। যদিও আমাদের অনেক বুদ্ধিমান লোক আছে এবং আমাদের মনোভাবও উত্তম, তবুও কাজটি করা কঠিন।

এই কঠিন কাজকে সম্পন্ন করে দেখানোই হচ্ছে একটি উদ্যোগের মূল কাজ। আপনাকে অবশ্যই আপনার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে এবং সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষ হতে হবে। হ্যাঁ, আপনাকে সহায়তা করার জন্য আপনি হয়তো অনেক সংঘই পাবেন। এরা আপনাকে বাহিরের দিক থেকে সহায়তা করবে। কিন্তু আপনার ভিতরগত উন্নয়ন আপনার নিজেকেই করতে হবে। এই চেষ্টা সম্পূর্ণ আপনার নিজের আয়ত্তের অধীন। সুযোগ বলে যে ধোঁয়া তোলা হয়, আপনাকে অবশ্যই সেই কুয়াশা থেকে বাঁচতে হবে। আপনি লটারির কোনো টিকেট নন যে, হঠাৎ হঠাৎ কিছু ঘটনা ঘটবে। নিজের জীবনকে নিজের হাতে নিন, নিজের নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় নিন এবং এগিয়ে যান।

Audilua.com

সাত

অর্থকে অনুসরণ করুন

টাকায় টাকা আনে। 'যার কাছে আছে তার কাছে আরও আসবে এবং সে প্রচুর পরিমাণে পাবে। যার কাছে নেই, তার কাছে যা আছে তাও নিয়ে নেওয়া হবে।' এটাই জীবনের চরম সত্য। আলবার্ট আইনস্টাইন ঠিক এই ব্যাপারটিই উপলব্ধি করেছেন যখন তিনি বলেছেন, 'বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ', 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গাণিতিক আবিষ্কার', 'এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষমতা।' আপনার কোনটি পছন্দ বলুন তো। তবে তার কথার কিন্তু ভুল মানে ধরবেন না। চক্রবৃদ্ধি হারে যদি 'উন্নতি' করা যায় তবে ব্যাপারটি নিশ্চয় তত মন্দ নয়। তবে সত্যি হচ্ছে এই কথাগুলো যে আইনস্টাইন বলেছেন তার কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। এগুলো অপ্রমাণিত বক্তব্য। কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে আইনস্টাইনের কাজকর্ম ও প্রচেষ্টা, তিনি পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পরেও মানুষকে নতুন নতুন জিনিস শেখার ও বোঝার উপায় দিচ্ছে। এটাই হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি হারে উন্নতি। তিনি যা বলেনি তার থেকেও মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

দেখা যায় যে বেশিরভাগ লোকজনই ধীরে ধীরে কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। কিন্তু আইনস্টাইন ও শেকসপিয়ারের মতো লোকজন অমর হয়ে থাকে, তাদের বক্তব্যের নতুন নতুন ব্যাখ্যা আবিষ্কার হয়। এটা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, জীবনের ছোট ছোট কর্মও কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন ১৯০৬ সালে অর্থনীতিবিদ ভিলফ্রেদো পারেতো '*পারেতো নীতি*' আবিষ্কার করেন। একে ৮০-২০ নীতিও বলা হয়। (পারেতো নীতির মাধ্যমে আপনার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি গঠন করতে পারেন। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত পাবেন *ডিভেলপিং দ্য লিডার উইদিন* ইউ বইয়ে।) পারেতো ইতালির জমিজমা নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেন ইটালির ২০% লোক ৮০% জমির মালিক। আবার তিনি গবেষণা করে বের করেন যে জমিতে মটরশুটি চাষ করলে ২০% মটরশুটি মোট জমির

৮০% মটরশুটি উৎপাদন করে। ধীরে ধীরে তিনি দেখলেন যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এবং পরিবেশের সবকিছুই এই ৮০-২০ নীতি মেনে চলে। এমনকি অনেকগুলো ছোট ছোট ভূমিকম্পের চেয়ে একটি বড় ভূমিকম্প অনেক বেশি ক্ষতি করে থাকে। এমনকি বড় বড় শহর তার দেশের অন্য ছোট ছোট শহরের চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদন করে থাকে। (বাংলাদেশের কথাও যদি ধরি তবে সারা বাংলাদেশের ৮০% ফলাফল উৎপাদন হয় বাংলাদেশের ২০% জায়গায়।) ঠিক একই রকমভাবে একটি একচেটিয়া ব্যবসা অন্য অনেক ধরনের ব্যবসার চেয়ে জনগণকে অনেক বেশি সেবা দেয়। আইনস্টাইন যাই বলুক আর না বলুক না কেন, মূল বিষয় হচ্ছে *ক্ষমতার নীতি*। সে সরাসরি এটাকে এই নাম না দিয়ে একে চক্রবৃদ্ধি হারে দেখানোর চেষ্টা করেছে। তিনি অনেক জায়গাতেই এই চক্রবৃদ্ধির সূত্র প্রয়োগ করেছেন। এটা মহাবিশ্বের চিরন্তন একটি সত্য। এটা আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিস্থিতি এত চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করে যে ব্যাপারটি অসাধারণ একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তারচেয়েও বড় কথা হচ্ছে এটা একটি অদেখা নীতি। এজন্যই আমরা সহজে এটা অনুভব করতে পারি না।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো *ক্ষমতার এই নীতি* আমাদের ব্যবসায়িক জীবনে কীভাবে কাজ করে। আমরা যখন অর্থকে অনুসরণ করবো তখন দেখবো যে, এই *ক্ষমতার নীতি* আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ধরা দিয়েছে। অনেক বিনিয়োগকারীই এখন যেকোনো উদ্যোগের শুরুতে বিনিয়োগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে মুনাফার চেষ্টা করছে। যদিও সব কোম্পানি যে চক্রবৃদ্ধি হারে উন্নতি করবে তা নয়। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে বিনিয়োগকারীদেরকে বুঝতে হবে—আমরা সাধারণ কোনো বিশ্বে বাস করি না; বরং আমরা বাস করি *ক্ষমতার নীতিতে* চলমান বিশ্বে।

বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা নীতি

একটি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান যেকোনো কোম্পানির শুরুতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে চায়। এজন্য তারা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ধনী লোকজন থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। একে একত্রিত করে এবং কোনো একটি প্রযুক্তিগত কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে যাতে তাদের বিশ্বাস আছে যে, কোম্পানিটি আরও মুনাফাজনক হয়ে উঠবে। সাধারণত তারা ২০% মুনাফা নিয়ে ফিরে যায়। একটি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সাধারণত মুনাফা করে যদি কোম্পানিটি আরও বড় হয়ে ওঠে বা শেয়ারবাজারে যায়। সাধারণত একটি

বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ১০ বছরের একটি চিত্র ও পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যায় এবং কোম্পানি বড় হয়ে গেলে তা ছেড়ে অন্য কোনো উদ্যোগের দিকে এগিয়ে যায়। (এই তথ্য মূলত আমেরিকার টেকনোলজিকাল কোম্পানিতে বিনিয়োগকারী ভেঞ্চার ক্যাপিটালের ব্যাপারে বলা হয়েছে। বাংলাদেশে অবশ্য সাধারণত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ২৫%, ধনী বিনিয়োগকারী ৪০% এবং উদ্যোক্তা ৩৫%, এই অনুপাতে ভাগ হয়। ক্ষেত্রবিশেষে প্রথম দুই শ্রেণির অনুপাত আরও বেশি হতে পারে। তবে উদ্যোক্তার অনুপাত যে ৩৫% এর চেয়ে কম হবে এটা নিশ্চিত। আর সময়ের দিক থেকেও ৫ বছরের একটি চিত্র ও পরিকল্পনা আশা করা হয়। অনেক জায়গায় দুই বা এক বছরের মধ্যেও সফল হয়ে যাবে এমন প্রকল্পের আশা করা হয়। যেন রাতারাতি বড়লোক হওয়ার একটি প্রতিযোগিতা।)

অবশ্য সব বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানই যে শেয়ারবাজারে প্রবেশের মতো কোম্পানি পায় তা নয়। অনেকেই ব্যর্থ হয়। এজন্য প্রথম প্রথম এসব প্রতিষ্ঠান একটু আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। তবে সব বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানই আশা করে তার বিনিয়োগকারী কোম্পানি কিছু বছর পরেই চক্রবৃদ্ধি হারে মুনাফা করবে এবং তার আশানুরূপ লক্ষ্যে পৌঁছাবে।

Audilua.com

একটি সফল ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডের
জে-কার্ভ

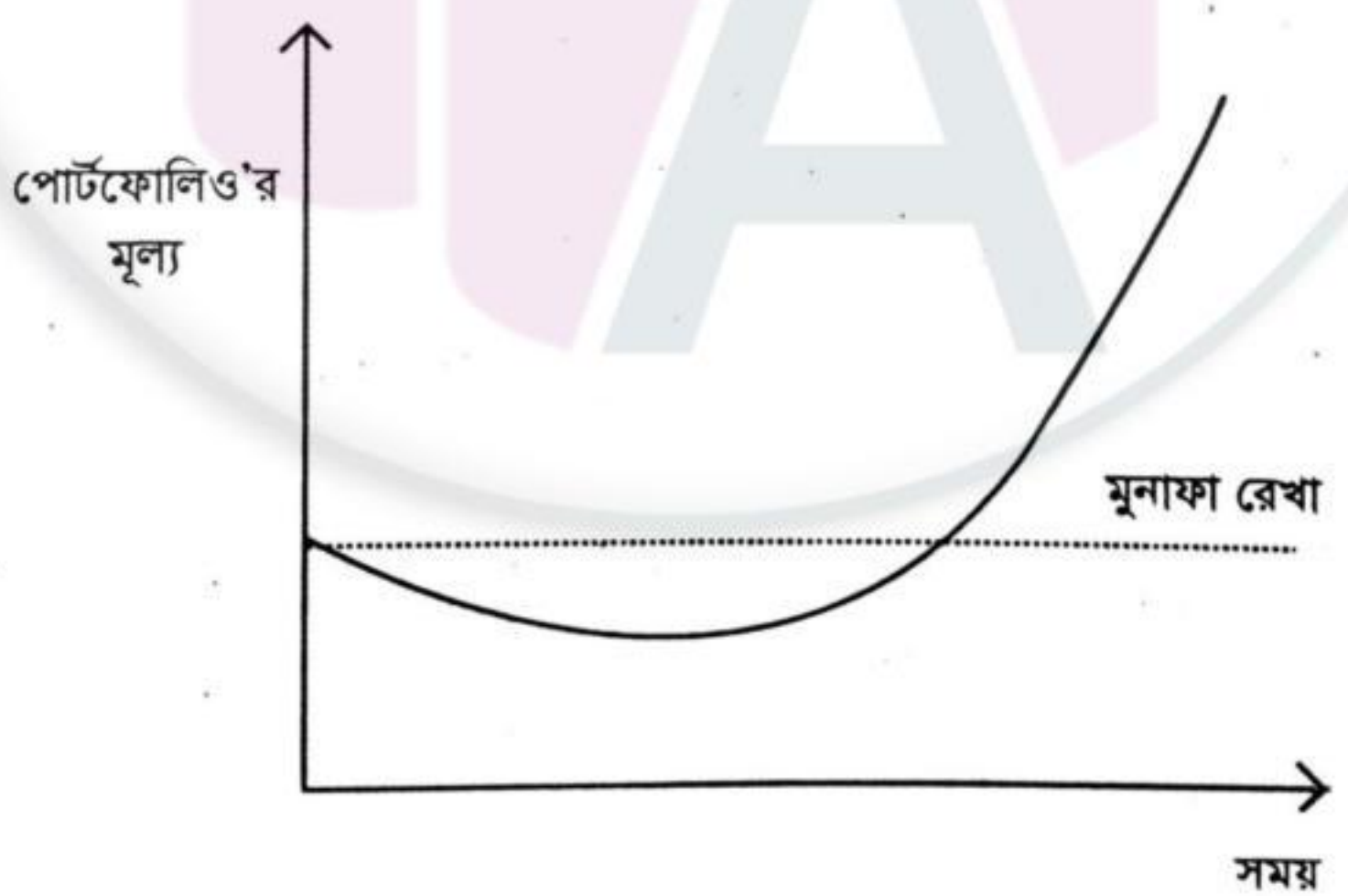

এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে কোম্পানি যদি সফলই হবে তবে তা কখন বাস্তবে রূপ নিবে। উত্তরটি কিন্তু সহজে বলা যায় না। দেখা যায় বেশিরভাগ স্টার্টআপ বা নতুন উদ্যোগই ব্যর্থ হয় এবং এর সাথে বিনিয়োগও হারিয়ে যায়।

প্রায় প্রত্যেক বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানই জানে, তার কাজ হচ্ছে সফল হবে এমন একটি কোম্পানি খুঁজে বের করা। অবশ্য অনেক ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীও এই ব্যাপারটি ভাসা-ভাসা ভাবে জানে। তারা জানে প্রতিটি কোম্পানিই একটি অপরটির থেকে ভিন্ন। তবে তারা এই ভিন্নতাকে ঠিকভাবে উপলব্ধি করে না।

সাধারণত চিন্তা করা হয় কিছু কোম্পানি ব্যর্থ হবে, কিছু মধ্যম অবস্থায় থাকবে এবং কিছু ভালো কোম্পানি থেকে ২ গুণ বা ৪ গুণ মুনাফা আসবে। সবশেষে সবমিলিয়ে একটা মোটামুটি অবস্থা এসে দাঁড়াবে। এতে করে যা ক্ষতি হয়েছে তাও কিছুটা পুষে যাবে।

কিন্তু সত্য হচ্ছে *'বৈঠা ছাড়া নৌকা চালাবেন আর গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন'* তা হয় না। সব যদি আল্লাহই করে দেয় তবে আপনাকে চোখ, নাক, কান, মুখ, মস্তিষ্ক এবং চলার জন্য একটি বৈঠা কেন দিয়েছে? যাইহোক, ভেঞ্চার ক্যাপিটালের বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার ধরনটি সাধারণ নীতি মেনে চলে না। এটা চলে *ক্ষমতার নীতিতে*। সফল বিনিয়োগকারীরা খুব অল্প সংখ্যক নির্দিষ্ট কিছু কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে যেগুলোর ওপর তাদের অগাধ আস্থা যে, এগুলো জনগণের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করবে এবং তাদের জন্য মুনাফা বয়ে আনবে। যদি আপনি বিভিন্ন দিকে নিজের মনোযোগ নষ্ট না করে খুব নির্দিষ্ট কিছু কোম্পানির দিকে মনোযোগ দেন যাদের আসলেই কিছু ভিত্তিগত মূল্য আছে, তাহলে আপনি প্রথমেই অনেক ব্যর্থ কোম্পানিকে এড়িয়ে যেতে পারবেন।

নিচের গ্রাফ থেকে এ সম্পর্কে কিছু ধারণা পাবেন :

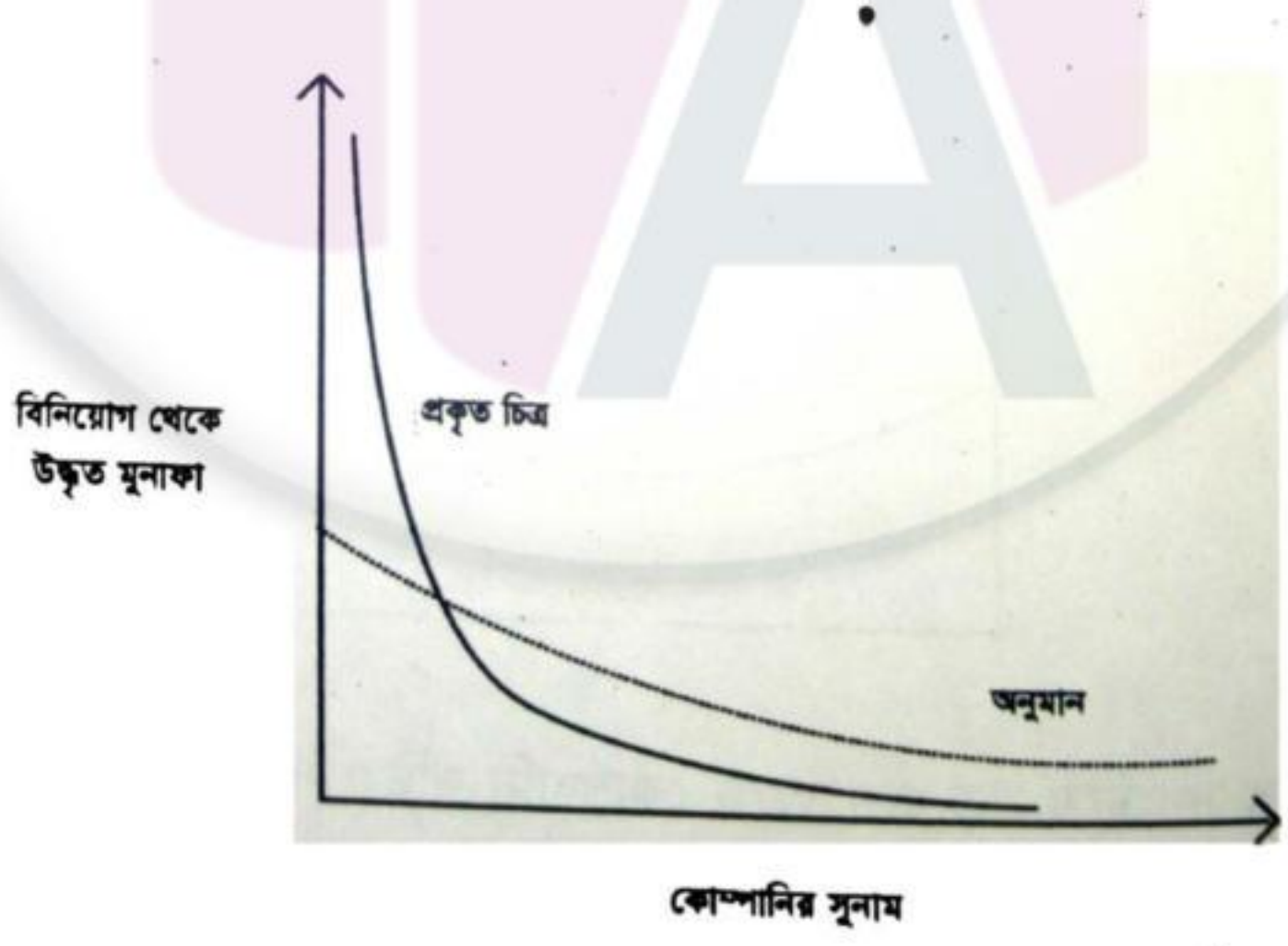

এই ধরনের হঠাৎ পরিবর্তনশীল রেখাচিত্রের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠাতাদের বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান *Founders Fund* একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে। আমাদের ২০০৫ সালের বিনিয়োগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো ফলাফল দেয় ফেসবুক। অন্য যত বিনিয়োগ আছে তার সবগুলো মিলিয়েও এত ভালো ফলাফল পাওয়া যায়নি। এরপর ফেসবুকের পরে আছে *Palantir*। এটাও সব বিনিয়োগের দিক থেকে ফেসবুকের পরে সবচেয়ে বেশি মুনাফাদায়ক। এটা অদ্ভুত কিছু নয়। বিনিয়োগ করার পর দেখবেন এমন এমন কোম্পানি আছে যা আপনার আশার চেয়েও কয়েকগুণ বেশি মুনাফা দিচ্ছে। *বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় গুমোর হচ্ছে সবচেয়ে সফল যেই কোম্পানিতে তার মুনাফা হয় তা অন্য সব কোম্পানিতে করা বিনিয়োগের মুনাফার চেয়ে বেশি হবে।*

এ থেকে আমরা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ব্যাপারে দুইটি অদ্ভুত তথ্য পাই। প্রথমটি হচ্ছে, কেবল সেই কোম্পানিতেই বিনিয়োগ করুন যেগুলোর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে এবং পুরো বিনিয়োগ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা অবশ্য একটি ভয়ানক সূত্র। কারণ, এতে করে অনেক কোম্পানির ওপর বিনিয়োগ সরে যেতে পারে। যদিও অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রচলিত ব্যবসাও অনেক সাফল্য বয়ে আনছে। যাইহোক, এই ব্যাপারটি আমাদেরকে দ্বিতীয় বিষয়টির দিকে নিয়ে যায়। সেটি হচ্ছে যেহেতু এক নম্বর সূত্রটি খুবই কড়াকড়ি ধরনের একটি সূত্র সেহেতু আর কোন সূত্রের আপাতত দরকার নেই।

এখন ধরুন আপনি যদি প্রথম সূত্রটি ভঙ্গ করেন তবে কী হবে তা দেখি। এনড্রিসেন হরওয়েটজ নামক একটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি ২০১০ সালে ইন্সট্রাগ্রামের ওপর ২,০০,০০,০০০.০০ টাকা বিনিয়োগ করে। এর দুই বছর পর ফেসবুক এই ইন্সট্রাগ্রাম কোম্পানিকে কিনে নেয় মাত্র ৮ হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে। এনড্রিসেন কোম্পানি মাত্র দুই বছরে মুনাফা করে ৬৫০ কোটি টাকা। প্রায় ৩২৫ গুণ মুনাফা। এই বিস্ময়কর মুনাফা পুরো সিলিকন ভ্যালিকে হতবাক করে দেয়। এতে করে এনড্রিসেন কোম্পানি একটি স্বনামধন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানির মর্যাদা পায়। কিন্তু সমস্যা আসে অন্য একদিক থেকে। এনড্রিসেন কোম্পানির মূলধন ছিল ১২ হাজার কোটি টাকা। এখন কেবল একটি বিনিয়োগেই তো মুনাফা করলে হবে না। পুরো মূলধন নিয়ে মুনাফা করতে হলে এনড্রিসনের দরকার প্রায় ১৯টি ইন্সট্রাগ্রামের মতো লাভজনক কোম্পানি। এজন্যই বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন কোম্পানি ও উদ্যোগে বিনিয়োগ করে থাকে। তবে প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে, বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো

এমন শিকড় থেকে শিখরে উঠবে, সফল হবে এমন খুব কম কোম্পানিই খুঁজে পায়। আর পেলে তো কোন কথাই নেই। সেগুলোকে আরও এগিয়ে যেতে সবদিক থেকে সহযোগিতা করে।

অবশ্য এটা তো সত্য যে, কোন কোম্পানি বা উদ্যোগ ভবিষ্যতে সফল হবে তা পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে সবচেয়ে ভালো ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি সেটাই, যে কোম্পানি তার বিনিয়োগ খুব চয়নকৃত নির্দিষ্ট কিছু কোম্পানি বা উদ্যোগের ওপর বিনিয়োগ করে। যাইহোক প্রতিটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি কিন্তু সর্বোপরি মুনাফা করার চেষ্টা করে। মানে যে উদ্যোগেই সে বিনিয়োগ করুক না কেন, মোট বিনিয়োগ যাতে মুনাফা নিয়ে আসে। আমাদের *Founders Fund* কোম্পানিতে আমরা পাঁচটি বা সাতটি কোম্পানি বা উদ্যোগের দিকে মনোযোগ দিয়েছি। যেগুলোকে আমরা মনে করি ভবিষ্যতে একটি হাজার কোটি টাকার ব্যবসায় পরিণত হবে সেগুলোর দিকেই আমরা মনোযোগ দিয়েছি। যখনই আপনি ব্যবসার মৌলিক নীতি, ভিত্তি, জনগণকে কী সেবা দিচ্ছে—এমন সব প্রশ্ন ভুলে কেবল অর্থনৈতিক ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করেন তখনই পুরো বিনিয়োগের বিষয়টা কেবল জুয়াখেলার দিকে চলে যায়। যেন একটি লটারি ধরছেন। আর যখনই আপনি ধরে নিয়েছেন যে, এই ধরনের বিনিয়োগ একটি লটারির মতো, তখনই আপনি মানসিকভাবে ব্যর্থ হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা শুরু করেন।

ক্ষমতা নীতি দিয়ে কী করবেন

(ক্ষমতা নীতি বা *Power Law* বলতে একটি কোম্পানি ভবিষ্যতে যে পরিমাণ মুনাফা অর্জন করার ক্ষমতা রাখে তাকে বোঝানো হয়েছে। যেকোন বিনিয়োগই ভবিষ্যতে মুনাফা করতে পারে বা ব্যর্থ হতে পারে। তার এই মুনাফা করার ক্ষমতাকে ক্ষমতা নীতি বলে।)

ক্ষমতা নীতি কেবল বিনিয়োগকারীদের জন্যই কাজে লাগে তা নয়; বরং এটা প্রত্যেকের জন্যই কাজে লাগে। কারণ আমরা প্রত্যেকেই একজন বিনিয়োগকারী। আর একজন উদ্যোক্তার সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ—তার মূল্যবান সময় বিনিয়োগ করে উদ্যোগের প্রতি কাজ করে। তাই প্রত্যেক উদ্যোক্তাকেই একদম শুরু থেকেই চিন্তা করা উচিত যে, তার উদ্যোগটি কি সফল হতে যাচ্ছে? তার উদ্যোগটি কি জনগণের জন্য উপকারী কোন সেবা সম্পন্ন করবে? তাই

দেখতেই পারছেন, প্রত্যেক উদ্যোক্তাই অবিচ্ছিন্নভাবে একজন বিনিয়োগকারী। সুতরাং যখনই আপনি কোনো পেশা চয়ন করবেন তখন চিন্তা করে নিবেন ঠিক এই কাজটিই আজকে থেকে এক যুগ পরে একটি মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে।

এই ধরনের প্রশ্নের সবচেয়ে সহজ উত্তর হচ্ছে, 'তোমার সব ডিম এক ঝুড়িতে রেখো না।' এটা সবাই বলে যে, বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করা ভালো। এমনকি বড় বড় ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও তাই করে। কিন্তু যেসব বিনিয়োগকারী ক্ষমতা নীতি বোঝে তারা খুব অল্প সংখ্যক প্রকল্পেই তাদের বিনিয়োগ সীমিত রাখে। তবে প্রচলিত রীতি মতে অনেকেই বিভিন্ন দিকে বিনিয়োগ করতে বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে। এতে করে মনে করা হয় যে, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার বুঝি একটা কুলকিনারা হলো; এদিক না হলে ওদিক।

কিন্তু জীবন তো আর বিভিন্ন দিকে বিনিয়োগ করার বিষয় নয়; না এটা একজন উদ্যোক্তার জন্য; না এটা কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তির জন্য। একজন উদ্যোক্তা কখনো নিজেকে বিভিন্ন দিকে বিনিয়োগ করতে পারে না। আপনি কখনোই একই সাথে একই সময়ে গোটা দশেক কোম্পানি চালাতে পারেন না। দশদিকে দশটি কোম্পানি চলছে আর আপনি বসে বসে চিন্তা করছেন যেকোনো একটি থেকে মুনাফা আসলেই চলবে। এটা হবার নয়। ঠিক এই একই ব্যাপারটি জীবনের জন্যও সত্য। আপনি একই সাথে গোটা দশেক সুযোগ নিয়ে বসে থাকতে পারেন না।

অবশ্য আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি কিন্তু আমাদেরকে এর ঠিক উল্টোই শেখায়। কোনো রকম বেঁচে থাকার একটি শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা। যাতে সবকিছুই শেখানো হয় কিন্তু অল্প অল্প করে। আমেরিকার বিদ্যালয় ব্যবস্থা থেকে যারাই শিক্ষা নিয়ে বের হয় তারা সকলেই ক্ষমতা নীতি সম্পর্কে না শিখেই উত্তীর্ণ হয়। প্রতিটি বিদ্যালয়েই ৪৫ মিনিট ধরে একেকটি ক্লাস চলে। বিষয় যাইহোক না কেন ৪৫ মিনিটই নির্ধারিত। কলেজে গেলে ছাত্ররা কোনো একটি বিষয়ে উত্তম করার চেয়ে সব বিষয়ে কীভাবে ভালো করবে তার চিন্তা করতে করতেই হয়রান। অবশ্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ই 'দক্ষতার' ওপর খুব জোর দেয়। কিন্তু তাদের শত শত পৃষ্ঠার বই ও পাঠ্যসূচি দেখে মনে হয় যেন 'তুমি যাই করো কোনো ব্যাপার না; তবে সবকিছুতেই তোমার উপস্থিত থাকতে হবে।' এটা পুরোপুরি একটি ভুয়া জিনিস। একজন মানুষ যদি সবকিছুতেই মাথা ঘামায়, তবে সে আর দক্ষ হবে কীভাবে? দক্ষতা তো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর হয়। আপনাকে সবসময় সেই জিনিসটিতেই অবিরামভাবে পরিশ্রম করে যেতে হবে যেক্ষেত্রটিতে আপনি ভালো।

তবে কঠোর পরিশ্রম শুরু করার আগে খুব ভালোভাবে চিন্তা করে নিবেন যে, আপনি যা করতে যাচ্ছেন তার একটি ভবিষ্যৎ মূল্য আছে।

এই বিশ্বে প্রতিটি উদ্যোগের জন্যই জায়গা আছে। তবে তার মানে এই নয়, আপনার মেধা থাকলেই আপনাকে একটি কোম্পানি খুলে বসে থাকতে হবে। যদিও আজকাল অনেকেই তাদের নিজেদের একটি করে কোম্পানি খুলে কাজ শুরু করেছে। যারা *ক্ষমতা নীতি* বোঝে, তারা এটাও বোঝে যে, কোম্পানি না খুলেও একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগের সাথে থাকলে তারা আর বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারবে। তারা সম্ভাবনাময় উদ্যোগের সাথে থেকেও নিজেদের ও অন্যদের এগিয়ে নিয়ে যায়। *ক্ষমতা নীতি* থেকে এটা খুব ভালো বোঝা যায়। আপনি যদি আপনার একটি কোম্পানি বা উদ্যোগ নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেন তবে আপনি শতভাগ সেই কোম্পানির সাফল্যের অধিকারী। আর যদি কোম্পানি ব্যর্থ হয় তবে কিন্তু আপনি একাই সেই শতভাগ ব্যর্থতার অধিকারী। আপনি যদি গুগলের কেবল ০.০১% এরও মালিক হতে পারেন তবে তার মূল্য এই রচনা লেখার সময় পর্যন্ত প্রায় ৩০০ কোটি টাকা।

আর আপনি যদি নিজের একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠাই করতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই ক্ষমতা নীতি উপলব্ধি করা উচিত এবং সে অনুযায়ী কোম্পানি চালানো উচিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে—একটি নির্দিষ্ট বাজার অন্য সব বাজারের চেয়ে উত্তম। এই ব্যাপারে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। একটি নির্দিষ্ট জায়গা তৈরি করা অন্য সব জায়গায় কেবল ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে অনেক উত্তম। এই ব্যাপারে আমরা এগারো অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ক্ষমতা নীতির জন্য সময় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারে আমরা নবম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। যাইহোক, সবাই যে ক্ষমতা নীতি মেনে চলে তাও নয়। কিন্তু আপনাকে সবসময়ই এটা চিন্তা করে বের করতে হবে, এই যে আমার এত চেষ্টা, আমার এত পরিশ্রম এটা আসলে ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

আট

গোপনীয়তা

আমরা সাধারণ মানুষ প্রায়ই বলে থাকি যে, প্রতিটি ব্যবসাতেই একটি গুমোর থাকে। আর এই অধ্যায়টি হচ্ছে ব্যবসার সেই গুমোর বা গোপনীয়তা নিয়ে।

আজকে যে ধারণা বা উদ্যোগটি সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে সফল, একদিন ঠিক এই ধারণা বা উদ্যোগটিই কেউ জানতো না বা জানলেও এতটা জনপ্রিয় হওয়া সম্ভব বলে বুঝতো না। ধরুন পিথাগোরাসের উপপাদ্য : একটি ত্রিভুজের অতিভুজের ওপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফলের অপর দুই বাহুর ওপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফলের যোগফলের সমান। কিন্তু এই তথ্যটি পিথাগোরাস আবিষ্কার করার আগে কেউই এই সম্পর্কে জানতো না। যে তথ্য আগে কেউ জানতো না, কেউ বিশ্বাস করতো না ঠিক সেই তথ্য, সেই উপপাদ্যই আজকে আমরা আমাদের বাচ্চাদের বিদ্যালয় থেকেই শেখাচ্ছি। এটা এখন একটি প্রচলিত সত্যে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়েই গণিত শেখাতে গেলে আমাদের এখন এই উপপাদ্যটি শেখানো হয়। কিন্তু এটা মুখস্ত করে আপনি নতুন কোন কিছু শিখবেন না। কারণ, এর মধ্যে কোনো গুমোর নেই।

আমাদের সেই বৈপরীত্যমূলক প্রশ্নটি স্মরণ আছে কি—'এমন কোন কোন সত্য বিষয় আছে যাতে খুব কম লোকই আপনার সাথে একমত হয়?' এখন

আমরা যদি আমাদের এই বিশ্বকে বুঝে ফেলি যার চেষ্টা আমরা প্রতিনিয়তই করছি, যদি আমাদের প্রচলিত ধারণা সব আবিষ্কার হয়েই যায়, যদি যা যা করা দরকার তার সবকিছুই করা হয়ে যায়—তাহলে তো দেখা যাচ্ছে আমাদের আর নতুন কিছু করার নেই। তাছাড়া এই বৈপরীত্যমূলক প্রশ্নেরও কোন দরকার নেই। কারণ বিশ্বের কাছে যদি গোপনীয় কিছু নাই থাকে তবে বৈপরীত্যমূলক চিন্তা দিয়েও কোন লাভ হবে না। (আপনার দেশে যদি সবকিছুই আবিষ্কার হয়ে যায় তবে আপনার আর কিছুই করার নেই।)

হ্যাঁ, এটা সত্য যে, আমরা এখনো অনেক কিছু সম্বন্ধে জানি না, আবিষ্কার করতে পারিনি। আবার এই জিনিসগুলোর মধ্যেই এমন কিছু জিনিস আছে যা আমরা জীবনেও বের করতে পারবো না। আমি রহস্যের কথা বলছি না, আমি বলছি গোপনীয়তার কথা। এখন উদাহরণ হিসেবে ধরুন তন্তু তত্ত্ব। তন্তু তত্ত্ব নিয়ে আগে যাওয়ার আগে এ সম্পর্কে একটু বলে নিই। তন্তু তত্ত্ব হচ্ছে আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সমন্বয়কারী তত্ত্ব। এটাকে ইংরেজিতে স্ট্রিং থিওরি (string throry) বলে। এই তত্ত্ব মতে এই মহাবিশ্বের সবকিছু, বস্তু ও শক্তি, সবকিছু কম্পন দ্বারা সৃষ্ট। গিটারের একটি তারকে বিভিন্নভাবে আঘাত করলে আমরা যেমন বিভিন্ন মাত্রার শব্দ শুনতে পাই, প্রায় একই রকম ব্যাপার ঘটে তন্তু তত্ত্বের বেলাতেও তাই। তবে তন্তু তত্ত্বের তন্তুগুলো কম্পিত হলে বিভিন্ন মাত্রার সুরধ্বনি পাওয়া যায় না; বরং পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের কণিকা। কণিকাগুলোর ভর, চার্জ, ঘূর্ণন সবকিছুই আসলে নির্ধারিত হয় তন্তুর কম্পনের বিভিন্ন রকমফেরে। এই সম্পর্কে আরও পাঠ করতে দেখুন হিমাংশু করের বই '*স্ট্রিং থিওরি*'। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই তন্তু তত্ত্ব কী আসলে সত্য? আর এই ধরনের তত্ত্ব পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পও তৈরি করা সম্ভব নয়। কিন্তু তার মানে কি এটা কেবল কঠিন বলে? নাকি এটা অসম্ভব বলে? এই দুইয়ের মধ্যে কিন্তু বিস্তর ফারাক রয়েছে। আপনি ইচ্ছা করলে কঠিন কিছু অর্জন করতে পারবেন, কিন্তু আপনি অসম্ভব কিছু অর্জন করতে পারবেন না।

এখন আমরা যদি সেই বৈপরীত্যমূলক প্রশ্নটি আবার স্মরণ করি : মূল্যবান এমন কোন ব্যবসাটি এখনও কেউ করছে না? এই প্রশ্নের যতগুলো ঠিক উত্তর আসবে তার সবগুলো গোপনীয় থাকতে হবে। এটা হতে হবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিন্তু কেউ এই ব্যাপারে বেশি কিছু জানে না এমন। এমন কিছু যা করাটা কষ্টকর কিন্তু করা সম্ভব। যদি এখনও বিশ্বে অনেক গোপন জিনিস লুকিয়ে থাকে তবে আমরা বলতে পারি যে, এখনও বিশ্ব বদলে দেওয়ার মতো নতুন নতুন কোম্পানি বা

উদ্যোগ আসার বাকি রয়েছে। এই অধ্যায় আপনাকে সেই গোপনীয় ব্যাপারে চিন্তা করতে এবং সেগুলোকে খুঁজে বের করতেই সহযোগিতা করবে।

লোকজন কেন গোপন ব্যাপারগুলো খুঁজে দেখে না?

বেশিরভাগ লোকজন এমন ভাবে আচরণ করে যেন বিশ্বে আর গোপন কিছু নেই। তাই তারা খুঁজে দেখারও চেষ্টা করে না। টেড ক্যাকস্কি নামক এক ব্যক্তির কথা বলি। সে সারা আমেরিকা জুড়ে বম্বিং করার অপরাধে অপরাধী। ক্যাকস্কি মাত্র ১৬ বছর বয়সে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। সে পরবর্তীতে গণিতে একটি পিএইচডি গ্রহণের পর ক্যালিফোর্নিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে। সে ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সারা দেশে এ নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। তার বক্তব্য ছিল, আধুনিক সমাজব্যবস্থা, কল-কারখানা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন মানবজাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই সে শিক্ষক, প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবসায়িক লোকজনকে হত্যার জন্য টার্গেট করে। সে তিনজনকে হত্যা করে এবং ২৩ জনকে আহত করে।

১৯৯৫ সালের দিকে, এফবিআই অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তাকে পাচ্ছিল না। ক্যাকস্কি ৩৫,০০০ শব্দের একটি ইশতেহার দিয়েছিল যাতে তার কর্মের পূর্ণ যুক্তি ও বর্ণনা ছিল। পুলিশ সেই ইশতেহার কয়েকটি পত্রিকায় দিয়ে দেয়। তারপর ক্যাকস্কির ভাই সেই লেখা দেখে ক্যাকস্কির হাতের লেখা বলে সনাক্ত করে এবং তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়।

আপনার হয়তো মনে হতে পারে যে, অপরাধই যখন করবে তো ইশতেহার দিয়ে ঘোষণা দেওয়ার কী দরকার। এটা অনেকটা পাগলামি মনে হতে পারে। তবে সে এটা দেওয়ার যুক্তি দিয়েছে। ক্যাকস্কির মতে সুখী হওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই 'এমন লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে যা অর্জন করা একটু কষ্টকর এবং অন্তত পক্ষে সেই লক্ষ্যের কিয়দংশ হলেও অর্জন করতে হবে।' সে মানুষের লক্ষ্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে :

১. এমন লক্ষ্য যা অল্প চেষ্টায় অর্জন করা যায় তা একজনকে অল্পই সন্তুষ্ট করতে পারে।

২. এমন লক্ষ্য যা অনেক চেষ্টায় অর্জন করা যায় তা একজনকে অনেক বেশি সন্তুষ্ট করতে পারে।

৩. এমন লক্ষ্য যা অনেক চেষ্টা করেও অর্জন করা যায় না তা একজনকে

কখনো সন্তুষ্ট করতে পারে না।

এটা হচ্ছে তার সহজ, কঠিন ও অসম্ভব, এই তিনটি ভাগে ভাগ করা সুখের তত্ত্ব। ক্যাকস্কির মতে আধুনিক যুগের লোকজন অনেক বেশি হতাশ, তার কারণ পৃথিবীর সব কঠিন সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আর যা বাকি আছে তা হয় সহজ; না হয় অসম্ভব। আর এই কাজগুলোই মানুষের মাঝে হতাশা সৃষ্টি করছে। একটি শিশুও যদি তা করতে পারে তবে আমি কী করবো, যদি আইন্সটাইনও একটি কাজ করতে না পারে তবে তা আমি কীভাবে করবো। তো এই হলো ক্যাকস্কির বক্তব্য। তাই সে সব ধরনের প্রযুক্তিবিদদের হত্যা করে তাদের হাত থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে চেয়েছে। যখন কোন প্রযুক্তিই থাকবে না তখন লোকজন তাদের কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন করে চেষ্টা আরম্ভ করবে। যদিও ক্যাকস্কির বক্তব্য অনেকটা পাগলামির পর্যায়ে পড়ে তবুও এটা আমাদেরকে প্রযুক্তি নিয়ে নতুন করে চিন্তা করার সুযোগ দেয়।

Hipster or Unabomber?

সাধারণত আমাদের দেশের অভিভাবকরা তাদের সন্তান নিয়ে তাদের স্বপ্ন ও চিন্তার বাইরে বেশিদূর ভাবতে পারে না। কোনো অভিভাবকই তার সন্তানকে নিয়ে এটা চিন্তা করে না যে, সে একদিন জাহাজের ক্যাপ্টেন হয়ে নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করবে বা দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে। এখনো আমাজন জঙ্গলে অনেক গোত্র বাইরের পৃথিবীর আলো দেখেনি। এখনো সাগরের এমন এমন তল

ও প্রাণী আছে যা আমরা আবিষ্কার করিনি।

এখন অগ্রদূত হওয়া সত্যিই কষ্টকর। প্রথমত আমাদের ক্রমবর্ধমান চিন্তাধারা। আমরা শৈশব থেকেই যেকোনো জিনিস বা কাজ করার একটি ঠিক পন্থা শিখে নিচ্ছি বা আমাদের শেখানো হচ্ছে। বাসা বা বিদ্যালয়ে, প্রতিটি দিন, প্রতিটি বছর ধীরে ধীরে আমরা এটা শিখে চলছি। এখন তো অবস্থাটি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আপনি যদি বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির বাইরে কোনকিছুতে দক্ষতা অর্জন করেন তবে তাতে কোনো লাভ নেই। কারণ সেটা আপনার সার্টিফিকেটে লেখা থাকবে না। তাহলে আপনাকে কী করতে বলা হচ্ছে? শুধু আপনার সঙ্গী ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে একটু বেশি নম্বর পেতে বলা হচ্ছে। তাহলেই আপনি *A or A+* পাবেন। এজন্যই আজকাল আপনি দেখবেন কোন কাজে অগ্রদূত হওয়ার চেয়ে পরীক্ষায় কীভাবে নম্বর বেশি পাওয়া যায় তার প্রতিযোগিতা চলছে।

দ্বিতীয়ত নতুন কিছু শুরু করাটা ঝুঁকি সাপেক্ষ। তাই সবাই ঝুঁকি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। লোকজন গোপন ব্যাপারগুলো নিয়ে ভয় পায় কারণ তারা ব্যর্থ হবে এই আশঙ্কায় ভীত। আপনি যে ব্যবসার গোপনীয়তা সম্পর্কে জানতে চান তাকে বলছি, গোপনীয়তার সংজ্ঞা অনুসারে গোপনীয়তা হচ্ছে তাই যা সম্পর্কে সবাই জানে না। সবাই যদি জেনেই যায় তবে সেটা আর গোপন হলো কী করে। যদি আপনার লক্ষ্য হয়ে থাকে যে আপনি জীবনে কোনো ভুল করবেন না, তাহলে গোপনীয় বিষয় খুঁজে দেখাটা বাদ দিন। আপনি কোনো কিছু আবিষ্কার করেছেন এবং এটা সঠিক, সেই বিশ্বাসের পাশে একা দাঁড়িয়ে থাকাটা কঠিন। অন্য কেউ আপনার উদ্যোগে বিশ্বাস করে না তবুও তার জন্য আপনি আপনার জীবনের মূল্যবান সময়, শ্রম ও বুদ্ধি দিতে প্রস্তুত—এই ধরনের কাজে নেতৃত্ব দেওয়া আসলেই কঠিন। তাই এই ধরনের একলা পরিস্থিতিতে একা দাঁড়িয়ে থাকা এবং যদি ভুল হয় তা মেনে নেওয়া একটি অসহ্য ব্যাপার।

তৃতীয়ত আত্মসন্তুষ্টি। সামাজিকভাবে যারা অর্থবিত্তে ধনী তারাই সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে এবং তাদেরই নতুন কিছু চিন্তা করার, নতুন কিছু খোঁজার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু তারা কোন ধরনের গোপনীয়তা বা নতুনত্বে বিশ্বাস করে না। কারণ আপনার যদি চলার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও সুবিধাদি থাকে তাহলে কেন আপনি নতুন কিছু খুঁজবেন।

চতুর্থত গড়পড়তা একটি ভাব। সবাই যা করছে আমাকেও তাই করতে হবে। বিশ্বায়ন চলছে। বিশ্ব আগের থেকে অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। তাই

মনে হচ্ছে সবাই যে ব্যবসা করছে আমাকেও তাই করতে হবে। আর কেউ যদি নতুন কিছু করার জন্য চেষ্টার চিন্তাও করে তাহলে জনপ্রশ্ন হচ্ছে, 'আরে এটা যদি সত্যিকার অর্থেই মূল্যবান কিছু হতো তাহলে তো বিশ্বের আরও মেধাবী লোকজন আছে, তারাই এটা আবিষ্কার করতো।' এই কথা শুনলে যেকেউ নতুন কিছু খোঁজার চেষ্টাই ছেড়ে দেয়। এই কথা থেকে মনে হচ্ছে আজকের বিশ্ব এতটাই বড় হয়ে গেছে যে আমার একটি ছোট্ট কাজ মানুষের কোন উপকারেই লাগবে না।

(অনুবাদক হিসেবে আমি যখন প্রথম বই অনুবাদ করি এবং আমার বন্ধু ও পরিবারকে বলি যে, বাংলাদেশের মানুষকে কার্যকরভাবে অনুপ্রাণিত করা দরকার। মানুষকে জীবনে উন্নতি করার প্রতি, এগিয়ে যাওয়ার প্রতি আরও অনুপ্রাণিত করা দরকার। তখন আমার বন্ধুদের কাছ থেকে আমিও এমন কথাই শুনেছি তোমার যদি মনে হয় যে বাংলাদেশের মানুষের অনুপ্রেরণা দরকার তবে তারা তো বিভিন্ন বড় বড় মানুষের কাছ থেকে পাচ্ছে। তুমি অবুঝ, অচল একটি মানুষ। কেন এইসব অতিকর্মে পা দিচ্ছো। বাংলাদেশের অনেক বড় বড় মাপের মানুষ জনগণের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে। সেখানে তোমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের কোনো কাজ নেই। এইসব 'আকাম' (অকর্ম বা বাজে কাজ) বাদ দাও। কোনো রকম একটি চাকরি নাও। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার একটি ছোট্ট কাজও এই বিশ্বের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম। সেই বিশ্বাস থেকেই কাজ করছি এবং কাজ করে যাবো।)

আবার অনুবাদে ফিরে আসি। এই সব তথ্য থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে, আপনি চাইলেই হঠাৎ করে একটি রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। আজকে থেকে ৪০ বছর আগেও যখন তথ্যপ্রবাহের এমন খোলা সুযোগ ছিল না তখনও লোকজন নতুন নতুন ধারণাকে অনেকটা সাধুবাদ জানিয়েছে। সমাজতন্ত্র থেকে শুরু করে স্নায়ুতন্ত্র সবকিছুতেই মানুষ আগ্রহী ছিল। তারা চিন্তা করতো এটা থেকে হয়তো নতুন কিছু শেখা যেতে পারে। কিন্তু আজকে আপনি যদি প্রচলিত নিয়মের বাইরে কিছু করতে যান তবে হয় লোকজন আপনাকে খুব একটা পাত্তা দিবে না; না হয় আপনার পাত্তা থাকবে না। এখন কেবল সবাই যা করে তাই করে যাওয়াটাকেই উন্নতি বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের ভাগ্য ভালো যে এখনো কিছু কিছু প্রথাবিরোধী লোকজন আছে যারা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের অবাক হওয়ার মতো কাজ করে দেখাচ্ছে।

প্রচলিত পথে চলছে পৃথিবী

আপনি যদি কোনো ধরনের গুমোরে বিশ্বাস নাই করেন তবে এই বিশ্বকে আপনি কীভাবে দেখেন বা ভবিষ্যতে কীভাবে দেখবেন? আপনার যদি মনে হয় বিশ্বের সবকিছুই আবিষ্কার হয়ে গেছে তবে আপনি আর কী খুঁজছেন? যদি আজকের প্রচলিত সব কথাই সত্যি হয় তবে আমাদের আর কিছুই করার নেই। ফিটফাট হয়ে আত্মতুষ্টি নিয়ে বসে থাকা উচিত। আর 'আল্লাহ যা করবেন তা ভালোর জন্যই করবেন।'

ধরুন, বিশ্বের আর কিছুই আবিষ্কারের বাকি নেই। তাহলে তো সবকিছু ন্যায় নীতি মেনেই চলতো। এরপরেও কেন এত অন্যায়? এটা জেনে রাখবেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যায় আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা রোধ করার জন্য কোনো না কোনো নতুন পথ অবশ্যই আছে যা আমরা এখনো আবিষ্কার করিনি।

মনে করুন ব্যবসার কোনো কিছুর মধ্যেই আর গুমোর নেই। অর্থনীতি অনুযায়ী এমন অবস্থা একটি ভারসাম্যপূর্ণ দক্ষ বাজারের দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এই ধরনের অবস্থা বাজারের মধ্যে এক ধরনের ফাকাঁ বুদবুদ সৃষ্টি করে, এক ধরনের অদক্ষ ব্যবস্থাপনার আয়োজন করে। (আর যত বেশি লোকজন এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয় তত বেশি এই ফাকাঁ বুদবুদের সৃষ্টি হয়।) আমরা ঠিক এমনই এক পরিস্থিতিকে অতিক্রম করেছি। ১৯৯৯ সালে কেউই এটা বিশ্বাস করতে চায়নি যে, ইন্টারনেট সম্পর্কিত কোম্পানিগুলোর দাম অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। ঠিক একই ব্যাপার ঘটে ২০০৫ সালে জমির ব্যবসা নিয়ে। যদিও এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সাবধান করা হয়েছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। এরপরই এলো ২০০৮ সালের শেয়ারবাজার ধস। (এটা আমেরিকান শেয়ারবাজার ধস। বাংলাদেশের শেয়ারবাজার ধস ঘটে ২০০৯-১০ সালে। তার কারণও অনেকটা একই রকম।) দেখা গেল যে, ভবিষ্যৎ এমন এমন গোপন জিনিস উন্মোচন করছে যা অর্থনীতিবিদরা ভাবতেও পারেনি।

এখন আমরা দেখবো একটি কোম্পানি যদি গুমোরে বিশ্বাস না করে তবে কী ঘটে। বিখ্যাত এইচপি কোম্পানির নিম্নমুখী প্রবাহচিত্র দেখলেই এই ব্যাপারটি

পরিষ্কার বোঝা যায়। ১৯৯০ সালে এইচপি কোম্পানির মূল্য ছিল ৭৫ হাজার কোটি টাকা। এরপর 'তাদের নতুন উদ্ভাবনের এক দশকের সূচনা ঘটে। তারা ১৯৯১ সালে ডেস্কজেট ৫০০সি নামক বিশ্বের প্রথম সাশ্রয়ী মূল্যের রঙিন প্রিন্টার উদ্ভাবন করে। ১৯৯৩ সালে ওমনিবুক নামে বহনযোগ্য ল্যাপটপ বাজারে ছাড়ে। এর পরের বছর বিশ্বের প্রথম প্রিন্টার/ফ্যাক্স/ফটোকপি মেশিন একত্রে একটি যন্ত্রের মধ্যে অফিসজেট নামে বাজারে ছাড়ে। তাদের অবিরাম পরিশ্রমের ফলাফল স্বরূপ ২০০০ সালে তাদের কোম্পানির মূল্য এসে দাঁড়ায় ১১ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা।

কিন্তু এরপরই এইচপি উদ্ভাবন বন্ধ করে দেয়। তারা তাদের বিদ্যমান পণ্যগুলোর মেরামত করা শুরু করে। ২০০২ সালে এইচপি কমপ্যাকের সাথে যৌথ অংশীদারে ব্যবসা আরম্ভ করে। কারণ তাদের মতে তাদের আর কিছু করার নেই। ২০০৫ সালের মধ্যেই তাদের কোম্পানির মূল্য নেমে আসে ৬ লাখ কোটি টাকায়। মাত্র পাঁচ বছর আগে যেখানে ছিল সেখান থেকে পুরো অর্ধেকে নেমে আসে। এরপর ২০১২ সালে এর মূল্য নেমে আসে ১ লাখ ৮৫ হাজার কোটি টাকায়। যা ১৯৯০ সালের মূল্য থেকে খুব একটা বেশি নয়।

গোপন জায়গা

সত্যি কথা বলতে আপনি যদি ব্যবসায়িক গুমোর না খোঁজেন তবে তা আপনার সামনেও কখনো আসবে না। আর আসলেও আপনি তো চিনতে পারবেন না। এন্ড্রু উইলস যখন ৩৫৮ বছর পর গণিতবিদ পিয়ের দ্য ফের্মার শেষ উপপাদ্যটি প্রমাণ করেন তখন তিনি এই ব্যাপারটিকেই তুলে ধরেন। তিনি ১৯৮৬ সাল থেকে কাজ আরম্ভ করেন। $a^n + b^n = c^n$ সূত্রটি প্রমাণের চেষ্টা করেন। তিনি ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ব্যাপারটি গোপন রাখেন। তারপর দীর্ঘ নয় বছরের চেষ্টার পর তিনি ১৯৯৫ সালে তার প্রমাণ সকলের সামনে পেশ করেন। তার সাফল্যের জন্য প্রচুর মেধা ও শ্রম দরকার হয়েছে এবং তিনি তা দিয়েছেন। কিন্তু এর সাথে সাথে তিনি যে এটা পারবেন তাতেও তার বিশ্বাস ছিল। যদি আপনার মনে হয় কোনো একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব, তবে আপনি তা অর্জনের জন্য কখনো

চেষ্টাই করবেন না। গোপনীয়তার ওপর বিশ্বাস করা যে, আপনি কাজটি করতে পারবেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঠিক এই ব্যাপারটি ব্যবসার জন্যও সত্য। বড় বড় কোম্পানি এ ধরনের গোপন সম্ভাবনাকে আশ্রয় করেই বড় হয়েছে। *Airbnb* এমনই একটি কোম্পানি। বিভিন্ন পর্যটকরা বা যাত্রীরা বিভিন্ন জায়গায় যেত, হঠাৎ সেখানে যে হোটেল পেত সেখানেই উঠতো। এতে করে যাত্রীদেরকে অনেক বেশি ভাড়া গুণতে হতো। এখানে *Airbnb* একটি গোপন সুযোগ দেখলো। ঠিক একই রকমভাবে *Lyft* ও *Uber* ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে সুযোগ দেখলো এবং তা কাজে লাগালো। খুব অল্প লোকই এটা বিশ্বাস করতো যে, কেবল একজনের যাত্রাপথে যদি আরেকজনকে উঠিয়ে নেওয়া যায় তবে এর ভাড়া থেকে হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হওয়া সম্ভব। এই সেবা ব্যবহার করে এখন আমরা সিএনজি ও ট্যাক্সি চালকদের এড়িয়ে চলছি। তাদের ঘৃণ্য ও অমার্জিত আচরণ আর আমাদের সহ্য করতে হচ্ছে না। আপনি যদি এমন কোন লুকায়িত সুযোগ খুঁজে পেতে চান তবে আপনাকে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে চিন্তা করতে হবে। আর এভাবে যদি আমরা চিন্তা করতে পারি তবে এখনও অনেক বড় বড় কোম্পানি ভবিষ্যতে আসবে বলে আমরা দাবি করতে পারি।

কীভাবে এমন গোপন সুযোগ খুঁজে পাবেন?

এখানে দুই ধরনের গোপন ব্যাপার রয়েছে : এক হচ্ছে প্রকৃতির গোপন সম্পদ, আর দুই হচ্ছে মানুষের মাঝে লুকানো কোনো সুযোগ। প্রকৃতির গোপন ব্যাপারগুলো আমাদের চারপাশেই ছড়িয়ে আছে। একজন যদি তা খুঁজে পেতে চায় তবে তাকে বাহ্যিক জগতের ভূগোল সম্পর্কে খুব ভালো করে চিন্তাভাবনা করা উচিত। কিন্তু মানুষের মাঝে লুকানো সুযোগটি একটু ভিন্ন। মানুষের ক্ষেত্রে এমন এমন গোপন বিষয় আছে যেগুলো মানুষ নিজেই জানে না অথবা সে জানলেও তা লুকিয়ে রাখে, কারণ সে চায় না এটা অন্যদের কাছে প্রকাশ পেয়ে যাক। তাই যখনই কোনো নতুন ধরনের উদ্যোগ নিতে যাবেন তখন এই দুই ধরনের প্রশ্ন নিজেকে করুন—প্রকৃতি আপনার কাছ থেকে কোন জিনিসটি গোপন রাখছে? কোন ধরনের গোপন জিনিস সম্পর্কে লোকজন আপনাকে বলছে না?

প্রকৃতির গোপন সম্পদ সম্পর্কে অনুমান করা একটু সহজ। এজন্য কোনো ধরনের পদার্থবিদের সাথে কাজ করাটা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তারা এ যাবৎ আবিষ্কৃত সব তথ্য সম্পর্কেই জানে। এতে করে তারা মনে করে তারা সবকিছু সম্পর্কেই জানে। কিন্তু একজন লোক কি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তত্ত্ব সম্পর্কে ভালো জানলেই বিয়ের ব্যাপারে উত্তম পরামর্শ দিতে পারবে? নাকি একজন পদার্থবিদ আপনার ব্যবসা সম্পর্কে আপনার চেয়ে ভালো বোঝে? আমি একবার পেপালের জন্য এক পদে নিয়োগ দিতে গিয়ে একজন পিএইচডি ডিগ্রিধারী পদার্থবিদের সাক্ষাৎকার নিই। আমি কোনো প্রশ্ন করার আগেই ভদ্রলোক বলে বসলেন, 'দাঁড়ান! আমি জানি আপনি কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছেন!' যদিও আমি কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম সেটা তিনি বলতে পারেনি। কিন্তু এরপর, তাকে না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা আমার জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়।

মানুষের মাঝে লুকানো ব্যাপারগুলো সাধারণত অপ্রশংসনীয়। আর এজন্যই হয়তো আপনাকে এই ব্যাপারে কয়েক দশক ধরে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে পড়ালেখা করতে হয় না। তারা চায় না তাদেরকে কেউ এমন প্রশ্ন করুক যাতে তার গোপনীয়তা উন্মুক্ত হয়ে পড়ুক। যেমন : লোকজন কী নিয়ে কথা বলতে চায় না অথবা কী নিয়ে কথা বলার অনুমতি নেই? কোন জিনিসটি নিষিদ্ধ?

কিছু কিছু সময় প্রকৃতির গোপন ব্যাপার আর মানুষের গোপন ব্যাপার ঠিক একই রকম হয়। একচেটিয়া ব্যবসার কথাই ধরুন : প্রতিযোগিতা এবং পুঁজিবাদকে একে অপরের বিপরীত ধরা হয়। আপনি যদি এখনো এদের গুমোর ধরতে না পারেন; সমস্যা নেই; আপনি খুব সহজেই তা আবিষ্কার করতে পারেন। এটার প্রাকৃতিক উপায় হচ্ছে গবেষণা করা। আপনি যদি আজকের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান বা বড় বড় বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফার দিকে তাকান তবে দেখবেন যে, তারা প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ বাইরে। এবার আপনি মানবিক দিক থেকেও চেষ্টা করতে পারেন : এমন কোন ধরনের কোম্পানি লোকজন এখনো আরম্ভ করেনি? অথবা, এমন কোন ধরনের কোম্পানি খোলার অনুমতি নেই? অথবা, এমন কোন ধরনের কোম্পানি চালু আছে কিন্তু লোকজন সেগুলো নিয়ে আলাপ করে না বা নিষেধাজ্ঞা আছে? আপনি লক্ষ করে দেখবেন যে একচেটিয়া কোম্পানিগুলো বাজারে তাদের অবস্থানকে সবসময় প্রতিযোগিতাপূর্ণ করে

দেখাতে চেষ্টা করে। আর প্রতিযোগিতামূলক কোম্পানিগুলো বাজারে একচেটিয়া অবস্থান আছে বলে দাবি করে। এসব প্রতিষ্ঠানকে উপর থেকে দেখলে খুব ছোট বলে মনে হয়; কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি অনেক বিশাল।

(এমন কোনো ধরনের কোম্পানি চালু আছে কিন্তু লোকজন সেগুলো নিয়ে আলাপ করে না বা নিষেধাজ্ঞা আছে? এই ব্যাপারে আমার একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছি। আমার এক বন্ধু, তার নাম আপেল, সে একটি ঔষধ কোম্পানিতে কাঠের গুড়াঁ সরবরাহ করতো। কোম্পানির চুল্লি জ্বালানোর জন্য প্রতিদিন ১,৫০০ থেকে ১,৬০০ কেজি বা প্রায় ৪০ টনের মতো কাঠের গুড়াঁ প্রয়োজন। এর জন্য তাদের ১০-১২ জন সরবরাহকারী মজুদ ছিল। এদের মধ্যে আপেলও একজন। সে প্রতিদিন প্রায় ৫ টনের মতো কাঠের গুড়াঁ সংগ্রহ ও সরবরাহ করতো। এই ধরনের যে কোনো ব্যবসা আছে তা আমি সেদিনই প্রথম জানলাম। একটি কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের অনেক কাজ রয়েছে। বাংলাদেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠান এমন ছোট ছোট অনেক সরবরাহকারীদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে তাদের কর্ম সম্পাদন করে। সেখানে আপনার, আমার, আমাদের সকলের নিত্য নতুন কাজ করার, নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে একটি ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের মূলধন আটকে রাখে। মানে বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে কয়েক মাস, এমনকি বছরের পর বছর সময় নেয়। এভাবে বড় প্রতিষ্ঠান তো আরও বড় হতে থাকে কিন্তু ছোট ব্যবসায়ীরা নিঃস্ব হয়ে যায়।)

গোপন কোনো সুযোগ খুঁজে পাওয়ার সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে যেখানে কেউ দেখে না, যেখানে কেউ খোঁজে না। এই প্রসঙ্গে একটি প্রবাদ আছে : *যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখিবে তাই, পাইলেও পাইতে পারো মানিক ও রতন।* বেশিরভাগ লোকজন চিন্তা করে যা তারা আগে থেকে শিখেছে তার ওপর ভিত্তি করে। আমাদের বিদ্যালয়ে তো প্রচলিত ব্যাপারগুলোই ভালো ভাবে ছাত্রছাত্রীদের মাথায় গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করে। তো এমন অবস্থায় আপনি নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবেন যে, আর কি এমন কোনো প্রতিষ্ঠান বা ক্ষেত্র আছে যা নিয়ে নতুনভাবে কাজ করা যায়। বেশ ভালো প্রশ্ন। উদাহরণ হিসেবে আমরা পদার্থবিজ্ঞানকে ধরি। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই পদার্থবিজ্ঞানকে প্রধান বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়। পদার্থবিজ্ঞানের বিপরীত হচ্ছে জ্যোর্তিবিজ্ঞান। কিন্তু

জ্যোর্তিবিজ্ঞানের ততটা গুরুত্ব নেই। আবার যদি বলি পুষ্টিবিজ্ঞানের কী খবর। আমাদের সকলের জন্যই তো পুষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু আপনি হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে পুষ্টিবিজ্ঞানকে প্রধান বিষয় হিসেবে নিতে পারবেন না। বড় বড় সব বিজ্ঞানী অন্য কোনো ক্ষেত্রে তাদের শ্রম দিবে। আজকের যে বিষয়গুলোকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয় তা আজকে থেকে ৩০-৪০ বছর আগেই গবেষণা করে সম্পাদন করা হয়ে গেছে। আজকে আমাদের যে পুষ্টিগত সমস্যা বা অতি মোটা হয়ে উঠার প্রবণতা এর কারণ বিভিন্ন ধরনের তৈল জাতীয় খাবার গ্রহণ এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাবার গ্রহণ। আমরা আমাদের দেহের পুষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে ততটা জানি না যতটা জানি আকাশের গ্রহ নক্ষত্র কী দিয়ে গঠিত। যদিও দেহের পুষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে জানা তত সহজ নয়, তবে সম্ভব। তাহলে এটা তো নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, অন্তত এই ক্ষেত্রে এখনো অনেক গোপন জিনিস আছে যা আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে।

গোপন জিনিস নিয়ে কী করবেন?

আপনি যদি একটি গোপন জিনিস আবিষ্কার করেন, এখন আপনার সামনে দুইটি পথ খোলা : আপনি কি কাউকে জানাবেন? নাকি আপনি নিজের কাছেই গোপন করে রাখবেন?

এখন এটা তো সেই গোপন বিষয়টার ওপরই নির্ভর করে। কিছু কিছু গোপন জিনিস অন্যগুলোর চেয়ে অধিক ভয়ানক। এর মাত্রা কত ভয়ংকর, না সুবিধাজনক তা তো আপনিই ভালো জানেন। ষোড়শ শতকে *ফাউস্ট* নামক একটি জার্মান উপকথা নিয়ে নাটক হয়। সেখানে ফাউস্ট একজন বিখ্যাত সুরকার ভাগনারকে বলেন,

> *'খুব অল্প লোকজনই জানে তাদের কী শেখা উচিত, আর বোকারা তাদের পুরো প্রচেষ্টা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং যা জানে তাদের সবকিছু সম্পর্কে লোকজনকে বলে দেয়। কিন্তু মানবজাতি সবসময়ই এমন কাজের তীব্র*

সমালোচনা করে। কিছু কিছু সময় তো আগুন জ্বালিয়ে দেয়।'

যদি আপনার বিশ্বাস থাকে আপনি যা জানেন তা জানানো উচিত তবে জানাতে পারেন। আর যদি মনে করেন এই দুর্লভ জিনিসটি জানানোর এখনো সময় হয়নি তবে তা গোপন রাখতে পারেন।

যদি আপনি বলতেই চান তবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কাকে বলবেন। কেবল যাকে জানানোর দরকার তাকে বলবেন, আর অন্য কাউকে না। বাস্তব জগতে কাউকে না বলা আর সবাইকে বলার মধ্যে বিশাল এক ফারাক রয়েছে। আর সেটাই হচ্ছে কোম্পানি। একজন সফল উদ্যোক্তা এটা বোঝে যে, প্রতিটি মহান প্রতিষ্ঠানই একটি গোপনীয়তা রক্ষা করে চলে যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। প্রতিটি মহান প্রতিষ্ঠানেরই একটি কৌশল থাকে যা দিয়ে সে বিশ্বকে পরিবর্তন করতে চায়। যখনই আপনি আপনার গোপন কৌশলটি অন্য কারও সাথে বিনিময় করলেন তখনই সেই শ্রোতা অন্যের কাছে এই কৌশলটি প্রকাশ করা আরম্ভ করবে।

জে.আর.আর. টলকিন হচ্ছেন একাধারে একজন কবি, লেখক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তার রচিত বিখ্যাত উপন্যাস *দ্য লর্ড অব দ্য রিংস* এ তিনি বলেছেন :

'পথ চলছে তো চলছেই, একদম যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখান থেকে যে একবার চলার নাম নিয়েছে, আর থামার কোন নাম গন্ধ নেই।'

আমাদের জীবনও ঠিক এমন এক দীর্ঘ যাত্রাপথ। যদিও পথ দিয়ে যেতে যেতে আমরা অন্য পথযাত্রীদের পদচিহ্ন দেখি। কিন্তু তা যেন শেষ হবার নয়। কিন্তু উপন্যাসের পরবর্তী অনুচ্ছেদে টলকিন বলেন :

'যেতে যেতে হঠাৎ যেন একটি মোড় দেখতে পেলাম। মনে হচ্ছে একটি নতুন পথ বা কোনো ধরনের সুড়ঙ্গ পথ। যদি আমরা সেই পথে আজকে

পা বাড়াই তবে আমরা হয়তো আজকে যেখানে আছি সেখানে নাও থাকতে পারি। হে পথযাত্রী এগিয়ে যাও! সুড়ঙ্গ পথে পা বাড়াও! হয়তো এই পথই নিয়ে যাবে চাঁদ বা সূর্যের দিকে।'

তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন, পথের যে শেষ নেই তাও নয়। কেবল সুড়ঙ্গ পথ খুঁজে নিতে হবে এবং সেই পথেই পা বাড়ান।

Audilua.com

নয়

মূলভিত্তি

প্রতিটি মহান প্রতিষ্ঠানই অনন্য। মানে প্রত্যেক কোম্পানিই তাদের নিজস্ব বুদ্ধি, বিবেচনা ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এক ও অভিন্ন। একে অপরের সাথে কোন মিল নেই। আর মিল থাকলেও কোনো না কোনো দিক থেকে একটি অপরটি থেকে ভিন্ন। কিন্তু কিছু মূলভিত্তি থাকে যা প্রত্যেক কোম্পানিকেই একদম শুরু থেকে মেনে চলতে হয়। আমি এই ব্যাপারে এত বেশি জোর দিয়েছি যে, আমার বন্ধুরা মজা করে এই ব্যাপারটিকে 'থিয়েলের সূত্র' বলে ডাকা শুরু করেছে। সূত্রটি হচ্ছে—একটি উদ্যোগের মূলভিত্তিতে যদি গোলমাল থাকে তবে এটাকে আর কোনোদিন ঠিক করা সম্ভব হয় না।

যেকোনো উদ্যোগের আরম্ভের দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরপর ভবিষ্যতে যা আসে তা কেবল গুণগত দিক থেকে ভিন্ন। ১৩৮০ কোটি বছর পূর্বে একটি মহাসংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। সেই সংঘর্ষে আমাদের এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি। এটা তার জন্মলগ্ন থেকেই এগিয়ে চলছে। তখনকার সময় পদার্থের যে অবস্থা ছিল তার পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে আজকের অবস্থানে এসেছে।

এটাও সত্য যে, মাত্র ২২৭ বছর আগে আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠাকালে আমাদের দেশের মৌলিক প্রশ্নগুলোতে কৃষকরা পর্যন্ত অংশ নিতে পেরেছে। তারা যে কয়েক মাস একত্রে ছিল তখন মূল প্রশ্ন ছিল—একটি সাংবিধানিক সভাকক্ষকে কতটা ক্ষমতা দেওয়া যায়? কেন্দ্রীয় সংসদের কতটা ক্ষমতা থাকা উচিত? সংসদের জনপ্রতিনিধিদের কীভাবে নিয়োগ দেওয়া হবে? (খেয়াল করে দেখুন এখানে জনগণের প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি বলা হয়েছে; নাকি দলপ্রতিনিধি।) আজকের সংবিধান সম্পর্কে আপনার মতামত যাই থাকুক না কেন সেইদিন

ফিলাডেলফিয়াতে যে নীতিগুলো নিয়ে সকলে একমত হয়েছিল তা আজও বিদ্যমান। আমাদের সংবিধান ১৭৯১ সালের অধিকার আইন পাশ করার পর মাত্র ১৭ বার সংশোধন হয়েছে। (১৭৯১ সালকে উল্টে দিলে হয় ১৯৭১। যাইহোক বাংলাদেশেরও ভাগ্য ভালো যে, মাত্র ১৬ বার সংবিধান সংশোধন হয়েছে।) এমনকি ক্যালিফোর্নিয়ার জনপ্রতিনিধির যে অধিকার, আলাস্কার জনপ্রতিনিধিরও সেই একই অধিকার। যদিও জনসংখ্যার দিক দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া আলাস্কার ৫০ গুণ বড়। কিন্তু যতদিন আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুক্ত আছি ততদিন আমরা এটাতেই আটকে থাকবো।

এখন, কোম্পানির কথায় আসি। এইদিক থেকে যেকোনো কোম্পানিও কিন্তু একটি দেশের মতো। প্রথমেই যদি আপনি ভুল সিদ্ধান্ত নেন—যদি আপনি ভুল লোকজনের সাথে অংশীদারিত্ব করেন বা ভুল লোক নিয়োগ দেন তাহলে সেটা পরবর্তীতে ঠিক করা মুশকিল হয়ে পড়ে। হয়তো ভুল ঠিক করার জন্য হাত দেওয়ার আগেই আপনি দেউলিয়া হয়ে গেছেন। এটা বলা মুশকিল। একজন প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে প্রথমেই ঠিকভাবে জিনিসগুলো সম্পাদনা করা, কারণ আপনি কখনোই একটি নড়বড়ে ভিত্তির ওপর কোনো বড় ও মহান কোম্পানি গড়ে তুলতে পারবেন না।

Audilua.com

কোম্পানির মূলভিত্তি যেন বিবাহ বন্ধন

যখন আপনি কোনো উদ্যোগ নিবেন তখন সবচেয়ে মারাত্মক একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং সেটা হচ্ছে আমি কাকে সাথে নিয়ে উদ্যোগটি নেবো। একজন সহ-প্রতিষ্ঠাতা বা অংশীদারকে নিয়ে উদ্যোগ নেওয়া মানে বিয়ে করার মতো একটি ব্যাপার। যদি ভালো হয় তবে যেন স্বর্গসুখ। আর যদি মন্দ হয় তবে এতটাই বাজে অবস্থা যে, তালাক নেওয়ার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিটি সম্পর্কের শুরুতেই একটি আশাবাদী মনোভাব থাকে। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার রোমাঞ্চিত ভালোবাসা নিয়ে কেউ কোনো বেফাঁস প্রশ্ন তুলতে চায় না। কিন্তু যতই সময় গড়ায় ততই চিত্র ভিন্ন হতে থাকে। যদি প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে এক ধরনের রেষারেষি ভাব চলে আসে তবে জান যায় মূলত কোম্পানির। কথায় বলে : *পাটা পুতার ঘষাঘষি, মরিচের জান শেষ।*

এবার আমি আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় করছি। তখন ১৯৯৯ সাল। আমার এক বন্ধু লিউক নোসেক। সে পেপালের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। এখন ফাউন্ডারস ফান্ডেও আছে। তো সে একদিন এক অনুষ্ঠানে এক ব্যক্তির সাথে পরিচিত হয়। ঐ ব্যক্তি এমবিএ করা ভদ্রলোক। এটা পেপাল প্রতিষ্ঠারও এক বছর আগের ঘটনা। লিউকের সেটাই ছিল প্রথম উদ্যোগ। সেখানে আমিও বিনিয়োগ করেছিলাম। তাই ছিল আমার প্রথম বিনিয়োগ। লিউক সেই লোকের সাথে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলো। যদিও সে লোকটিকে ভালোভাবে জানার প্রয়োজন বোধ করেনি। ফলে কোম্পানি শুরুই হয় দুইজন ভিন্ন চরিত্রের প্রতিষ্ঠাতা নিয়ে। আমাদের দুইজনের কেউই এটা ধরতে পারিনি। লিউক একজন মেধাবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি। আর তার সহ-প্রতিষ্ঠাতা একজন এমবিএ ডিগ্রিধারী যে ৯০ দশকের বুদবুদ অবস্থাটি ঠিক ধরতে পারেনি। সে কেবল বুঝতে পেরেছে যে, এখনই ডটকম নামে কিছু চালু করে নাম ও যশ আয় করে নিতে হবে। তারা এক উদ্যোক্তা মিলনমেলায় পরিচিত হয় এবং সেখান থেকেই একটি কোম্পানি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। এটা অনেকটা স্লট মেশিনে জুয়া খেলার মতো। হলে ছক্কা; নহলে অক্কা। সাধারণত যা হয়। উদ্যোগটি ব্যর্থ হলো এবং আমি আমার টাকা হারালাম।

সেই ব্যর্থতা থেকে আমি শিক্ষা নিলাম। এখন আমি যদি কোনো উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে যাই, তবে আমি প্রথমেই প্রতিষ্ঠাতা দলটিকে ভালো করে দেখে নেই। প্রযুক্তিগত জ্ঞান আছে কিনা, অথবা প্রয়োজনীয় দক্ষতা আছে কিনা, এগুলো তো সাধারণ জিনিস। কিন্তু তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রতিষ্ঠাতা দলের সদস্যরা একে অপরকে কতটা ভালোভাবে জানে এবং তারা একে অপরের সাথে কাজ করতে কতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তাদের উচিত তারা একে অপরকে ভালোভাবে জানা, একে অপরের পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে জানা ও বোঝা। এতে করে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক দৃঢ় হবে। নাহলে উদ্যোগ নেওয়াটা একটি হাওয়ায় ভেলা ভাসানোর মতো কাণ্ড হবে।

কেবল যে প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে মিলে চলতে হবে তা নয়, কোম্পানিতে আর শত শত লোক থাকবে। আপনার কোম্পানির প্রতিটি লোককেই একে অপরের সাথে মিলে চলতে হবে। বিশেষজ্ঞের মতো কেউ হয়তো বলে বসবে এই সব সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে একচ্ছত্র মালিকানা। সিগমন্ড ফ্রয়েড, কাল জাং সহ অনেক মনোবিজ্ঞানীই এটা আবিষ্কার করেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজ সত্তার বিরোধিতা করে। কিন্তু ব্যবসায় জিনিসটি ভিন্ন। অন্ততপক্ষে ব্যবসায় যদি আপনি কেবল নিজের জন্য কাজ করেন তবে ব্যাপারটি কেবল একটি সীমিত পর্যায়েই থেকে যায়। এতে করে আপনি যে বড় ধরনের কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, আবারো বলছি, যে বড় ধরনের কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন তা বাস্তবে করে দেখাতে পারবেন না। এটা আপনার সক্ষমতাকে সীমিত করবে। সত্যি বলতে, একটি দল ছাড়া *শিকড় থেকে শিখরে* যাওয়াটা কঠিন বা যদি বলি একটি দলগত প্রচেষ্টা ছাড়া *০ থেকে ১* এ যাওয়াটা সত্যিই কষ্টকর।

সিলিকন ভ্যালির কোনো বিশেষজ্ঞ হয়তো বলবে তুমি যদি ঠিক লোকজনকে নিয়োগ দিতে পারো তবে তুমি তোমার ব্যবসায় বেশ ভালো করবে। কোনো ধরনের কাঠামোগত বা পদ্ধতিগত পদবিন্যাস ছাড়াই ব্যবসায় উন্নতি করবে। লাভজনক অংশ থাকলে এবং লোকজন যদি তাদের কাজের প্রতি ও কোম্পানির প্রতি নিষ্ঠাবান হয় তবে কোনো ধরনের বাঁধাধরা নিয়ম-কানুনের দরকার নেই। এটাও সত্য যে, 'মানুষ যদি ফেরেশতা হতো তবে তো কোনো সরকারই দরকার হতো না।' কিন্তু মানুষ কি ফেরেশতা? আমার মনে হয় এর উত্তর আমরা সবাই মোটামুটি জানি। ঠিক এই ব্যাপারটিই ব্যর্থ কোম্পানিগুলো দেখতে পায় না। ঠিক এজন্যই কোম্পানিতে ব্যবস্থাপক ও পরিচালদের জন্য আলাদা আলাদা নিয়ম-কানুন থাকে। যাতে তারা একে অপরের ওপর চোখ রাখতে পারে। প্রতিষ্ঠাতা ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যকার অবস্থাও ঠিক একই রকম। এটা যেমন সত্য যে আপনাকে অবশ্যই ভালো লোকজন চয়ন করতে হবে, তার সাথে সাথে এটাও সত্য আপনাকে একটি পদ্ধতিগত বা কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থার মাধ্যমে সকলকে একই ছাতার নিচে আনতে হবে। যদিও সবাই একই ছাদের নিচে কাজ করবে তবুও কেউ কারও পথে পা মাড়াবে না। আমি বলতে চাচ্ছি কাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের দায়িত্ব ভিন্ন ও নির্দিষ্ট হবে যাতে করে সকলেই তার

নিজ নিজ কাজটি স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে করে যেতে পারে।

কোম্পানির এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাস দরকার। আর এই রকম দায়িত্বের বিন্যাস না হলে সমস্যা ঘটে। চলুন দেখে নেই এমন তিনটি তত্ত্ব যাতে করে আমরা এমন ধরনের বিশৃঙ্খলা ও ব্যর্থতা এড়াতে পারি :

- মালিকানা : একটি কোম্পানির আইনগত মালিক কে?
- পদবি : প্রতিদিনের কাজকর্ম চালানোর জন্য কোম্পানিতে কে থাকবে?
- নিয়ন্ত্রণ : কাগজপত্রের দিক থেকে, একদম আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানির কাজকর্মে কে স্বাক্ষর করবে বা কে কোম্পানির কাজকর্ম নির্ণয় করবে?

সাধারণত একটি উদ্যোগের প্রাথমিক মালিকানাটি কেবল প্রতিষ্ঠাতা, কর্মচারী ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ভাগ করা থাকে। ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীদের মধ্যে পদবির যে দায়িত্ব আছে এবং সেই দায়িত্ব সংলগ্ন যে অধিকার আছে তা তারা ভোগ করে। আর পরিচালক হয় সাধারণত প্রতিষ্ঠাতা বা বিনিয়োগকারীরা, যারা মূলত কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করে।

(একটি উদাহরণ দিই, আমার এক বন্ধু আছে যে তার বাবার প্রকাশনীতে বসে। তার পদবি হচ্ছে সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তার বাবা, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পরেই তার দায়িত্ব। কিন্তু সে যদি নতুন কোন উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে চায় তবে তাকে তার বাবার অনুমতি নিতে হয়। এখানে তার বাবা হচ্ছে নিয়ন্ত্রক এবং সে হচ্ছে পদবিপ্রাপ্ত দায়িত্ব পালনকারী। তার অধিকার আছে তবে নিয়ন্ত্রণ নেই।)

উল্লিখিত তালিকাটি তত্ত্বগতভাবে ঠিক আছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা আসে, মালিকানার পালাবদল হয়, পদবির রদবদল ঘটে এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়েও ঝামেলা হয়। আবার অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটলে মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দেয় এবং নতুন নতুন বিনিয়োগকারী আকৃষ্ট হয়। অধিকারের ব্যাপারটি যদি সমভাবে কর্মচারী ও প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে বণ্টন হয় তাহলে কাজ সম্পন্ন ও সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। উপর থেকে বোর্ডের সদস্যরা নজর রাখবে এবং আরও বড় ও বৃহৎ পরিকল্পনার মাধ্যমে কোম্পানিকে

এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু এতে করে আবার সমস্যাও তৈরি হতে পারে। কারণ আপনি পাঁচতলা থেকে ঢাকা শহরকে যেরকম দেখবেন, নিঃসন্দেহে সাঁইত্রিশতলা থেকে ভিন্নভাবেই দেখবেন।

অধিকার ও পদবিন্যাসের দায়িত্ব ও ক্ষমতার অসমতা হলে কী হয় তা যদি দেখতে চান তবে ডিএমভি বা যানবাহন অধিদপ্তরে ঘুরে আসুন। (আর বাংলাদেশের জনগণ বিআরটিএ থেকে ঘুরে আসতে পারেন।) ধরুন আপনি একটি নুতন গাড়ি কিনেছেন। এখন নিজেই গাড়ি চালাতে আগ্রহী। তাই নিজের জন্য একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স করাবেন। তত্ত্বগতভাবে এটা সহজে পাওয়ার কথা। যেহেতু যানবাহন অধিদপ্তর হচ্ছে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আমরা একটি গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি। সকল ক্ষমতা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। আর আপনি যদি এখানকার একজন নাগরিক হন তবে আপনি নিজেও সেই যানবাহন অধিদপ্তরের মালিকানার একটি অংশ এবং আপনার নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই তা নিয়ন্ত্রণ করে। তাহলে আপনাকে কেবল সেখানে হেঁটে যেতে হবে এবং আপনার যা দরকার তা আপনার হাতে চলে আসবে।

আসলে কী তাই! না তা নয়। বাস্তবে ব্যাপারটি এভাবে কাজ করে না। আমরা হয়তো যানবাহন অধিদপ্তরের খরচ বহন করি, কিন্তু মালিকানার ব্যাপারটি পুরোপুরিই কাল্পনিক একটি ব্যাপার। আপনি অফিসে গেলে দেখতে পাবেন যে, কিছু ক্ষুদ্রমনা চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা অফিসটি চালাচ্ছে। দেখবেন তারাই মূলত তাদের দায়িত্বের অপব্যবহার করছে। এমনকি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাও সেখানে কোন তোয়াক্কা পায় না। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার কারণে কেউ কারও কাছে দায়বদ্ধ নয়। আপনি হয়তো রাজনৈতিক দর্শন তুলে ধরতে পারেন, তাদেরকে তাদের নৈতিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু এতে করে আপনি যে ভালো সেবা পাবেন তা বলা যায় না।

এর বিপরীতে আমরা যদি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে দেখি, বড় বড় সব প্রতিষ্ঠান বেশ শৃঙ্খলার সাথেই চলছে। বিশেষ করে মালিকানা ও পদবি ভিত্তিক অধিকারের দিক থেকে এইসব কর্পোরেশনগুলো বেশ ভালোভাবেই চলছে। বিশাল বিশাল কোম্পানি যেমন জেনারেল মটরসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার উদাহরণ যদি টানি তো দেখবো যে, সে মোট কোম্পানির একটি ছোট্ট

অংশের শেয়ারের অধিকারী। সেজন্যই সে কাজ করার ক্ষেত্রে একটি অধিকারবোধ থেকে কাজ করে এবং সেই অধিকারবোধকে উপভোগ করে। কিন্তু তারমানে এই নয় সে কোম্পানির মালিক। তার কাজকর্মের সফলতার কারণে তাকে বেশি বেশি বেতন দেওয়া হয়। এমনকি কোম্পানি থেকে তাদের জন্য নিজস্ব বিমান ব্যবস্থাও বিদ্যমান। এখন অধিকারের সমতা যদি সৃষ্টি না হয় তবে এতো সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তার থেকে ভালো কাজকর্ম পাওয়া যাবে না। আবার কোম্পানি থেকে প্রতি তিনমাসে যে বোনাস দেওয়া হয় এতে করে সে কম খরচে অধিক মুনাফা করার প্রতি বেশি ঝোঁকে। নুতন কিছুতে বিনিয়োগের বদলে সে কোম্পানির খরচ কমানোর প্রতি বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। নতুন কিছুতে বিনিয়োগ করলে ভবিষ্যতে পুরো কোম্পানির জন্য এবং শেয়ার মালিকদের জন্য উপকারী হতো। কিন্তু তার চিন্তা কেবল ত্রৈমাসিক বোনাসের দিকে আটকে গেলে দীর্ঘমেয়াদি কিছু করাটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আজকের প্রতিটি বিশাল বিশাল কোম্পানি একদিন যখন শুরুতে উদ্যোক্তাদের নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল তখন উদ্যোক্তারা নিজেরাই মালিক ছিল এবং নিজেরাই সবকিছুর অধিকারী ছিল। তারপর কোম্পানির বৃদ্ধির সাথে সাথে দায়িত্ব ও ক্ষমতার বণ্টন ঘটে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিনিয়োগকারীরা চেষ্টা করে যত দ্রুত সম্ভব কোম্পানিকে শেয়ার মার্কেটে ছেড়ে দিয়ে মুনাফা অর্জন করতে। আর প্রতিষ্ঠাতারা বেসরকারি হিসেবেই থাকতে চায় এবং এভাবেই নিজেদের অগ্রগতি চায়।

এবার আসি কোম্পানির বোর্ড নিয়ে। বোর্ডরুমে লোক যত কম হয় ততই ভালো। একটি বোর্ড যত ছোট হবে ততই একে অপরের সাথে যোগাযোগ করাটা সহজ হবে। এতে করে কাজকর্মেও দ্রুততা আসবে। তাছাড়া, ব্যবস্থাপনায় কোন সমস্যা হলে একটি ছোট্ট বোর্ডের সদস্যরা দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারে। এজন্যই কোম্পানির বোর্ডের সদস্য খুবই সতর্কতার সাথে চয়ন করতে হয়। একজন সদস্যও যদি নেতিবাচক হয় তবে তা পুরো কোম্পানির মাথা ব্যথা হয়ে থাকবে।

সাধারণত তিন সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম। আপনার কোম্পানির বোর্ডের সদস্য যেন পাঁচের বেশি অতিক্রম না করে। যদিও সরকারি নির্দেশনা মতে শেয়ার বাজারে প্রবেশ করলে বোর্ড যত বড় হবে ততই ভালো বলে

নির্দেশনা দেওয়া আছে। এক্ষেত্রে সাধারণত বোর্ড সদস্য কমপক্ষে নয়জন। আর এরচেয়ে বড় বড় বোর্ড আসলে কোম্পানির জন্য মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। হয়তো কোনো অবুঝ লোক বোর্ডে অনেক বেশি সদস্য দেখে বলবে, 'দেখ, এই কোম্পানির বোর্ডে কত নামকরা সব লোক আছে।' কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে বেশি সদস্য বিশিষ্ট বোর্ডগুলো তাদের অতিরিক্ত সদস্যদের কারণেই ব্যর্থ হয়েছে। যদি আপনি ব্যর্থ হতে চান তবে বেশি সদস্য নিয়ে বোর্ড গঠন করতে পারেন। আর যদি আপনি একটি কার্যকর বোর্ড চান তবে এটাকে যতটা সম্ভব ছোট রাখুন।

নৌকায় ওঠাবেন না নামাবেন

সাধারণত আপনার কোম্পানির সাথে যারাই যুক্ত হবে তাদের সকলের উচিত ফুল-টাইম কাজ করা। মানে আপনি তাদেরকে ফুল-টাইম নিয়োগ দিবেন। হয়তো মাঝে মাঝে এই নিয়ম ভাঙতে হবে। যেমন : বাইরে থেকে কোনো আইনজীবী নিয়োগ দিলেন বা কোনো অডিট ফার্মের সহায়তা নিলেন। তা ভিন্ন কথা। কিন্তু একথা সবসময় স্মরণ রাখবেন যে, আপনার কোম্পানিতে যারাই বাইরে থেকে কাজ করতে আসবে বা পার্ট-টাইম কাজ করবে তারাই সবচেয়ে বেশি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। তারা কেবল ক্ষণস্থায়ী মুনাফা দাবি করে। তারা ভবিষ্যতের জন্য উপকারী কোনো সেবা সম্পন্ন করবে না। এজন্যই বাইরে থেকে পরামর্শক নিয়োগ দিয়ে কোনো লাভ হয় না। আর পার্ট-টাইমের লোকজন কোনো কাজ করে না। (কাজ বলতে এখানে ভবিষ্যতের জন্য উপকারী কোনো কাজকে বোঝানো হয়েছে।) এমনকি বাইরে থেকে, দূরে থেকে বা বাসায় বসেও কাজ করা উচিত নয়। এতে করে কর্মীদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই যতটা সম্ভব কাছে থেকে একত্রে কাজ করুন। আর আপনি যদি কাউকে বোর্ডে নিতেই চান তবে আপনার সিদ্ধান্ত হবে—হ্যাঁ বা না। সোজাসুজি—হ্যাঁ বা না। নিলে নিবেন; নাহয় বাদ দিবেন। মার্কিন ঔপন্যাসিক কেন কেসি ঠিকই বলেছেন, 'হয় আপনি নৌকায় ওঠাবেন, নাহয় নামাবেন।'

টাকায় সব হয়, এই চিন্তা কি ঠিক?

আপনি যদি চান যে, আপনার কর্মচারীরা আপনার কোম্পানির জন্য সর্বোচ্চ কাজ করুক, সর্বাত্মক সেবা দিক তবে তাদেরকে যথাযথভাবে প্রতিদান দিতে

হবে। আমাকে যখনই কোনো উদ্যোক্তা তার কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে বলে আমি তখনই তাকে জিজ্ঞেস করি সে নিজে বছরে কত টাকা বেতন নিতে চায়। দেখা গেছে একটি কোম্পানির সিইও যদি কম বেতন নেয় তবে সেই কোম্পানি ভালো চলে। এটা আমি শত শত উদ্যোগে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে পেয়েছি। সাধারণত একটি উদ্যোগ বা কোম্পানির প্রাথমিক পর্যায়ে একজন সিইওকে বছরে ৮,৫০,০০০ টাকার বেশি নেওয়া উচিত নয়। মাসে প্রায় ৮৭০,০০০ করে পড়ে। সে যদি অন্য কোম্পানি থেকে এর বেশি আয় করেও থাকে তবুও একটি নতুন কোম্পানিতে এর বেশি বেতন প্রস্তাব দেওয়া ঠিক নয়। যদি একজন সিইও বছরে ১৭,০০,০০০ টাকার ওপরে বেতনই নেয় তবে সে আসলে প্রতিষ্ঠাতার বদলে রাজনৈতিক নেতার মতো আচরণ করবে। বড় অংকের একটি আয় পেলে সে আভিজাত্যের সমস্যায় ভুগবে, অহংকারী হয়ে উঠবে। যেখানে কর্মচারীদের সাথে মিলে যেকোনো সমস্যা দ্রুত সমাধান করার কথা সেখানে সে কর্মচারীদের সাথে মিশতে চাইবে না। অথচ কম বেতনের একজন সিইও বা ব্যবস্থাপক পুরো কোম্পানির অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করে যাবে।

সিইও-এর বেতন কম মানে এই নয় যে, অদক্ষ লোককে কম বেতন দিয়ে রাখবেন। কম বেতন মানে তুলনামূলক ভাবে কম। বেতন সীমা বাৎসরিক ৮৮,৫০,০০০ থেকে ১০,০০,০০০ টাকার মধ্যে। কম বেতনের সিইও কোম্পানির অন্য সকলের মধ্যে একটি মানদণ্ড সৃষ্টি করে। এবার একজন সিইও-এর কথা বলি। বকস কোম্পানির সিইও অ্যারোন লেভি এই ব্যাপারে সবসময়ই সতর্ক ছিলেন। তিনি কোম্পানি প্রতিষ্ঠার চার বছর পরেও কোম্পানি থেকে একটু দূরেই একটি দুই কক্ষের বাসায় থাকতেন। কোম্পানি প্রতিষ্ঠা হয় ২০০৫ সালে। জানানোর জন্য বলছি যে, চার বছর পরে তার কোম্পানির মূল্য ছিল ১০০ কোটি টাকা। তারপরেও তিনি একটি দুই কক্ষের বাসাতেই থাকতেন। প্রতিটি কর্মচারী দেখলো লেভি তার কোম্পানির উদ্দেশ্যগুলোর প্রতি নিবেদিত প্রাণ। তাই তারাও তার সমকক্ষ হতে চেষ্টা করলো। যদি একজন সিইও বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা *কম বেতন* নিয়ে কোম্পানিতে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে না পারে তবে সে *উচ্চ বেতন* নিয়ে কোম্পানিতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। এতে করে কোম্পানিতে উচ্চ বেতনের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। বেতনের অংকটি যতটা ভদ্র ও সমুচিত রাখা যায় ততই ভালো।

যদিও নগদ অর্থ সবসময়ই ভালো। যত বেশি হয় ততই ভালো। কিন্তু অবস্থা ও পরিবেশ ভেদে এর তারতম্য রয়েছে। নগদ অর্থ এক ধরনের সুযোগের দুয়ার খুলে দেয়। একবার আপনি যখন হাতে নগদ অর্থ পান তখন আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। বেতন হিসেবে টাকার পরিমাণ যখন বেশি হয় তখন কর্মচারীরা দেখে যে, কোম্পানির জন্য অতিরিক্ত শ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে যা করার কথা, যা ভবিষ্যতে কোম্পানির জন্য মুনাফাজনক হবে তা ইতোমধ্যেই কোম্পানিতে আছে। কোম্পানি বেশি বেতন তো এজন্যই দিচ্ছে। বেশি বেতন দেওয়ার চেয়ে নগদ কিছু বোনাস দেওয়া গেলে আরেকটু ভালো হয়। (আমি একটি ই-কমার্স কোম্পানি সম্পর্কে জানি যারা প্রতি মাসে কর্মচারীরা যদি ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছায় তবে ৩০০ টাকার একটি বোনাস কুপন দেয় যা দিয়ে উক্ত কর্মচারী সেই ওয়েবসাইট থেকেই জিনিসপত্র কিনতে পারে।) আর তাছাড়া এ ধরনের বোনাস যেহেতু কাজের পুরস্কার স্বরূপ সেহেতু এই ধরনের প্রণোদনা মানুষকে কাজ করতে আরও উৎসাহী করে তোলে। পয়সার ওপর পিঠও আছে। যেকোনো ধরনের নগদ প্রণোদনা কখনো কর্মচারীকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবায় না, ভাবায় কেবল বর্তমান সম্পর্কে।

Audilua.com

অন্যান্য সুবিধা

নতুন নতুন উদ্যোগে উদ্যোক্তাদের বড় সুবিধা হচ্ছে তারা উচ্চ বেতন দেওয়ার চেয়েও আরও ভালো কিছু দিতে পারে। তা হচ্ছে কোম্পানির শেয়ার। কোম্পানির শেয়ার ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে তারা একে অপরকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সহায়তা করতে পারে যা ভবিষ্যতে তাদের সকলকে লাভবান করবে।

এর আরেকটি ভালো দিক হচ্ছে কোম্পানির শেয়ার ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে সবার মধ্যে এক ধরনের অঙ্গীকার বোধ সৃষ্টি হয়, নাকি সংঘর্ষের। তবে এই ব্যাপারেও আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রত্যেককে সমান শেয়ার দেওয়াটা এক ধরনের বোকামি। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মেধা ও দায়িত্ব রয়েছে। আবার সেই দায়িত্ব পালনে তাদের সক্ষমতারও তারতম্য রয়েছে। তাই প্রত্যেককে সমানভাবে দেখা এবং সমান শেয়ার দিয়ে শুরু করা উচিৎ নয়। আবার বিভিন্ন জন থেকে বিভিন্ন পরিমাণের অর্থ নেওয়াও যথাযথ নয়। আবার এই প্রাথমিক অবস্থায়, মানে কোম্পানি শুরুর দিকে যদি একে অপরের মধ্যে

বিরক্তিভাব চলে আসে তবে তাও কোম্পানির জন্য মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারে। অবশ্য এমন কোনো আদর্শ পদ্ধতি বা ব্যবস্থা নেই যে এটা এড়ানো যেতে পারে। তবে যতটা সম্ভব একই মানসিকতার সঙ্গী চয়ন করা যেতে পারে।

সমস্যা আরও বড় হয়ে ওঠে যখন কোম্পানিতে আরও বেশি বেশি লোক যুক্ত হতে থাকে। প্রথম দিকে যারা থাকে তারা হয়তো বেশি ঝুঁকি নিয়েছে, তাই তারা বেশি শেয়ারের মালিক। কিন্তু একটি উদ্যোগের জন্য পরবর্তীতে যুক্ত হওয়া লোকজনের গুরুত্বও কিন্তু কম নয়; বরং একটু বেশিই বলা চলে। একটি উদাহরণ দিই। ২০০৫ সালে ফেসবুকের অফিসের দেওয়ালে রঙ করে একজন চিত্রকর যে শেয়ার পেয়েছে বর্তমানে তার দাম দাঁড়িয়েছে ১৬ কোটি টাকা। আর ২০১০ সালে একজন মেধাবী প্রকৌশলীও যদি ফেসবুকে যোগ দিত তবে সে পেত ১৬ লাখ টাকার শেয়ার। ইবেতেও একই রকম ঘটনা ঘটেছে। যারা ১৯৯৯ সালে ইবেতে যোগ দিয়েছে তারা যদি ১৯৯৬ সালে যোগদান করতো তবে ২০০ গুণ বেশি মুনাফা করতো। যেহেতু সাফল্য ঘটার পরে ব্যাপারটি বোঝা যায় তাই এটা অনুমান করা কঠিন। যাইহোক কাকে কতটা শেয়ার দিতে হবে এবং কতটা শেয়ার দিলে কোম্পানি লাভজনক ভাবে এগিয়ে যাবে এটা একটি রহস্যময় বিষয়। এজন্যই মালিক, উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারীরা এসব ব্যাপারে গোপনীয়তা বজায় রাখে। একটি কোম্পানির সবাইকে যদি জানানো হয় কে কতটা শেয়ারের মালিক তবে তা বোমার মতো বিস্ফরিত হবে এবং সেই কোম্পানিটিই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অনেকে আবার কোনো ধরনের শেয়ারই চায় না। আমরা পেপালে একবার এক পরামর্শক নিয়োগ দিয়েছিলাম। তিনি কোম্পানির শেয়ারের প্রতি ততটা আগ্রহী নয়। তার আগ্রহ হচ্ছে প্রতিদিন ৫,০০০ টাকা এবং এর পরিবর্তে তিনি আমাদের ব্যবসায়িক অগ্রগতিতে সহায়তা করবে। অনেকেই কোম্পানির শেয়ার নেওয়ার ক্ষেত্রে ততটা আগ্রহী নয়। কারণ কোম্পানি যদি উন্নতি করে, সাফল্য অর্জন করে তবেই না সেই শেয়ারের মূল্য আছে; নতুবা শেয়ার নিয়ে কাজ করা, শ্রম দেওয়াটাও বৃথা।

তবে কোম্পানির শেয়ার দেওয়ার মধ্যেও এক ধরনের কৌশলগত কারণ আছে। এটা নগদের চেয়ে এজন্য ভালো যে, এতে করে একজন ব্যক্তি সরাসরি কোম্পানির ভালো-মন্দের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। দীর্ঘমেয়াদি কাজে সে পুরোপুরি

নিজের মনোযোগ দিতে পারে। যদিও কোম্পানির শেয়ার দিলেই যে লোকজন ভালো করবে তা নয়। তবে একজন উদ্যোক্তার জন্য এটা ভালো। কারণ এতে করে সে সকলকে বিভিন্ন নির্দিষ্ট জায়গায় কাজ করার সুযোগ করে দেয়।

এবার বিনিয়োগ বাড়ানোর পালা

'যে জীবনকে উপভোগ করে না সে মৃত্যু নিয়ে ব্যস্ত।' কথাটি আমি বলিনি। বলেছেন বব ডিলান। আমি যদি এটাকে সত্য ধরে নিই তবে এটাও সত্য যে, জন্ম নিলেই কেউ বড় হয়ে যায় না—বৃদ্ধির জন্য তাকে প্রতিনিয়ত শিখতে হয়, অনন্তপক্ষে মানসিক দিক দিয়ে একথা সত্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনার প্রতিষ্ঠান কি মানুষকে ভবিষ্যতে মূল্য রাখে এমন কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করছে?

মানুষের চরিত্রের সাথে কোম্পানির একটি মিল আছে। সেটি হচ্ছে কোম্পানি যেমন নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে এগিয়ে যায়, তেমনি মানুষও নতুন নতুন শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তা কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায়। একটি কোম্পানির জন্য সবচেয়ে উত্তম দিক হচ্ছে যেকোনো উদ্ভাবনমূলক জিনিসকে সাধুবাদ জানানো। এরপর দ্বিতীয় যে জিনিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে একটি কোম্পানি ততক্ষণই বেঁচে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করছে। আর যখন এটা নতুন জিনিস উদ্ভাবন করা বন্ধ করে দিবে তখন কোম্পানি শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়বে। তাই নিত্যনতুন কিছু উদ্ভাবনের প্রতি মনোযোগ দিন। আপনি যদি কোনো উদ্যোগ নিতে আগ্রহী হন তবে সেই উদ্যোগটি *ভবিষ্যতে* জনগণের জন্য কী উপকারী সেবা সম্পন্ন করবে তা নিয়ে চিন্তা করুন। আপনার সাফল্যই নির্ভর করে এই চিন্তার ওপর।

দশ

মাফিয়াদের কলাকৌশল

একটি কল্পনা চিত্র দিয়ে আরম্ভ করি। *একটি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?* কর্মচারীরা তাদের কাজকে ভালোবাসবে। তারা তাদের দফতরে যাওয়াকে আনন্দের সাথে উপভোগ করবে, কাজকর্মে কোনো বিরক্তিভাব থাকবে না। সময়ের কোনো হিসাব থাকবে না। কাজের জায়গাটি থাকবে খোলামেলা, নয়তো ছোট্ট খোপ খোপ ঘরে আবদ্ধ। রঙ বেরঙের চেয়ার ও টেবিল থাকবে। শরীর ম্যাসাজ করার জন্য ফ্রি লোক থাকবে, ভালো রাঁধুনি থাকবে। হয়তো যোগব্যায়াম করার জায়গাও থাকবে। অফিসে পোষা প্রাণী আনার অনুমতি থাকবে। স্বচ্ছ ট্যাংকে রঙ বেরঙের মাছ থাকবে। কেমন?

কী মনে হয়? কোনো সমস্যা দেখছেন কি? ঠিক এই ধরনের অদ্ভুত কিছু অফিস আছে সিলিকন ভ্যালিতে। আজকাল ফেসবুক, অ্যাপল, গুগলসহ অন্যান্য অনেক প্রযুক্তিগত কোম্পানি তাদের কর্মচারীদের এমন সব সুবিধাদি দিয়ে থাকে। কিন্তু সুবিধাই তাদের সাফল্যের একমাত্র কারণ নয়। কারণ কোম্পানির সারবস্তু যদি না থাকে তবে কোনো সুবিধা দিয়েই লাভ হবে না। আপনি আপনার অফিসকে ভালো কোনো নকশাবিদকে দিয়ে আঁকিয়ে নিলেও কর্মচারীদের কাছ থেকে ভালো কিছু পাবেন না; যদি-না আপনার কর্মচারী নিয়োগ ঠিক হয়। আপনাকে প্রথমে কোম্পানির নীতি নির্ধারণ করতে হবে, আপনার কোম্পানির সুনাম সৃষ্টি করতে হবে এবং ঠিক লোক নিয়োগ দিতে হবে। '*কোম্পানির অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি*' কোম্পানি থেকে আলাদা নয়। কোনো কোম্পানিরই সাধারণ

কোনো সংস্কৃতি নেই। প্রতিটি কোম্পানিই একটি সংস্কৃতি। যেমন প্রতিটি পরিবারের পরিবেশ ও সংস্কৃতি ভিন্ন ও অনন্য, ঠিক তেমন কিছু। একটি উদ্যোক্তা দল একটি বৃহৎ কর্ম সম্পাদনে একত্রিত হয়, তারা মিশনে যেতে প্রস্তুত হয় এবং একটি ভালো সংস্কৃতি তাদেরকে ভিতর থেকে একত্রিত ও মজবুত রাখে।

সংস্কৃতি কী? মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, *'একটি দেশের সংস্কৃতি হচ্ছে যা দেশের জনগণের হৃদয়ে ও তাদের আত্মায় বাস করে।'* আর কোম্পানি সংস্কৃতির ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হবে এয়ারবিএনবি এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও ব্রিএন চেসকির বক্তব্যে, 'সংস্কৃতি হচ্ছে একটি গভীর আগ্রহ নিয়ে সকলে মিলে একটা কিছু করা।'

সংস্কৃতির সবচেয়ে উত্তম বর্ণনা দিয়েছেন মোতাহের হোসেন চৌধুরী। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত মোতাহের হোসের চৌধুরীর নির্বাচিত প্রবন্ধ বইয়ে বলেছেন, 'ধর্ম চায় মানুষকে পাপ থেকে, পতন থেকে রক্ষা করতে, মানুষকে বিকশিত করতে নয়। জীবনের গোলাপ ফোটানোর দিকে তার নজর নেই, চক্ষুটিকে নিষ্কণ্টক রাখাই তার উদ্দেশ্য। অপরপক্ষে সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের বিকাশ, পতন পাপ থেকে রক্ষা নয়। গোলাপের সঙ্গে যদি দু'-একটা কাঁটা এসেই যায় তো আসুক না, তাতে ক্ষতি নেই, দেখতে হবে শুধু ফুল ফুটল কি-না–এই-ই সংস্কৃতির অভিমত। মনুষ্যত্বের বিকাশই সবচেয়ে বড় কথা, চলার পথে যে স্খলন-পতন তা থেকে রক্ষা পাওয়াটাই বড় কথা নয়। বরং বড় জীবনের তাগিদে এসে এই স্খলন-পতনের মর্যাদাও বেড়ে যায় অনেকখানি।' (পৃষ্ঠা-১৭।)

পেশাগত গণ্ডির বাইরে

আমি যখন আমার প্রথম দল গঠন করি তখন সবাইকেই খুব সতর্কভাবে চয়ন করি। পরবর্তীতে এই দলকে সিলিকন ভ্যালিতে বলা হত 'পেপাল মাফিয়া'। এটার অন্যতম একটি কারণ ছিল যে, এই দলের সদস্য সকলেই সফল। তারা পরবর্তী সময় যে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে বা যে উদ্যোগেই বিনিয়োগ করেছে তাতেই সাফল্যের মুখ দেখেছে। আমরা ২০০২ সালে ই-বে এর কাছে পেপাল

১২,০০০ কোটি টাকায় বিক্রি করে দিই। তারপর থেকে আমাদের দলের সদস্যরা যে যেদিকে গেছে সেদিকেই সফল হয়েছে। ইলন মাস্ক প্রতিষ্ঠা করেছে স্পেসএক্স এবং সে টেসলা মটরসের (*SpaceX and Tesla*) সহ-প্রতিষ্ঠাতা। রিড হফম্যান লিঙ্কডইন (*LinkediIn*) এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা। স্টিভ চেন, চাদ হুরলি ও জাওয়েদ করিম একত্রে মিলে ইউটিউব (*YouTube*) প্রতিষ্ঠা করেছে। জেরেমি স্টপেলম্যান ও রুসেল রুশ একত্রে ইয়েল্প (*Yelp*) প্রতিষ্ঠা করেছে। (ইয়েল্প হচ্ছে একটি অনলাইন তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যা জনগণকে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, মোবাইল মেরামতকারীর দোকান, বাসা বদলানোর জন্য কোথায় লোক পাবেন, কোথায় ব্যায়ামাগার আছে, কোথায় জামা-কাপড় ধোয়ার জন্য দিবেন এমন নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় কাজের জন্য দরকারি তথ্য প্রদান করে।) দাভিদ ও. স্যাকস ইয়ামার (*Yammer*) এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং আমি পালানটির টেকনোলজিস (*Palantir Technologies*) এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা। (ইয়ামার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের সংযোগকারী একটি প্রতিষ্ঠান এবং পালানটির টেকনোলজিস হচ্ছে সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান।) আজকে এই সাতটি কোম্পানির একেকটির মূল্যই ৮,০০০ কোটি টাকার ওপর। যদিও তখনকার পেপ্যাল অফিসে আমরা আজকের অফিসগুলোর সুবিধাদির মতো এত সুযোগ সুবিধা দিতে পারিনি। কিন্তু সেই দলটি চমৎকারভাবে কাজ করেছিল। একত্রে তারা যেমন অসাধারণ ছিল, স্বতন্ত্রভাবেও তারা আলোকিত। আমাদের মধ্যকার বন্ধন ও কাজের সংস্কৃতি এতটাই মজবুত ও দৃঢ় ছিল যে, আমরা আমাদের প্রকৃত কোম্পানি পেপালকেও ছাড়িয়ে গেছি।

(আপনাকে একটি ছোট্ট ঘটনা বলি। আমেরিকান সরকার ও নীতিনির্ধারকরা আগে চিন্তা করতো পৃথিবীতে যন্ত্র পরিচালনা, বিশেষ করে গাড়ি চালাতে তেলের কোন বিকল্প নেই। তাই তারা আমেরিকায় তেলের বিশাল বিশাল খনি মজুত করে রেখেছিল যাতে আগামীতে সারাবিশ্বে যখন তেলের সংকট সৃষ্টি হবে তখন তারা সেই তেল উত্তোলন করে ব্যবহার করবে। কিন্তু টেসলা মটরস যখন ২০০৮ সালে বিদ্যুৎচালিত গাড়ি বাজারে ছাড়ে এবং তা সফলভাবেই রাস্তায় চলে তখন নীতিনির্ধারকদের টনক নড়ে। তারা তাদের খনি থেকে তেল উত্তোলন আরম্ভ করে এবং বাজারে ছাড়ে। হঠাৎ করে নতুন কোন উৎস থেকে অতিরিক্ত তেল বাজারে আসার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং

দাম কমে যায়। এভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামে ধস নামে।)

আবার অনুবাদে ফিরে আসি। পিটার থিয়েল বলেছেন পেপালের ১২,০০০ কোটি টাকা থেকে তার দলের প্রত্যেকে ২০০২ সালের পরে যখন নিজ নিজ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন তখন প্রত্যেকেই সফল হয়। আজকে উপরে উল্লিখিত ৭টি কোম্পানির একেকটির মূল্যই আছে ৮,০০০ কোটি টাকার উপরে। এটা কীভাবে হলো? সিলিকন ভ্যালির সকলেই থিয়েলের এই দলকে বলতো 'পেপাল মাফিয়া'। কীভাবে তারা এত সফল হলো? সেই কথাই থিয়েল বলছেন।

আমরা লোকজন নিয়োগের ক্ষেত্রে জীবনবৃত্তান্ত দেখে যে সবচেয়ে দক্ষ ও মেধাবী লোক নিয়োগ দিয়েছি তা নয়। আমি এই ধরনের প্রক্রিয়ার একটি মিশ্র চিত্র দেখেছি যখন আমি নিউ ইয়র্কের একটি ল চেম্বারে ছিলাম। আইনজীবীরা নানান ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মামলার সমাধান করছে এবং তাদের প্রত্যেকেই খুব ভালো ও দক্ষ আইনজীবী। কিন্তু সম্পর্কের কথা যদি বলি তবে বলতে হয় তাদের মধ্যকার সম্পর্ক খুবই হালকা। তারা সারাদিন একসাথে কাটায়, একত্রে কাজ করে কিন্তু অফিসের বাইরে তারা খুব একটা কথা বলে না। আমি কেন এমন এক দল লোকের সাথে কাজ করবো যারা একে অপরকে পছন্দও করে না? অনেকেই চিন্তা করে যে, টাকা আয় করার জন্য এটা দরকার। কিন্তু কেবল লেনদেনের ওপর ভিত্তি করে কাজের ক্ষেত্র চয়ন করাটা যুক্তিযুক্ত নয় বরং মারাত্মক। আমি এক জায়গায় কাজ করবো কিন্তু কারও সাথে মন খুলে কথা বলতে পারবো না; এটা একটি ভয়ানক ব্যাপার। যেহেতু আপনার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে সময়, সেহেতু আপনার রূপকল্প বা ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টির সাথে যারা অসামঞ্জস্য তাদের সাথে কাজ করার প্রশ্নই আসে না। এতে করে কেবল সময়ের অপচয় ঘটবে। আপনি যদি আপনার কাজ করতে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারেন তবে আপনি আপনার সময়কে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেননি। এমনকি আপনার অর্থকেও ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি।

একদম শুরু থেকে আমি চেয়েছি পেপালে যেন *একই আগ্রহে* আগ্রহী লোক নিয়োগ দেওয়া হয়। আমি চিন্তা করে দেখলাম যে আমাদের আগ্রহ যদি একই রকম হয় তবে আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক দৃঢ় ও মজবুত হবে। আর এটাই

আমাদেরকে সফল করে তুলবে। যা পেপালকেও ছাড়িয়ে যাবে। তাই আমরা এমন লোক নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করলাম যারা একত্রে কাজ করতে ভালোবাসে। তাদেরকে অবশ্যই মেধাবী হতে হবে। কিন্তু তারচেয়েও বড় কথা হচ্ছে তারা যে *আমাদের সাথে* কাজ করবে সেটা নিয়ে তারা আগ্রহী। এখান থেকেই পেপাল মাফিয়ার যাত্রা শুরু।

সফল নিয়োগের গোপন চাবিকাঠি

যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মী নিয়োগ একটি মূল দক্ষতার জায়গা। এটা কখনোই অবহেলা করা উচিত নয় বা দায়সারাভাবে সম্পন্ন করা ঠিক নয়। আপনার কেবল দক্ষ লোক হলেই হবে না, বরং তারা যেন দলবদ্ধবাবে কাজ করার মানসিকতা সম্পন্ন লোক হয় তাও দেখতে হবে। প্রথমেই লোকজনের তথ্যবহুল জীবনবৃত্তান্ত দেখে হকচকিয়ে যাবেন না। আপনার মুখ্য প্রশ্ন হওয়া উচিত, '*একজন লোক কেন আপনার কোম্পানিতে কাজ করবে?*'

দেখুন, যারা মেধাবী লোক তাদের কাজের অভাব নেই; তাদের সুযোগের অভাব নেই। তাদের কী দরকার আছে আপনার সাথে কাজ করার। আপনার উচিত আরও নির্দিষ্টভাবে নিজেকে জিজ্ঞেস করা : *একজন প্রকৌশলী বা ইঞ্জিনিয়ার যদি গুগলে কাজ করার সুযোগ পায়, বেশি টাকা ও বেশি সম্মান পায় তবে কেন সে আপনার কোম্পানিতে কাজ করতে আসবে?*

এখানে কিছু উত্তর দেওয়া হলো যেগুলো অনুপযুক্ত : 'আমার কোম্পানির শেয়ারের দাম অন্য যেকোনো কোম্পানির শেয়ারের দামের চেয়ে বেশি।' 'এখানে দেশের সবচেয়ে মেধাবী লোকজন কাজ করে।' 'পৃথিবীর সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সমস্যা সমাধানে আপনি একজন অংশীদার হতে যাচ্ছেন।' আপনি হয়তো বলতে পারেন যে, শেয়ার, মেধাবী লোকের সঙ্গ বা মহান কিছুর সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগের চেয়ে আর কী মূল্যবান ও আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু সব কোম্পানিই ঠিক একই জিনিস দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই এতে করে এই সাধারণ বক্তব্যগুলো আপনার কোম্পানিতে দক্ষ ও মেধাবী লোকজন টানবে না। সাধারণত অনেক প্রতিষ্ঠান

এটাও বলে না যে, একজন ব্যক্তি কেন তার প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবে।

সবচেয়ে ভালো ও উপযুক্ত উত্তর হচ্ছে আপনার নিজের কাছে, সেটা আপনার কোম্পানির ওপর নির্ভর করে। তাই এর উত্তর আপনি এই বইয়ে খুঁজে পাবেন না। তবে আপনাকে আমি দুইটি ভালো তথ্য দিতে পারি যেগুলো দিয়ে আপনি আপনার জন্য উপযুক্ত উত্তর পেতে পারেন। এক হচ্ছে আপনার কোম্পানির সঙ্কল্প নিয়ে এবং দুই হচ্ছে আপনার কর্মীদল দিয়ে। আপনি যদি দক্ষ ও মেধাবী লোকজনকে আপনার কোম্পানিতে যুক্ত করতে চান তবে আপনার উচিত প্রথমেই এটা বলা যে, কেন আপনার কোম্পানির সঙ্কল্প বা মিশনটি সমাজ ও দেশের জন্য আবশ্যক। কোম্পানির মিশনের গুরুত্ব তুলে ধরাই যথেষ্ট নয়। আপনার কোম্পানির সঙ্কল্প কীভাবে দেশ ও সমাজের মানুষের জন্য আবশ্যক, কেন ভবিষ্যতের জন্য অত্যাবশ্যক তাই তুলে ধরতে হবে। আমরা যখন পেপালে ছিলাম তখন যদি আমরা আমেরিকান ডলারকে সরিয়ে দিয়ে একটি নতুন ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থা চালুর প্রতি অতি উৎসুক না হতাম তাহলে কি আমরা একত্রে কাজ করতে পারতাম? আমরা আগ্রহীদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যদি তোমরা আগ্রহী হও তবে চলে এসো, এসো একসাথে কাজ করি। আর যদি এই সঙ্কল্পটি তোমাকে উৎসাহী না করে তবে পেপাল তোমার জন্য নয়।

যাইহোক, অনেক সময়ই দেখা যায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মহান সঙ্কল্পও মানুষকে উৎসাহী করে না। একজন কর্মচারীর দিক থেকে যদি চিন্তা করেন তবে সে চিন্তা করবে, 'আমি কি এদের সাথেই কাজ করতে আগ্রহী?' আপনাকে বলতে হবে কেন আপনার কোম্পানি কেবল তার জন্যই উপযুক্ত। যদি আপনি তা পরিষ্কার করতে না পারেন তবে কর্মীদলটি খুব একটা ভালো হবে তা বলা যায় না।

আর কখনোই বাড়িয়ে রঙ চড়িয়ে কিছু বলবেন না। আপনার পক্ষে যা করা সম্ভব তাই বলুন। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন, চমৎকার লোকজনের একটি কর্মীদল আছে, সকলের সাথে কাজ করে আনন্দ পাবে এতটুকুই। আর বাৎসরিক সুযোগ সুবিধা, চিকিৎসা সেবা বা অন্য যা যা সুবিধা দেওয়া যায় তা উল্লেখ করুন। আপনি নিশ্চয় ২০১৮ সালের গুগল যে সুবিধাদি দিচ্ছে তা দিতে পারবেন না, তবে আপনি ১৯৯৯ সালে গুগল যে সুবিধাদি দিয়েছিল তা দিতে পারেন।

প্রযুক্তিগত কোম্পানির চালচিত্র

বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে প্রত্যেকেই দেখতে একই রকম, কিন্তু প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি রয়েছে। একই কিন্তু ভিন্ন।

যেসব তরুণরা প্রযুক্তিগত কোম্পানিতে কাজ করে বা ই-কর্মাস ভিত্তিক কাজ করে তারা সাধারণত একটি টি-শার্ট ও জিন্স পরে। মনে হয় যেন তারা তাদের পোশাকের ব্যাপারে ততটা সচেতন নয়। কিন্তু আপনি যদি একটু কাছে গিয়ে দেখেন তবে দেখবেন যে, সেই টি-শার্টগুলোতে তাদের কোম্পানির লোগো আছে বা এমন কোন দর্শন যা তারা অবশ্যই মেনে চলে এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। ঠিক এই জিনিসটাই, একই ধরনের টি-শার্ট একজনকে তার সহকর্মীদের সাথে যুক্ত করে এবং বাইরের লোকজন থেকে নিজেদের পৃথক করে। একই কিন্তু ভিন্ন। এই টি-শার্ট কেবল পরিধানের জন্য পরিধান নয়। এটা হচ্ছে একটি কোম্পানির সঙ্কল্প ও রূপকল্পের প্রতি দলের প্রতিটি সদস্যের বিশ্বাস ও ভালোবাসা। তারা সকলে একই চেতনা ধারণ করে যা তাদের সকলকে একই লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত করে। মানসিক চেতনা ও কোম্পানির বৃহত্তর লক্ষ্যের প্রতি তারা সকলে একমত কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন কর্মদক্ষতা রয়েছে।

আমার বন্ধু এবং পেপালের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ম্যাক্স লেভচিনের মতে, 'একটি উদ্যোগ শুরু করার সময় যতটা সম্ভব ব্যক্তিগতভাবে কাজ করা যায় ততই ভালো। কারণ উদ্যোগগুলো শুরুতে হয় স্বল্পকিছু সম্পদ এবং ছোট্ট একটি দল নিয়ে। তাদেরকে দ্রুত ও দক্ষভাবে কাজ করতে হবে যাতে করে তারা বাঁচতে পারে। আর এ কাজটি তখনই সম্ভব যখন প্রত্যেকের মানসিকতা ও নীতি নৈতিকতা একই রকম হয়।' আমাদের দল থেকে নেওয়া পেপাল উদ্যোগটি সফল ছিল কারণ আমরা সকলে একত্রে কাজ করেছি। আর আমরা ভালোভাবে একত্রে কাজ করতে পেরেছি কারণ আমাদের সকলের মানসিকতা ছিল একই রকম। আমরা সকলেই বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি পছন্দ করতাম, আমরা সমাজতান্ত্রিক *Star Trek* এর চেয়ে পুঁজিবাদী *Star Wars* বেশি পছন্দ করতাম। আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আমরা সবাই একটি ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রতি পাগল ছিলাম যা সরকার দ্বারা নয়; বরং

ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আমরা যখনই নতুন কাউকে নিয়োগ দিতাম তখনই আমরা আমাদের মতো লোকই খুঁজতাম। সে দেখতে যেমনই হোক না কেন বা সে যেই দেশের হোক না কেন সে যদি ঠিক একই কারণটির প্রতি উৎসুক (*একটি ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রতি* উৎসুক) তবে আমরা তাকে নিয়ে নিতাম।

একটি নির্দিষ্ট কাজ করুন

ভিতর থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই একদম তার কর্মদক্ষতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হতে হবে।

একটি উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার বিশেষ বিশেষ কর্মদক্ষতার জন্য চেনা যাবে। উদ্যোক্তাদের আরেকটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। যখনই কোন নতুন কর্মচারীকে দায়িত্ব দেওয়া হবে তখন দেখবেন যেন নতুন কর্মীকে তার দক্ষতা অনুযায়ী কাজ দেওয়া হয়, অন্ততপক্ষে যতটা সম্ভব তার আগ্রহ ও দক্ষতা অনুযায়ী কাজ দেওয়া। এতে করে দেখবেন আপনি যদি কঠিন কোনো কাজও দেন তবে তা খুব সহজেই সমাধান হয়ে গেছে। এটার আরেকটি কারণ হচ্ছে উদ্যোক্তাদেরকে খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে। আর দ্রুত এগিয়ে যেতে হলে যে যা পছন্দ করে এবং যে যাতে দক্ষ তাকে দিয়ে তাই করানো উচিত। চাকরি কেবল কর্মী ও কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। চাকরি যখন কর্মীর আগ্রহের জায়গাকে পূরণ করবে তখনই তা অসাধারণ হয়ে উঠবে।

আমি পেপালের ব্যবস্থাপক থাকাকালীন কোম্পানির প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক সময়ে কেবল একটি নির্দিষ্ট কাজই করতে দিতাম। প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট গুণ ছিল এবং আমি সেই গুণবিশিষ্ট কাজটিই তাকে করতে দিতাম। এতে করে সেও তার গুণটিকে আরও উন্নত করার সুযোগ পেল এবং আমার কাজটি খুব ভালোভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল। এতে করে আমি আরেকটি অসাধারণ জিনিস আবিষ্কার করলাম—প্রত্যেককে তার দক্ষতার জায়গায় কাজ করতে দিলে কর্মচারীদের মধ্যে কোন হিংসা বিদ্বেষ ঘটে না বা রেষারেষি হয় না। বেশিরভাগ কোম্পানিতে দেখা যায় কর্মচারীরা রেষারেষি করে কারণ তারা একই দায়িত্ব

পালনে প্রতিযোগিতা করে। কিন্তু একজন উদ্যোক্তাকে এই ধরনের কাজের মধ্যে যাওয়া যাবে না কারণ এমনিতেই তার কোম্পানি নতুন; এর ওপর যদি কর্মচারীরা রেষারেষি করে সময় ও কাজের মান খারাপ করে তবে কোম্পানির তো লালবাতি জ্বলবে। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সরিয়ে দিলে প্রত্যেক কর্মী একে অপরের সাথে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে এবং প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারে। তারচেয়ে বড় কথা, কোম্পানির অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা একটি উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে প্রচণ্ডভাবে সহায়তা করে। প্রায়ই দেখা যায় যখন একটি উদ্যোগ ব্যর্থ হয়, এটার অন্যতম কারণ হচ্ছে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল। এখন প্রত্যেক কোম্পানিই একে অপরের থেকে ভিন্ন। কিন্তু কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোতে যদি কর্মীদের রেষারেষি থাকে তবে এটাতে উক্ত কোম্পানির চেয়ে তার প্রতিপক্ষ কোম্পানির বেশি লাভ। তাই উদ্যোগ নিবেন আপনি আর মুনাফা করবে প্রতিপক্ষ কোম্পানি তা যেন না হয়।

গোঁড়ামি নাকি ঘুরে বেড়ানো

বেশিরভাগ কোম্পানিতে কর্মচারীরা তাদের নিজেদের কর্মীদের সাথেই বেশি সময় কাটায়। এমনকি তারা তাদের পরিবার ও বাইরের পৃথিবীকেও এড়িয়ে চলে। এতে করে তারা নিজেদের মধ্যে একটি অসাধারণ সম্পর্ক গঠন করে। এই ধরনের কোম্পানি বা উদ্যোগ তাদের নিজেদের রূপকল্প ও সঙ্কল্প নিয়ে অতিরিক্ত গোঁড়ামি করে। এর বিপরীতে আছে কিছু ঘুরে বেড়ানো লোক। তাদেরকে পরামর্শক বলা হয়। তারা হয়তো একটি কোম্পানিতে অল্প কিছু সময়ের জন্য পরামর্শক হয়, কিন্তু তারা কখনো দীর্ঘমেয়াদে কোম্পানির জন্য কাজ করে না। প্রতিটি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতিকে একটি সহজ সরল রেখা দিয়েই বোঝানো যায়।

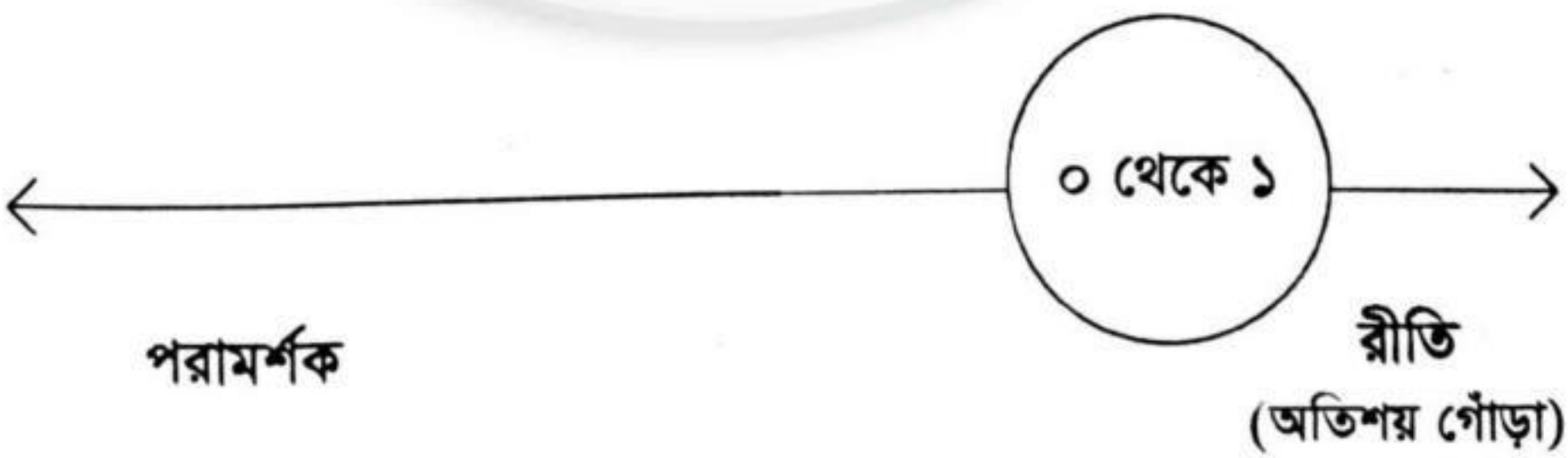

একটি উদ্যোগকে ঠিক গোঁড়ামি বলা চলে না। তবে এটা তার কাছাকাছিও বটে। গোঁড়া কোম্পানিগুলো মূলত কোনো *একটি ভুল বিষয়* নিয়ে অতিশয় গোঁড়ামি করে। কিন্তু একজন উদ্যোক্তার সফল উদ্যোগ বা সফল কোম্পানি জনগণের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করা যায় এমন কিছুতে অতিশয় গোঁড়ামি করে। তারা তাদের উদ্দেশ্যের দিক থেকে সঠিক এবং বাইরের লোকজন যা এড়িয়ে চলে বা দেখেও নজর দেয় না, সেরা উদ্যোক্তারা তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশ্য আপনি এর গোপন সূত্রটি কোনো পরামর্শক থেকে জানতে পারবেন না। আর আপনার উদ্যোগ বা কোম্পানি যদি প্রচলিত, গৎবাঁধা পেশাগত নিয়ম মেনে নাও চলে তবুও দুশ্চিন্তা করবেন না। প্রথাগত পথে চলার চেয়ে নতুন পথে গোঁড়ামি করাও উত্তম।

Audiljua.com

এগারো

যদি আপনি উদ্যোগ নেন তবে কি লোকজন এই ব্যাপারে এগিয়ে আসবে?

আমাদের এই পৃথিবী হচ্ছে বিশাল এক বাজার। যদিও মনে হয় চারিদিকে শুধু কেনাবেচা চলছে, তবুও ব্যাপারটি নিয়ে একটু চিন্তা করার আছে। অনেকেই বিক্রয় ব্যবস্থাপনার এই ব্যাপারটিকে এড়িয়ে চলে। উপন্যাস *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy* এ এই ব্যাপারটি খুব পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। গল্পটি মোটামুটি এরকম : মানব সভ্যতা প্রায় ধ্বংসের পথে। আর কোনোভাবে তাদের বাসযোগ্য গ্রহকে বাঁচানো সম্ভব নয়। তাই তারা তিনভাগে ভাগ হয়ে বিশালাকার নভোযানে করে এই মহাবিশ্বের বিভিন্ন বাসযোগ্য গ্রহের দিকে ছড়িয়ে পড়বে। ১নং নভোযানে যাবে চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিক ও নেতারা। ২নং নভোযানে যাবে বিক্রয়কর্মী ও পরামর্শকরা। আর ৩নং নভোযানে যাবে কর্মীদল ও কারিগররা। প্রথমে ২নং নভোযানটিকে ছাড়া হয়। পরে জানা যায় যে ১নং ও ৩নং এর লোকজন ২নং এর লোকজনকে অপছন্দ করতো তাই তাদেরকে আগে পাঠিয়েছে যাতে মাঝপথে বিপদ-আপদ হলে তারা যেন আগেই মারা যায়। কিন্তু দেখা গেল ২নং জাহাজের লোকজনই আগে একটি বাসযোগ্য পৃথিবীতে পা রাখে।

আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন নিশ্চয় বণ্টন বা বিলি ব্যবস্থাপনা নিয়ে এমন কোনো চিত্র দেখি না। আমি একটা কিছু সৃষ্টি করলাম আর তা নিয়ে সাফল্য অর্জন করলাম। ঠিক আছে। তবে এটা স্বপ্ন পর্যন্তই ঠিক আছে। বাস্তবে সৃষ্টি ও সাফল্যের মধ্যে একটি সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ির নাম বণ্টন বা বিলি ব্যবস্থাপনা। এখানে কোনো লিফট নেই। আপনাকে সিঁড়ি বেয়েই উপরে উঠতে হবে। যদিও আমরা বাস্তব জীবনে এই বণ্টন ব্যবস্থাপনাকে খুব একটা গুরুত্ব দিই না। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন তো—একটি পণ্য বিক্রয় করতে পারাটাই কি সব নয়? একটি পণ্য আমি সৃষ্টি করলাম। তারপর এটাকে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দিবে

কে? বণ্টন ব্যবস্থাপনা। যেহেতু আমরা মনে করি ১নং জাহাজের চিন্তাবিদ, সৃষ্টিকারী এবং ৩নং জাহাজের কর্মীরা থাকলেই যথেষ্ট—একটি ভালো পণ্য বণ্টন ব্যবস্থাপনা ছাড়াই আপনাআপনি গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাবে। আসলে কী তাই? সিলিকন ভ্যালিতে অবশ্য এই ব্যাপারটি জনপ্রিয় যে, বণ্টন ব্যবস্থাপনার কোন দরকার নেই। তাই তো সেখানে ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন ধরনের চমৎকার পণ্য সৃষ্টি করছে এবং পণ্য বিক্রয়ের চেয়ে সৃষ্টির ব্যাপারেই তারা বেশি আগ্রহী। কিন্তু আপনি কেবল সৃষ্টি করছেন বলেই যে গ্রাহকরা আপনার পণ্য নিতে লাইন ধরে দাঁড়াবে তা নয়। তাদের কাছে পণ্যটি পৌঁছেও দিতে হবে। আর এই ব্যাপারটি যতটা না সহজ মনে হয় আসলে ঠিক ততটা সহজ নয়।

সৃষ্টিকারী বনাম বিক্রয়কর্মী

বিজ্ঞাপন থেকে প্রতি বছর কত রাজস্ব পাওয়া যায় সেটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর ১২ লাখ কোটি টাকা রাজস্ব পায়। প্রতিবেদনে আরও জানা যায় এই খাতে ৬ লাখেরও বেশি লোক কাজ করে। কিন্তু বিক্রয় খাত এরচেয়েও অনেক বড়। বিক্রয় খাত থেকে আসে প্রতিবছর ৩৬ লাখ কোটি টাকার মতো এবং এই খাতে ৩২ লাখ লোক কাজ করে। বাস্তবে এর কর্মী সংখ্যা আরও বেশি। আর বিভিন্ন মৌসুমে (মেলা, অনুষ্ঠান বা ইভেন্ট প্রভৃতিতে) যে আরও কর্মীরা কাজ করে তাদের কথা বাদই দিলাম। এই কর্মীবাহিনীর পরিমাণ দেখে যেকোনো ব্যক্তিই অবাক হবে। বিশেষ করে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়াররা। এত বিক্রয়কর্মী আসলে করে কী!

সিলিকন ভ্যালিতে অনেক ইঞ্জিনিয়ারই বিজ্ঞাপন, বাজারজাতকরণ ও বিক্রয়ের ব্যাপারে সন্দিহান। কারণ তারা মনে করে এগুলো ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় বা অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু বিজ্ঞাপনের দরকার আছে। কারণ এতে কাজ হয়। এটা যেমন ইঞ্জিনিয়ারদের ওপর কাজ করে তেমনি আপনার ওপরও কাজ করে। আপনি হয়তো চিন্তা করতে পারেন *আপনি* একজন অসাধারণ ব্যক্তি, *আপনার* পছন্দগুলো অনন্য। বিজ্ঞাপন তো কেবল *অন্যদেরকে* প্রভাবিত করতে পারে। আপনাকে নয়। যদিও আমরা বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়ের কৌশল দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হচ্ছি তবুও আমরা একটি মিথ্যা আত্মবিশ্বাস দ্বারা নিজের স্বাধীনতাকে বজায় রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু আরেকটি বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, বিজ্ঞাপন এমন এক জিনিস যে, এটা আপনাকে সাথে সাথেই ক্রয় করতে উদ্বুদ্ধ করবে না, বরং

এটা আপনাকে পরবর্তী কোনো এক সময় ক্রয় করতে প্রভাবিত করবে। যে এই ব্যাপারটি ধরতে পারে না সে আরও বেশি ধোঁকা খায়।

সাধারণত কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়াররা স্বচ্ছতা দ্বারা অভ্যস্ত। অনেকটা হ্যাঁ বা না। ০ মানে বন্ধ আর ১ মানে চালু। তারা তাদের কর্মক্ষেত্র মানে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং দ্বারা সমাজের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করে। আর প্রোগামিং এর ক্ষেত্রে হয়—একটি প্রোগ্রাম কাজ করবে, নাহয় কাজ করবে না। তারা তাদের কাজকর্মও ঠিক এমনভাবে বিবেচনা করে। কিন্তু বিক্রয় করার কাজটি ঠিক এমন নয় বরং উল্টো। সাধারণত যারা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার তারা জানে যে, তাদের কাজটি খুবই কঠিন এবং তারা সেটা গুরুতরভাবেই করে। কিন্তু তারা যখন দেখে যে, একজন বিক্রয়কর্মী ফোনে একজন গ্রাহকের সাথে হেসে হেসে কথা বলছে বা দুপুরের খাবার খেতে ১ ঘণ্টার জায়গায় ২ ঘণ্টা খরচ করেছে তখন তারা চিন্তা করে এ মনে হয় ঠিকভাবে কাজ করছে না। আসলে লোকজন বিজ্ঞান ও প্রকৌশলবিদ্যাকে একটু বেশিই গুরুগম্ভীর মনে করে। যদিও এটা আসলেই কঠিন। কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ারকে এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, একটি বিক্রয়কে সহজভাবে সম্পাদন করতে অনেক কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। বিক্রয় ব্যাপারটি উপর থেকে এতটা সহজ দেখায় তার কারণ এটার নিচের দিকে (*যা দেখা যায় না*) সেখানে প্রচুর পরিশ্রম করা হয়েছে।

বিক্রয়ের ব্যাপারটাই একটি গোপন বিষয়

প্রতিটি বিক্রয়কর্মীই মূলত একজন অভিনেতা। তাদের প্রাধান্যের বিষয় হচ্ছে প্ররোচনা, নাকি আন্তরিকতা। এজন্যই বিক্রয়কর্মীদেরকে দোষারোপ করা হয়, নিন্দা করা হয়। তবে আমরা মূলত সেই বিক্রয়কর্মীকেই খারাপ বলি যে আচরণগতভাবে অভদ্র এবং গ্রাহকের চাহিদা না জেনেই তার পণ্যটি গ্রাহককে ধরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু এর বাইরেও বিক্রয়কর্মীদের একটি বড় চিত্র আছে। কিছু বিক্রয়কর্মী আছে অনভিজ্ঞ, কিছু দক্ষ এবং কিছু আছে গুরু পর্যায়ের। আর এমনও বিক্রয়কর্মী আছে যারা একদম মহাগুরু পর্যায়ের। যদি আপনি এমন মহাগুরু পর্যায়ের কোনো বিক্রয়কর্মীর দেখা না পেয়ে থাকেন তার মানে এই নয় যে, আপনার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি; বরং তার সাথে সাক্ষাৎ হলেও আপনি ধরতে পারেননি। তাদের বিক্রয়ের ব্যাপারটি এমন সুন্দরভাবে সেলাই করা থাকে যে, শার্ট গায়ে দিয়েছেন কিন্তু সেলাই দেখতে পাচ্ছেন না।

বিক্রয়ের ব্যাপারটা ঠিক অভিনয়ের মতো। অভিনয় যেমন ধরা না গেলে, গোপন থাকলে খুব ভালো হয়। বিক্রয় ব্যাপারটি তেমনই। এজন্যই যাদের বিপণন বিভাগে চাকরি হয়, হতে পারে সে বিক্রয় প্রতিনিধি, বাজারজাতকরণে আছে বা বিজ্ঞাপনের ওপর কাজ করে, তাদের পদবির নাম তাদের কাজের সাথে মিলে না। যারা বিজ্ঞাপনের ওপর কাজ করে তাদেরকে বলে 'একাউন্ট এক্সিকিউটিভস'। যারা গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রয় করে তাদের কাজের নাম 'বিজনেস ডিভেলপমেন্ট'। যারা পুরো এক কোম্পানি বা কারখানা অন্যের কাছে বিক্রয় করে তাদেরকে বলে 'ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকারস'। আর যারা নিজেদের বিক্রয় করে তাদেরকে বলে 'রাজনীতিবিদ'। বর্ণনার এই ভিন্নতার কারণ হচ্ছে আমাদের মধ্যকার কেউই বিক্রি হয়ে যাবার পর আর তা মনে রাখতে চায় না।

একজনের পেশা যাইহোক না কেন, একজনের বিক্রয় করার দক্ষতা অন্য সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। আমাদের শেয়ার বাজার (ওয়াল স্ট্রিটে) যখন একজন নতুন লোক নিয়োগ দেওয়া হয়, সে হতে পারে একজন 'বিশ্লেষক', কিন্তু তার অন্যতম কাজ হচ্ছে কীভাবে একটি ফলাফল বের করে আনবে তা খুঁজে বের করা। একজন আইনজীবীর কথা যদি ধরি সেও একই রকম। যদিও একজন আইনজীবী তার শিক্ষাগত ও পেশাগত দক্ষতার জন্য গর্ববোধ করে কিন্তু তার কাছে মামলা আনে মূলত মধ্যস্থতাকারীরাই। সরাসরি যদি বলি তবে মামলা নিয়ে আসে দালালরা। এমনকি ল ফার্মগুলোতেও মামলা আনার অন্যতম ও অধিকাংশ কাজই করে দালালরা। আবার ধরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কথা, যারা তাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাপত্রের জন্য গর্ববোধ করে, তারা আবার অন্য যারা নিজ নিজ কাজে একাগ্রভাবে দক্ষ, একটি নির্দিষ্ট কর্মে বিশেষজ্ঞ তাদেরকে হিংসা করে। এছাড়াও আজকের যে শিক্ষাব্যবস্থা বা ইংরেজি ভাষাকেই যদি উদাহরণ হিসেবে ধরি তবে আপনার কি মনে হয় এগুলো কেবল এগুলোর মেধার কারণেই সারাবিশ্বে এভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি মৌলিক পদার্থবিজ্ঞান থেকে শুরু করে ক্যানসার গবেষণা পর্যন্ত সবকিছুর পিছনেই রয়েছে একটি প্ররোচনা। প্ররোচনা মানে উৎসাহদান করা। এরপরেও দেখবেন অনেক ব্যবসায়ী এই বিক্রয় ব্যবস্থাপনাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। তারা এটা বুঝতে অসমর্থ যে, বিক্রয় ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে একটি গোপনীয়তার বিষয় জড়িয়ে আছে, যা পুরো বিক্রয় নামক গাড়িটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একটি গাড়ি চলতে দেখলে মনে হয় কী মসৃণভাবে চলছে। আসলে গাড়িটি চলেও মসৃণভাবে। কিন্তু এর ভিতরে যে এক মহাযজ্ঞ চলে : তেল, তার, বিদ্যুৎ, ব্যাটারি, চাকা, চালক প্রভৃতির মহামিলন

ঘটে তা সহজে চোখে পড়ে না। তা চোখে ধরা পড়লে একজন আর গাড়িতে চড়তো না। বিক্রয় ব্যবস্থাপনাও ঠিক একই রকম।

কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা মনে করে একটি পণ্যকে খুব ভালোভাবে তৈরি করবো যাতে করে এটা 'নিজে নিজেই বিক্রি হবে'। কিন্তু বাস্তবে কি কোনো পণ্য নিজে নিজেই বিক্রি হয়? নিশ্চয় না। আর কেউ যদি বলেও যে, পণ্য নিজে নিজেই বিক্রি হয় তবে সে হয় মিথ্যা কথা বলছে বা অন্যকে ধোঁকা দিচ্ছে অথবা সে নিজেই ধোঁকার মধ্যে আছে। ব্যবসায়িক গবেষণাতেও এই সত্য ধরা পড়েছে—'সবচেয়ে ভালো পণ্য হলেও যে বিক্রয় বেশি হবে তা নয়; সবচেয়ে উত্তম বণ্টন ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।' এটাই সত্য। আজকে যদি কারও মনে হয় যে একটি অপারেটিং সিস্টেম ও কিবোর্ড থাকলেই যথেষ্ট, আসলে তা নয়। আপনি যদি বিশেষ কোনো জিনিস, যা জনগণের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করতে পারে এমন জিনিস সৃষ্টি করে থাকেন বা উদ্যোগ নিতে আগ্রহী হন তবে আপনার উচিত এর *বণ্টন ব্যবস্থাপনা* নিয়ে চিন্তা করা। বণ্টন ব্যবস্থাপনা ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ যতটা পণ্য গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি নতুন কিছু উদ্ভাবন করে থাকেন, কিন্তু আপনি এটা বিক্রয়ের *একটি কার্যকর পথ* উদ্ভাবন করতে পারেননি তবে আপনার কপালে শনি আছে। আপনার পণ্য বা উদ্যোগ যত ভালোই হোক না কেন *একটি উত্তম বণ্টন ব্যবস্থাপনা* ছাড়া এটা ব্যর্থ।

Audilua.com

একটি পণ্য কীভাবে বিক্রয় করবেন?

বিক্রয় ও বণ্টন ব্যবস্থাপনা নিজেই একটি একচেটিয়া ব্যবসা দাঁড় করাতে সক্ষম। এটা যেকোনো পণ্য বিক্রয়ের জন্যও সত্য। কিন্তু এর বিপরীতটি অসত্য—একচেটিয়া ব্যবসাই যে একটি ভালো ও দক্ষ বিক্রয় ও বণ্টন ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করতে পারে একথা সত্য নয়। আপনার পণ্য যত ভালোই হোক না কেন—যদি লোকজনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণেও এটা সক্ষম হয় এবং গ্রাহক যদি পছন্দও করে তবুও আপনার উচিত এই পরিস্থিতিকে একটি শক্তিশালী বণ্টন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া।

একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনার দুইটি দিক রয়েছে। এক হচ্ছে বর্তমান একজন গ্রাহক থেকে গড়ে আপনি যে আয় করেন। আর দুই হচ্ছে নতুন একজন গ্রাহক খুঁজতে যে ব্যয় হয়। এই ব্যয় যেন আয়ের চেয়ে বেশি না হয় সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। মোটকথা, আপনার পণ্যের দাম যত বেশি হবে, তা বিক্রয়ের জন্য

আপনার তত বেশি খরচ করতে হবে। বন্টন ব্যবস্থাপনাকে মোটামুটি এভাবে দাঁড় করাতে পারেন :

গ্রাহক থেকে সম্ভাব্য আয় :	৮১০,০০,০০০	৮১০ কোটি

নির্দিষ্ট লক্ষ্য : ব্যবহারকারী - - - - - ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী - - - - - - - বড় বড় ব্যবসায়ী, সরকারি দরপত্র

বড় বড় বিক্রয়

আপনার বাৎসরিক বিক্রয় যদি হয় ৭ অংকের বা তার চেয়ে বেশি, তাহলে আপনার উচিত সবগুলো চুক্তি, দলিল বা রশিদ নিজে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করা। সোজা কথা, আপনার বাৎসরিক বিক্রয় যদি হয় ১০ লাখ বা তার উপরে তাহলে আপনাকে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার আগে এই রশিদগুলো ভালো করে দেখে নেওয়া উচিত। একটি ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে হয়তো এক দুই মাস সময় লাগে। একটি ভালো বিক্রয় হতে হয়তো এক দুই বছর সময় লাগে। কিন্তু বেশিরভাগ সময় দেখা যায় এমন সম্পর্ক, এমন দেরিতে হওয়া বিক্রয়গুলোই সবচেয়ে বেশি মুনাফাদায়ক।

উদাহরণ হিসেবে ধরুন *SpaceX* এর কথা। এর প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক তাঁর প্রথম উদ্যোগ হিসেবে একটি নভোযান বা রকেট অন্তরীক্ষে পাঠানোর চেষ্টা করেন। তার পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসাকে একটি হাজার কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষর করতে প্ররোচিত করে। (৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তে স্পেসএক্সের পক্ষ থেকে স্পেসএক্স ফেলকন হেভি রকেট নামে একটি নভোযান অন্তরীক্ষে উৎক্ষেপিত হয়। বইয়ের শেষে এই নামে লিংক দেওয়া আছে। ইচ্ছা করলে দেখতে পারেন। রোমাঞ্চকর একটি ব্যাপার।) যদিও নাসার সাথে এমন একটি চুক্তি করা কখনো সহজ ছিল না। স্পেসএক্সের কর্মচারী সংখ্যা মাত্র ৩,০০০। সে তুলনায় নাসার কর্মচারী সংখ্যা ৫ লাখেরও বেশি। আর

তাদের কর্মীরা সারা আমেরিকা জুড়ে রয়েছে। যদিও অনেক রাজনীতিবিদ এই বিনিয়োগের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছে তারপরেও একজন মহাগুরু পর্যায়ের বিক্রয়কর্মী ইলন মাস্কের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারেনি। তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকদের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন এবং কাজটি সম্পন্ন করেছেন। এভাবে তিনি রাজনৈতিক বাধাকেও অতিক্রম করে দেখিয়েছেন।

বড় বড় বিক্রয়গুলো ঘটার জন্য যে অনেক 'বিক্রয়কর্মী' দরকার, আসলে ব্যাপারটি তা নয়। আমি নিজে আমার এক বন্ধুর সাথে মিলে *Palantir* কোম্পানিটি গঠন করি। আমার কলেজ সময়কার এই বন্ধুটির নাম অ্যালেক্স কার্প। সে কোম্পানির প্রধান কার্যনির্বাহী (সিইও)। আমরা আমাদের কোম্পানির পণ্য বিক্রয়ের জন্য তেমন কোনো বিক্রয়কর্মীই রাখিনি। তবে অ্যালেক্স যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে মাসের ২৫ দিনই সে কোনো না কোনো সম্ভাব্য ক্রেতা বা গ্রাহকের সাথে সাক্ষাৎ করে। এসব গ্রাহকদের কাছে আমরা যে পণ্য বিক্রয় করি তা সাধারণত ৮০০ কোটি টাকা থেকে ৮০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে। এই ধরনের চুক্তিগুলো করার ক্ষেত্রে গ্রাহকরা সাধারণত কোম্পানির প্রধানদের সাথে আলাপ করতে চায়, নাকি কোনো বিক্রয় প্রতিনিধির সাথে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বড় বড় বিক্রয় চুক্তিগুলো কি এমনি এমনি আপনার কোম্পানির কাছে চলে আসবে। নিশ্চয় তা নয়। এই ধরনের বড় বিক্রয়গুলো আসে সাধারণত যেসব কোম্পানির বাৎসরিক বৃদ্ধি ৫০% বা ১০০%। এই প্রবৃদ্ধি আবার ধারাবাহিক হতে হবে। বছরের পর বছর ধরে। হতে পারে এক দশক বা এক যুগ ধরে। এতে করে আপনি হয়তো একটু মনঃক্ষুণ্ন হবেন। কিন্তু এটাই সত্য। আপনি হয়তো চিন্তা করতে পারেন যে, গ্রাহকদেরকে যতদ্রুত সম্ভব ভালো পণ্য দেওয়া যায় ততদ্রুত আপনি ও আপনার কোম্পানি ১০ গুণ ভালো করবে। আসলে ব্যাপারটা সবসময় এমন হয় না। একটি ভালো প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুণ হচ্ছে, ছোট ছোট বিক্রয় থেকে আরম্ভ করে। এই গ্রাহকদের যত্ন নেয়। এরপর একজন বড় গ্রাহক যখন সন্তুষ্ট হয় যে এই প্রতিষ্ঠান যেহেতু ছোট গ্রাহকদের ঠিকভাবে যত্ন নিচ্ছে, ভালো পণ্য দিচ্ছে, কথা দিয়ে কথা রাখছে তবে একে এবার বড় কাজ দেওয়া যেতে পারে। এমন বড় বড় গ্রাহকরা আগে দেখবে যে, আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠান ছোট গ্রাহকদের কেমন সেবা দিচ্ছেন। যখন তারা অনেকগুলো ছোট ছোট গ্রাহকদের দ্বারা সন্তুষ্ট হবে তখন সে আপনাকে বা

আপনার প্রতিষ্ঠানকে একটি বড় অংকের কাজ দিবে। এরপর আপনি এরচেয়েও বড় বড় কাজে হাত দিতে দ্বিধা করবেন না।

ব্যক্তিগত দিক থেকে বিক্রয়

বেশিরভাগ বিক্রয়ই হবে ছোট ছোট। এই ধরুন ১০,০০০ থেকে ১০,০০,০০০ এর মধ্যে। সাধারণত এসব বিক্রয়গুলোতে সিইও এর উপস্থিত না থাকলেও চলে। আসলে প্রশ্ন এটা নয় যে, কীভাবে একটি বিক্রয় হবে, আসল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে একটি বিশ্বস্ত ও প্রতিষ্ঠিত পথ সৃষ্টি করা যাতে বিক্রয়দল পণ্য দিয়ে আসতে পারে এবং গ্রাহকরা সহজেই পণ্যটি গ্রহণ করতে পারে। এই পথ সৃষ্টি করতেই হবে যাতে করে বিরাট সংখ্যক গ্রাহকের কাছে পর্যাপ্ত পণ্য পৌঁছে দেওয়া যায়।

আপনাকে একটি কোম্পনির কথা বলি। এটা প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালে। কোম্পানিটির নাম *Box*। এটি হচ্ছে তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য একে অপরের সাথে বিনিময় করার একটি মাধ্যম। এটির সুবিধা হচ্ছে এই তথ্যগুলো রাখতে বক্স কোম্পানি নিজেই গ্রাহকদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুবিধা দেয়। কিন্তু তখনকার সময়ে লোকজন বুঝতে পারছিল না যে, তাদের আসলেই সেই সুবিধাটি দরকার আছে কিনা। তাই ব্লেক একজন বিক্রয়কর্মী ডাকলো—যাতে ব্যাপারটিতে নতুনত্ব আনা যায়। তখন থেকে বক্স এমন ধরনের গ্রাহকদের নিয়ে কাজ আরম্ভ করলো যাদের তথ্য সংরক্ষণ করাটা বিশেষভাবে জরুরি। ২০০৯ সালে ব্লেক তার কোম্পানির জন্য একজন গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহক পেল। তারা ছিল স্ট্যানফোর্ড স্লিপ হাসপাতাল। তাদের হাসপাতালের গ্রাহক ও গবেষণা তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য এবং একে অপরের সাথে তথ্য বিনিময়ের জন্য অনেক বড় তথ্য সংরক্ষণের জায়গা দরকার ছিল। বক্স তাদেরকে এই সুবিধা দেয়। এখন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ও কর্মচারীদের জন্য বক্স ব্যবহারের সুযোগ দেয়। কিন্তু বক্স যদি প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কাছে তাদের সুবিধা বিক্রয়ের চেষ্টা করতো তবে তারা আজকের এই বিশাল সুবিধা পেত না। বড় বড় বিক্রয় করতে গেলে বক্স কোম্পানি হয়তো পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো। কিন্তু এক এক করে গ্রাহকদের সেবা ও সুবিধা দিয়ে যাওয়ার কারণে আজকে বক্স কোম্পানি হাজার কোটি টাকার ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

আবার মাঝে মাঝে পণ্য নিজেই বিপণনের পথ দেখিয়ে দেয়। আমাদের ফাউন্ডারস ফান্ড আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জোকডোক *(ZocDoc)* নামক একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই কোম্পানিটি লোকজনকে অনলাইনে কী চিকিৎসক দেখানো দরকার সেই পরামর্শ দেয় এবং চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাতের সময়সূচিও ঠিক করে দেয়। কোম্পানিটি আবার চিকিৎসকদের প্রতিমাসে এর সাথে যুক্ত থাকার জন্য কিছু টাকা দেয়। এতে করে দেখা গেল জোকডোকের অনেক বিক্রয়কর্মী দরকার যাতে কোম্পানি চালানোর জন্য যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যায়। এখানে ঘুরে ঘুরে রোগী ঠিক করে যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু বেশি বেশি চিকিৎসককে এই উদ্যোগের সাথে যুক্ত করার ফলে অনেক বেশি পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছিল। এতে করে লোকজন অনেক বেশি সুবিধা পাচ্ছে। তাই বেশি বেশি লোকজন ওয়েবসাইটে আসা আরম্ভ করলো এবং চিকিৎসকরাও আরও বেশি রোগীদের পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ পেল। প্রতি মাসে প্রায় ৫০ লাখেরও বেশি গ্রাহক এই সেবাটি গ্রহণ করছে। আর এটা যদি দিন দিন বাড়তে থাকে তবে আমেরিকার জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান হয়ে দেখা দিবে।

Audilua.com

অকার্যকর বিপণন ব্যবস্থা

ব্যক্তিগত বিক্রয় এবং প্রথাগত বিজ্ঞাপনের দ্বারা বিক্রয়, এই দুইয়ের মধ্যবর্তী জায়গা একটি অকার্যকর জায়গা। ধরুন, আপনি একটি হিসাব সংরক্ষণের সফটওয়্যার তৈরি করলেন যাতে করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানের হিসাব রাখতে পারে এবং অর্ডারগুলো ঠিকমতো দিতে পারে। এখন এটার দাম যদি হয় ৮৮০,০০০ এবং আপনি যদি বাজারে এই প্রথম আসে তবে আপনার জন্য গ্রাহক খুঁজে বের করা কঠিন হবে এবং আপনি সহজে একটি বিপণন ব্যবস্থা খুঁজে পাবেন না। আপনার পণ্যটি বা সফটওয়্যারটি যদি মানুষের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসা পরিচালনায় সহায়তাও করে তবুও মূল প্রশ্ন হচ্ছে আপনি লোকজনের কাছে পৌঁছাবেন কীভাবে? এখন যদি বিজ্ঞাপনের চিন্তা করেন, ধরলাম টিভি বিজ্ঞাপন—এমন কোনো টিভি চ্যানেল কি আছে যা শুধু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাই দেখে? অথবা ব্যবসায়ীরা দেখলেও সে যে এমন একটি হিসাব সংরক্ষণের সফটওয়্যারের জন্য বছরে ৮৮০,০০০ দিবে তা কি নিশ্চিত হওয়া যায়? এই ধরনের পণ্যের জন্য দরকার

ব্যক্তিগত বিক্রয়। একজন বিক্রয়কর্মী একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে পুরো ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলবে এবং পণ্যটি বিক্রয় করবে। কিন্তু প্রথম প্রথম আপনার কাছে নিশ্চয় এত টাকা নেই যে, একজন বিক্রয়কর্মী রেখে ব্যবসা করবেন। এজন্যই অনেক ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান এই ধরনের সহায়তাকারী সফটওয়্যার ব্যবহার করে না। কিন্তু বড় বড় প্রতিষ্ঠান কিন্তু ঠিকই ব্যবহার করছে। আসলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পিছয়ে আছে তা নয় অথবা তাদেরকে সহায়তা করার জন্য পর্যাপ্ত সুবিধাদি নেই তাও নয়; বরং আমাদের একটি কার্যকর বিপণন ব্যবস্থা নেই।

মার্কেটিং ও বিজ্ঞাপন

বাজার যাতে আপনার পণ্যটি তার ব্যবহারকারীদের হাতে সুন্দর ও সহজভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ঠিকভাবে বাজারজাতকরণ এবং বিজ্ঞাপন একটি বড় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করতে চাই। সেটি হচ্ছে সাধারণত কম দামী পণ্য এবং যেই পণ্যের ভালো কোনো বিপণন ব্যবস্থা নেই সেটির জন্য বাজারজাতকরণ ও বিজ্ঞাপন ভালো কাজে দেয়। এখন ধরুন প্রক্টর ও গেম্বল কোম্পানির কথা। এটা সাধারণত পরিচিত $P\&G$ নামে। তারা যে ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে কাপড় ধোয়ার গুড়াঁ পাউডার নিয়ে বোঝাবে, তা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের একদল বিশাল বিক্রয় কর্মীবাহিনী আছে যারা ছোট ছোট মুদি দোকান ও বড় বড় পাইকারি-খুচরা দোকানে যায় এবং সেখানে দোকানদারদের সাথে আলাপ করে। এখান থেকে একজন ক্রেতা পাওয়া মানে ১,০০,০০০ প্যাকেটের অর্ডার পাওয়া। এখন কোনো কোম্পানি যদি এর শেষ ক্রেতা, মানে যে ব্যবহারকারী তার কাছে পৌঁছাতে যায় তবে তাকে টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দিতে হবে, সংবাদপত্রে পণ্যের মূল্যহ্রাস দিয়ে বিজ্ঞাপন দিতে হবে এবং পণ্যের মোড়কটিও হতে হবে আকর্ষণীয়। তবেই তা তার ব্যবহারকারীদেরকে আকর্ষণ করবে। একদিকে বিক্রয়কর্মীদের কাজ হবে পাইকারি-খুচরা দোকানদারদের কাছ থেকে অর্ডার সংগ্রহ করা। আর অন্যদিকে বিজ্ঞাপনের কাজ হবে পণ্যের ব্যবহারকারীদেরকে পণ্য সম্পর্কে আকর্ষিত করা। এটাই হচ্ছে দুইটির মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্য।

যেকোনো উদ্যোগের জন্য বিজ্ঞাপন কাজে দিতেও পারে, আবার নাও দিতে পারে। বিজ্ঞাপন তখনই কাজে লাগবে যখন আপনার হাতে গ্রাহক থাকবে এবং

দীর্ঘমেয়াদে আপনার পণ্য গ্রাহকদের সেবা দিয়ে যাবে তখন। উদাহরণ হিসেবে ওয়ারবাই পারকারের একটি ই-কমার্স উদ্যোগের কথাই ধরুন। এটা মূলত সুন্দর সুন্দর চশমা নকশা করে এবং বিক্রয় করে থাকে। তাদের প্রত্যেক জোড়া চশমা ১,০০০ টাকা থেকে আরম্ভ হয়। তাহলে বুঝতেই পারছেন একজন গ্রাহক তার সারা জীবনে মাত্র কয়েক হাজার টাকার চশমাই কিনবে। এটাকে সিএলভি বলে। এটা সম্পর্কে আরেকটু বলে নেই। সিএলভি *(CLV)* হচ্ছে *গ্রাহকের সাথে কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্পর্ক*। একজন গ্রাহক তার ভবিষ্যৎ জীবনে কতগুলো পণ্য ক্রয় করবে তার একটি অনুমান। গ্রাহককে কেবল আজকে কোনো রকম একটি পণ্য ধরিয়ে দিলেই হবে না। তার সাথে ভবিষ্যতেও সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। ধরুন একজন গ্রাহক তার সমগ্র জীবনে ৫ জোড়া চশমা কিনবে। এখন পারকার থেকে একজন গ্রাহক আজকে প্রথম জোড়া চশমা কিনেই যে থেকে গেল তা নয়, যদি পারকারের চশমা জোড়া গ্রাহকের জন্য উপযোগী ও নিত্যনতুন হয় তবে পারকার কেবল একটি জোড়া চশমাই বিক্রয় করলো না, সে ভবিষ্যতের জন্য আরও ৪ জোড়া চশমার অর্ডার পেয়ে গেল। একেই বলে গ্রাহকের সাথে কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্পর্ক। এখন পারকারও ইচ্ছা করলে টিভিতে তার বিজ্ঞাপন দিতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। কারণ আপনি একজন নতুন গ্রাহক পেতে কয়েক হাজার টাকা খরচ করতেই পারেন। কিন্তু সেই গ্রাহক যদি তার সারা জীবনে ৫,০০০ টাকার চশমা কিনে এবং আপনি এরকম একজন গ্রাহক পেতে ৬,০০০ টাকা ব্যয় করেন তবে আয়ের চেয়ে বিজ্ঞাপন ব্যয় বেশি হয়ে গেল। ফলাফল হচ্ছে আর্থিক ক্ষতি। আবার গ্রাহক যে আজকে একটি পণ্য ক্রয় করেই শেষ তাও নয়। আজকের পণ্যটি ভালো পেলে, গ্রাহক উন্নত সেবা পেলে ভবিষ্যতেও গ্রাহক একই কোম্পানি থেকে পণ্য নিবে। এটাই হচ্ছে *গ্রাহকের সাথে কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্পর্ক*। (বর্তমানে বাংলাদেশের ই-কমার্স ও বিভিন্ন নতুন নতুন উদ্যোগের একটি অন্যতম দুর্বলতা হচ্ছে তারা *গ্রাহকের সাথে কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্পর্ক* নিয়ে কম চিন্তা করে। গ্রাহককে দ্রুত একটি পণ্য দিয়ে চলে যেতে চায়।)

প্রত্যেক উদ্যোক্তাই চায় তার উদ্যোগকে বড় করে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখানো হোক। কিন্তু বড় করে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করতে গেলে যে খরচ হয় তা অনেকটা খাজনার চেয়ে বাজনা বেশির মতো ঘটনায় পরিণত হয়। একজন

উদ্যোক্তাকে অবশ্যই এ ধরনের বড় করে বিজ্ঞাপন দেওয়ার লোভ সামলাতে হবে। এটা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আমরা পেপাল গঠন করার সময় একজন বক্তা ঠিক করি যিনি সাংবাদিকদের কাছে আমাদের পণ্যটিকে তুলে ধরবেন এবং বক্তৃতা দিবেন। তার নাম ছিল জেমস ডুহান। তিনি *Star Trek* এ অভিনয়ও করেছেন। পামপাইলটের জন্য যখন আমরা আমাদের প্রথম সফটওয়্যারটি উদ্বোধন করি সেদিন জেমস একটি চমৎকার কথা বলে, 'আমি আমার পুরো কর্মজীবনে লোকজনকে বহু জায়গায়, বহু চরিত্রে স্থানান্তর করেছি। কিন্তু আমি এই প্রথম টাকাকে এত দ্রুত স্থানান্তর হতে দেখছি, তাও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে!' এটা ১৯৯৮ সালের কথা, একজন ক্রেতা একজন বিক্রেতাকে নগদ টাকা দেওয়ার বদলে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে টাকার অংক পাঠাতে পারত। আজকের জন্য এটা সাধারণ হলেও, তখনকার জন্য এ ছিল একটি অভিনব ব্যাপার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাংবাদিকরা এত চমৎকার বক্তব্যের পরও উদ্যোগটি নিয়ে কোনো উৎসাহই দেখাল না। আমরা সবাই ছিলাম কম্পিউটার পাগল। আমরা তো বিজ্ঞাপন বা বাজারজাতকরণ সম্পর্কে ততটা অভিজ্ঞ নই। আমরা ভাবলাম, জেমস মনে হয় ব্যাপারটিকে ঠিকমতো তুলে ধরতে পারলো না। আসলে তা নয়। প্রথম প্রথম এমনটাই হয়। যেকোনো অভিনব উদ্যোগকে প্রথম প্রথম গ্রহণ করতে একটু দ্বিধা হয়। এটাই স্বাভাবিক।

বিপণনের জনপ্রিয় নীতি

একটি পণ্য তখনই অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং বেশি বেশি ব্যবহার করা হয় যখন এর ভিতরগত জিনিস তার ব্যবহারকারীদেরকে উৎসাহিত করে, যখন ব্যবহারকারীরা উৎসাহী হয়ে তার বন্ধু-বান্ধবকেও জিনিসটি ব্যবহারের জন্য জানায়। ঠিক এভাবেই ফেসবুক ও পেপাল এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রতিবারই যখন একজন ব্যক্তি তার বন্ধুদের সাথে ব্যাপারটি শেয়ার করে বা অন্যকে টাকা পাঠায়, তখনই সে স্বাভাবিকভাবেই নতুন নতুন আরও লোককে এই নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত করে। এটা কেবল সস্তাই নয়—খুব দ্রুত কাজও করে। যদি একজন নতুন গ্রাহক অন্য এক বা একাধিক নতুন গ্রাহকের সাথে সেবাটি নিয়ে আলাপ করে এবং সে সেই সেবাটি ব্যবহার করে, তবেই ব্যাপারটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মতো চালু হয়ে যাবে।

একজন থেকে দুইজন, দুইজন থেকে চারজন, চারজন থেকে ... এভাবে অগণিত গ্রাহকের কাছে সেবাটি পৌঁছে যাবে। এটাকেই বলে সূচকীয় অগ্রগতি। এভাবে আপনার পণ্যও খুব সহজেই গ্রাহকের কাছে পৌঁছে যায় এবং দ্রুত পণ্যের প্রচার ও প্রসার ঘটে।

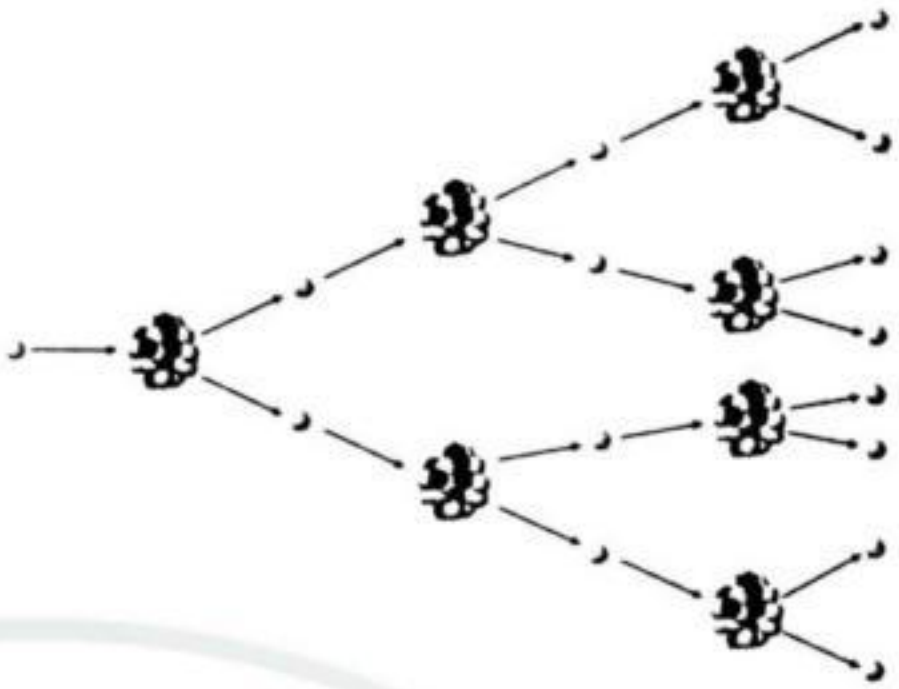

এই ধরনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় পণ্য বিক্রয়ের জন্য আপনাকে যতটা দ্রুত সম্ভব কাজ করতে হবে। ইউটিউবে কোনো একটি হাসির ভিডিও বা ইন্টারনেটের কোনো একটি সংবাদ ঠিক এভাবেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একজনের হয়তো একটি বিড়ালছানা দেখে বেশ চমৎকার লেগেছে। সে তার বন্ধুদের সাথে সেটি শেয়ার করলো। তার বন্ধুরা শেয়ার করলো অন্যদের সাথে। এভাবে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে ব্যাপারটি জনপ্রিয় হয়ে গেল। (বাংলাদেশের এমন একটি জনপ্রিয় ভিডিওর কথা বলি। গত ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তে পুলিশের নিষ্ঠুরতার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। এটা সেইদিন প্রথমআলো পত্রিকাতেও আসে। অবশ্য আপনি ভিডিওটি এখন খুঁজলেও পাবেন না। কারণ সেটি মুছে ফেলা হয়েছে। কেবল সংবাদ রয়ে গেছে। যাইহোক, মূল ব্যাপারটি হচ্ছে আপনার পণ্যের ব্যাপারে আপনার ব্যবহারকারী বা গ্রাহকরা যত বেশি আলোচনা করবে, পণ্যটিকে অন্যদের ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করবে তত বেশি আপনার পণ্যটি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। যেমন আমি নিজেও ইতোমধ্যে এমন একটি কাজ করেছি। ইউটিউবে আমি *সহজ জীবন* নামক একটি চ্যানেলের ভিডিও পছন্দ করি। সেখান থেকে কয়েকটি ভিডিও আমি আমার মাকে, খালাকে দেখিয়েছি। আমার গ্রাফিক্স ডিজাইনার যিনি বইয়ের প্রচ্ছদ ও প্রিন্টিং এর কাজে আমাকে সহযোগিতা করেন, তাকে দেখিয়েছি। আমার বন্ধুদের দেখিয়েছি। আর বহুজনকে এই ব্যাপারে বলেছি। এটা হচ্ছে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সূচকীয় অগ্রগতি। আপনিও ঠিক এমন কোনো পণ্য, ভিডিও বা সেবা সৃষ্টি করতে পারেন যা অন্যদের জন্য উপকারী সেবা সম্পন্ন করবে।)

প্রথমদিকে পেপালে আমাদের প্রাথমিক ব্যবহারকারী ছিল ২৪ জন। এই ২৪ জন আর অন্য কেউ নয়, বরং আমরা যে ২৪ জন পেপালে কাজ করতাম

তারাই। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বা দেওয়ালে পোস্টার ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন করাটা আমাদের জন্য অনেক বেশি ব্যয়বহুল ছিল। যাইহোক, অনেক চড়াই-উতরাই পার করার পর একটি পথ পেলাম। আমরা প্রস্তাব দিলাম—যেই পেপাল ব্যবহার করবে তাকে টাকা দিবো। আরও প্রস্তাব দিলোম যেই তার বন্ধুদেরকে পেপাল ব্যবহারের সুপারিশ করবে এবং যদি সেই বন্ধু পেপাল ব্যবহার করে তবে সুপারিশকারীকে টাকা দিবো। এতে করে অবশ্য আমাদেরকে প্রতিটি গ্রাহকের পিছনে ২০০ টাকা করে অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিদিন আমাদের গ্রাহক বৃদ্ধির সংখ্যা ৭% করে বাড়তে লাগলো। তার মানে প্রতি ১০ দিনে আমাদের গ্রাহক সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। এরপর মাত্র চার পাঁচ মাসের মধ্যে আমাদের গ্রাহক সংখ্যা হাজার-লাখের উপরে ছাড়িয়ে গেল। এতে করে পেপাল একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির জায়গায় পৌঁছে যায় এবং আমরা গ্রাহক সংগ্রহের জন্য প্রথমে যে অর্থ ব্যয় করেছিলাম তাও উঠে আসে।

যে ব্যক্তি বা কোম্পানি বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে প্রথম প্রথম ব্যবসা করে সেই সবচেয়ে ভালো করে। পেপালের ক্ষেত্রে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে গ্রাহক সংগ্রহ করিনি। আমাদের চেষ্টা ছিল সবচেয়ে মূল্যবান গ্রাহকদের প্রথমে সংগ্রহ করা। তখন বাজারজাত করার সবচেয়ে ভালো মাধ্যম ছিল ইমেল মার্কেটিং। এরপরেও যে পেপালই একমাত্র টাকা পাঠানোর মাধ্যম তা নয়। তখন বিদেশে যারা প্রবাসী ছিল, এমন লাখো মানুষ ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন দিয়ে তাদের প্রিয়জনের কাছে টাকা পাঠায়। যদিও পেপালের টাকা পাঠানোর ব্যাপারটি আরও সহজ-কেবল এক একাউন্ট থেকে আরেক একাউন্টে টাকা পাঠানো। তবুও আমাদের সেবাটি খুব বেশি ব্যবহার হতো না। আমাদের একটি ছোট্ট বাজার দরকার, যেখানের গ্রাহকরা অনেক টাকা-পয়সার লেনদেন করে। আমরা এই রকম একটি ছোট্ট কিন্তু উচ্চ লেনদেনকারী গ্রাহকদের বাজার পেলাম ই-বেতে *(ebay)*। ই-বেতে 'পাইকারি বিক্রেতা' নামক তাদের কিছু ব্যবসায়ী গ্রাহক আছে যারা ই-বের মাধ্যমে নিলামে পণ্য বিক্রয় করে। ই-বেতে এরকম 'পাইকারি বিক্রেতার' সংখ্যা ছিল ২০,০০০। তাদের অনেকেরই প্রতিদিন দুই-চারটি নিলাম থাকতোই। তারমানে প্রতিদিন নিয়মিত অর্থ লেনদেন হবে। ব্যস! আমরা আমাদের যথেষ্ট গ্রাহক পেয়ে গেলাম। তখন ই-বেতে অর্থ লেনদেন করাটা একটি বড় সমস্যা ছিল। যেহেতু পেপাল অর্থ লেনদেন করাটা সহজ ও নিরাপদ ছিল সেহেতু আমরা ইবেতে পুরোপুরি রাজত্ব করলাম।

বিপণনের সূচকীয় সূত্র

প্রতিটি ব্যবসারই একটি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি, একটি ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা থাকে। কিন্তু প্রতিটি ব্যবসার জন্য বিপণন ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই বিপণন ব্যবস্থা একটি সূচকীয় সূত্র মেনে চলে। কিন্তু অনেক উদ্যোক্তাই মনে করে কিছু বিক্রয়কর্মী নিয়োগ দিলেই হয়, কয়েকটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলাম, আর পণ্যের মোড়কটি একটু রঙচটা করে দিলাম, তাতেই পণ্য বিক্রয় হয়ে যাবে। আসলে কী তাই! বেশিরভাগ ব্যবসাতে দেখা যায় তাদের বিপণন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। পণ্য যে খারাপ তা নয়, কিন্তু একটি দুর্বল বিক্রয় ব্যবস্থাপনার জন্য প্রায়ই দেখা যায় পণ্য চলে না। আপনি যদি কেবল একটি ভালো বিক্রয় ব্যবস্থাপনার লাইন ধরতে পারেন তবে আপনার আর ব্যবসায় কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু আপনি যদি অনেকগুলোর দিকে হাত বাড়ান এবং কোনোটাই ধরতে না পারেন, তবে আপনি শেষ।

যারা আপনার গ্রাহক নয় তাদের কাছেও বিক্রয়ের চেষ্টা করুন

Audilua.com

আপনার কোম্পানি যে কেবল পণ্য বিক্রয় করবে তা নয়, এটাকে পণ্যের চেয়েও বেশি কিছু বিক্রয় করতে হবে। আপনার কোম্পানিকে আপনার কর্মচারী ও বিনিয়োগকারীদের কাছেও বিক্রয় করতে হবে। এটা কেবল টাকার ব্যাপার নয়। এটা সম্মান ও সুনাম সৃষ্টির মতো ব্যাপার। আর তাছাড়া প্রতিটি পণ্য বিক্রয়ের পিছনে মানুষের একটি বড় ভূমিকা থাকে। আপনি নিশ্চয় মানুষজনকে এমন কোনো কোম্পানি সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, 'এই কোম্পানিতে কাজ করাই একটি সৌভাগ্যের ব্যাপার।' তাদের ওপর বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রেও এটা ঘটে। এমন অনেক কোম্পানি আছে যেগুলোতে বিনিয়োগ করতে বিনিয়োগকারীরা মুখিয়ে থাকে। গোলমাল হবে, ঝামেলা হবে, এটা তো সব কোম্পানিতেই আছে। কিন্তু এগুলোর জন্য দায়ী কোম্পানির নিয়োগ পদ্ধতি। আবার কোম্পানির সুনাম ও সম্মান সৃষ্টিকারী যে কর্মচারীরা, তাদের ঠিকভাবে নিয়োগ করার জন্যও কোম্পানি দায়ী। অতএব দেখা যাচ্ছে, পণ্য ও কাজের আড়ালে, মঞ্চের পিছনে যেসব কর্মীরা কাজ করে, কীভাবে কাজ করে সেটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আপনার কোম্পানিকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরাও

একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সাধারণত কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়াররা বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলে। কারণ তারা এ ধরনের লোকজনকে বিশ্বাস করে না। অথবা বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাটিকেই অবিশ্বাস করে। এটাও কিন্তু একটি ভুল। আপনার যেমন দক্ষ একটি বিপণন ব্যবস্থা না থাকলে কেবল পণ্যের জোরে, পণ্যের মান ভালো থাকলেই পণ্য বিক্রয় হবে আশা করতে পারেন না, ঠিক তেমনি এটাও চিন্তা করবেন না যে, জনগণের সাথে একটি সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ছাড়াই লোকজন আপনার কোম্পানির প্রশংসা করবে। যদি আপনার একটি চমৎকার বিপণন ব্যবস্থাও থাকে তারপরেও বিজ্ঞাপন দরকার। বিজ্ঞাপনের কারণে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীরা ও কর্মচারীরা আগ্রহী হবে। এমন কোন সম্ভাব্য কর্মচারী যে নিজের চেষ্টায় আপনার কোম্পানি সম্পর্কে জানলো এবং এর সাথে যুক্ত হতে চায় তা অনেক বেশি মূল্যবান।

প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বিক্রয় করছে

বিপণন ব্যবস্থাপনা ও বিক্রয়কর্মী, এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যেগুলোতে আপনার নজর দেওয়া উচিত। অনেকে অবশ্য মনে করতে পারে যে, এই দুইটির আবার কী দরকার। বিশেষ করে কম্পিউটার ক্ষেত্রে যারা আছে তারা বিপণন ব্যবস্থাপনা ও বিক্রয়কর্মী এই দুইটিকেই এড়িয়ে চলে। আমরা সকলেই হয়তো চিন্তা করি বিক্রয়ের কলা কৌশলগুলো আমাদের ওপর খাটে না। আসলে কী তাই! প্রত্যেকের কাছেই কিছু না কিছু বিক্রয়ের জন্য আছে এবং সে অনবরত চেষ্টা করে যাচ্ছে তা বিক্রয়ের জন্য। আপনি একজন কর্মচারী হতে পারেন, প্রতিষ্ঠাতা হতে পারেন অথবা হতে পারেন একজন বিনিয়োগকারী—কোনো ব্যাপার না। আপনি কিছু না কিছু বিক্রয় করে চলছেন। যদি আপনার কোম্পানি মানে আপনি ও আপনার কম্পিউটারও হয় তবুও আপনার জন্যও এটা সত্য। চারদিক ঘুরে দেখুন। আর যদি কোনো বিক্রয়কর্মী না দেখেন তবে মনে রাখবেন—অন্য কেউ নয় আপনি নিজেই বিক্রয়কর্মী।

বারো

মানুষ ও যন্ত্র

একটি কোম্পানি যখন উন্নতি করার মাধ্যমে স্থিতিশীল হয় তখন তা আরও বড় বড় উন্নতির দিকে নিশ্চিন্ত মনে লক্ষ্য স্থির করতে পারে। আমরা তথ্য প্রযুক্তির কথা ধরতে পারি। তথ্য প্রযুক্তি এত দ্রুত উন্নতি করেছে যে, এটা প্রযুক্তির সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। আজকে পৃথিবীর ১৫০ কোটি মানুষ বিশ্বের যেকোনো তথ্য খুঁজে পেতে সক্ষম, তাও আবার ছোট্ট একটি যন্ত্রের সাহায্যে যা অনায়াসে একজনের পকেটে রাখা সম্ভব। আজকে প্রত্যেকের হাতে রয়েছে স্মার্টফোন, যার হিসাব নিকাশ করার দক্ষতা চাঁদে যাওয়ার সময় নভোচারীরা যে কম্পিউটার ব্যবহার করেছে তারচেয়ে হাজার গুণ বেশি। আর গর্ডন মুরের সূত্র যদি সত্যি হয় তবে আগামীর কম্পিউটার আর শক্তিশালী হবে। (গর্ডন মুরের সূত্র হচ্ছে প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটে ট্রানজিস্টরের সংখ্যা দ্বিগুণ হবে।)

কম্পিউটার ইতিমধ্যে অনেক কাজকর্মে মানুষকে ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৯৭ সালে আইবিএমের ডিপ ব্লু (*IBM's Deep Blue*) নামক কম্পিউটার বিশ্ববিখ্যাত দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভকে (*Garry Kasparov*) পরাজিত করেছে। ২০১১ সালে আইবিএমের ওয়াটসন (*Watson*) কম্পিউটার, যা প্রশ্ন-উত্তর দিতে সক্ষম, জেপারডি (*Jeopardy*) নামক একটি প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠানে খ্যাতিমান কেন জেনিংসকে হারিয়ে দেয়। আর গুগলের স্বনিয়ন্ত্রিত গাড়ি তো ক্যালিফোর্নিয়ার রাস্তাতে চলছেই। এর ফলে অবশ্য গাড়ি চালকরা তাদের চাকরি যাওয়ার ভয়ে আতংকিত। এটা নিয়ে গার্ডিয়ান (*Guardian*) পত্রিকা একটি জরিপ করে (যার বেশিরভাগ ভোট প্রদানকারী ছিল ট্যাক্সি চালকরা) এবং সংবাদ ছাপায় যে, স্বনিয়ন্ত্রিত গাড়ির কারণে নতুন করে বেকারত্ব সৃষ্টি হবে।

সবাই এটাই আশা করছে ভবিষ্যতে কম্পিউটার আরও অনেক অনেক

কাজ করবে—এখন কম্পিউটার আসলেই এত এত কাজ করছে যে, কিছু কিছু লোক দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে যে, আগামী ৩০ বছর পর করার জন্য মানুষের কী কাজ থাকবে? নতুন নতুন উদ্যোগে বিনিয়োগকারী মার্ক আনদরিসেন তো বলেই দিয়েছেন, 'সফটওয়্যার বিশ্বকে কুরে কুরে খাচ্ছে।' আরেকজন বিনিয়োগকারী অ্যান্ডি কেসলের বলছেন, উৎপাদন বাড়ানোর সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে 'মানুষকে বাদ দেওয়া'। ফোর্বস (*Forbes*) সাময়িকী তো আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে তাদের গ্রাহকদের প্রশ্ন করে বসলো, 'একটি যন্ত্র কি আপনাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে?'

ভবিষ্যদ্‌বাদীরা এই প্রশ্নের উত্তর দেয় 'হ্যাঁ' বলে। অতীতবাদীরা এতই উদ্বিগ্ন যে, তা কম্পিউটার প্রযুক্তির গতিরোধ করতে সবকিছু করবে। (অতীতবাদী বলতে, যারা কেবল অতীত নিয়ে পড়ে থাকে।) আমরা যদি উভয় দিকে গভীরভাবে তাকাই তবে দেখবো যে উভয়েই চিন্তা করে যে উন্নত কম্পিউটার মানব শ্রমিকদের হটিয়ে দিবে। কিন্তু এই চিন্তাটাই ভুল : কম্পিউটার হচ্ছে মানুষের অসম্পূর্ণ কাজ পূর্ণ করার জন্য; নাকি মানুষকে রদবদল করার জন্য।

রদবদল করার জন্য
বনাম
অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্য

প্রায় পনেরো বছর আগে আমেরিকার শ্রমিকরা উদ্বিগ্ন ছিল যে, মেক্সিকোর কম বেতনধারী শ্রমিকরা তাদের বদলে কাজ করবে। এটা ঘটা সম্ভব ছিল। কারণ মানুষ মানুষকে হটাতে পারে, একে অন্যের পরিবর্তে কাজ করতে পারে। আমেরিকানরা প্রযুক্তিকে ভয় পায়। কারণ তারা একে বিশ্বায়ন হিসেবে দেখছে। তাদের মতে লোকজন চাকরির জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে, কিন্তু কম্পিউটার কারও সাথেই প্রতিযোগিতা করে না।

বিশ্বায়ন মানেই রদবদল

যখন জর্জ এইচ. ডব্লিউ. বুশ ও বিল ক্লিনটন মুক্তবাজার অর্থনীতি নিয়ে আশার বাণী শোনাচ্ছিলেন (জর্জ এইচ. ডব্লিউ. বুশ যুক্তরাষ্ট্রের ৪১তম রাষ্ট্রপতি, দায়িত্বকাল ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ সাল। তিনি জর্জ ডব্লিউ. বুশের পিতা। জর্জ

ডব্লিউ. বুশ যুক্তরাষ্ট্রের ৪৩তম রাষ্ট্রপতি, দায়িত্বকাল ২০০১ থেকে ২০০৯ সাল।) তখন খ্যাতিমান ব্যবসায়ী ও সাবেক রাজনীতিবিদ রস পেরেট মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে যে খারাপ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে তা সম্পর্কে সতর্ক করেন। ব্যবসায় মুনাফা তখনই বেশি হয় যখন চাহিদা ও যোগানের মধ্যে তফাত থাকে। কিন্তু বিশ্ব শ্রমবাজার সব জায়গায় এক নয়; বরং বেশিরভাগ জায়গায় শ্রমিক আছে তবে শ্রমের মূল্য অত্যধিক কম।

লোকজন যে কেবল শ্রম দিতে গিয়ে প্রতিযোগিতা করে তাই নয়; তারা আবার ঐ উৎসই চায় যার দ্বারা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে আমেরিকার গ্রাহকরা চীন থেকে কম দামে খেলনা ও কাপড় কিনতে পারছে, আবার অন্যদিকে নতুন নতুন চীনা গাড়ির জন্য উচ্চদামে জ্বালানি ক্রয় করতে হচ্ছে। এখন লোকজন খাবার খাবে, বসবাসের জন্য বাসস্থান দরকার এবং চলাচলের জন্য যানবাহন ব্যবহার করবে, এটা তো স্বাভাবিক। এই আকাঙ্ক্ষা কখনো কমবে না। বিশ্বায়ন যত বাড়বে তাদের এই চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে।

প্রযুক্তি মানে অসম্পূর্ণতা দূরীকরণ

একজন মানব শ্রমিকের সাথে আরেকজন মানব শ্রমিকের প্রতিযোগিতা হলে শ্রমের মূল্য হ্রাস পায়। এখন একটু চিন্তা করুন তো একজন মানব শ্রমিকের বিপরীতে কম্পিউটার থাকলে কী হবে? এখন যদি আমরা যোগানের দিক থেকে চিন্তা করি তবে দেখবো যে দুইটি শ্রমজীবী মানুষ একে অপর থেকে ভিন্ন, কিন্তু কম্পিউটার ও মানুষ তত্ত্বগতভাবেই একে অপর থেকে ভিন্ন। মানুষ ও যন্ত্র প্রকৃতগতভাবেই একে অপর থেকে ভিন্ন। মানুষের মধ্যে ইচ্ছা বলে একটি জিনিস আছে—আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিকল্পনা সৃষ্টি করতে পারি এবং জটিল পরিস্থিতিতেও সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। আমরা অবশ্য পাহাড়সম তথ্য থেকে কিছু বের করতে বা প্রক্রিয়াজাত করতে ততটা দক্ষ নই। আর কম্পিউটার ঠিক এই ব্যাপারটির বিপরীত। কম্পিউটার পাহাড়সম তথ্য থেকে কিছু বের করতে বা অনুসন্ধান করতে খুবই দক্ষ, কিন্তু এটা আবার মৌলিক কিছু বিচার বিবেচনা করতে অপারগ যা যেকোনো মানুষের জন্যই সহজসাধ্য।

একটি উদাহরণ দিলে সহজেই এই ব্যাপারটি বুঝবেন। গুগলের একটি প্রকল্প আছে। মানুষের পরিবর্তে কম্পিউটার নামক এই প্রকল্পটি ২০১২ সালে বেশ সাড়া ফেলে। তাদের একটি সুপারকম্পিউটার ইউটিউবের এক কোটি ভিডিও

দেখার পর ৭৫% ক্ষেত্রে ১টি বিড়ালকে বিড়াল বলে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। এটা নিশ্চয় অসাধারণ একটি ব্যাপার। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে, একটি চার বছরের বাচ্চাও যখন এই কাজটি করতে পারে এবং অনায়াসে একটি বিড়ালকে বিড়াল বলে চিহ্নিত করতে সক্ষম, তখন আসলে ব্যাপারটি কি অসাধারণ থাকে? একদিকে একটি কমদামী ল্যাপটপও অনেক বড় বড় গণিতবিদকে হারিয়ে দিতে পারে, কিন্তু অন্যদিকে একটি সুপারকম্পিউটার যার সিপিইউ'র সংখ্যা ১৬,০০০ সেও একটি শিশুর কাছে পরাজিত। তাহলে আপনি তো বলতেই পারেন যে মানুষ ও কম্পিউটার একে অপরের থেকে শক্তিশালী এই প্রশ্নই তো আসবে না—কারণ তাদের ধরনই তো ভিন্ন।

	যোগান (শ্রমের জন্য)	চাহিদা (সম্পদের জন্য)
বিশ্বায়ন (মানুষের জন্য)	বিশ্ব যা আছে তাই থাকবে ফলে প্রতিযোগিতা বাড়বে	কোম্পানিগুলোর মধ্যে বাড়বে প্রতিযোগিতা
প্রযুক্তি (উন্নত কম্পিউটার)	অসম্পূর্ণতা দূর করবে	যন্ত্রের কোন চাহিদা নেই : ফলে মানুষ সব ধরনের সুবিধা ভোগ করবে

Audilua.com

আসলে মানুষ ও যন্ত্রকে এক করে দেখা হয় তাদের কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে। একটি কাজ মানুষকে দিয়ে করালে যে ফলাফল পাওয়া যায়, সেই একই কাজ কম্পিউটার করলে হয়তো আরও বেশি ফলাফল পাওয়া যায়। এদিক থেকে কম্পিউটার এগিয়ে আছে। কিন্তু কম্পিউটার দিয়ে তো ব্যবসা হয় না। ব্যবসা হয় গরু, ছাগল প্রভৃতি বিনিময়যোগ্য জিনিস দিয়ে। ঠিক এটাই হচ্ছে আমাদের আলোচ্য বিষয় : কম্পিউটার মূলত সহায়তাকারী একটি যন্ত্র, নাকি প্রতিপক্ষ।

চাহিদার দিক থেকে দেখলে পার্থক্যটি আরও গভীর। শিল্প উন্নত দেশের দিকে যদি আমরা দেখি তবে দেখবো যে, ভালো কোনো খাবার বা জাকজঁমকপূর্ণ কোনো বাড়ির চেয়ে কেউ কম্পিউটারের প্রতি এতটা আগ্রহী নয়। কম্পিউটার

চালানোর জন্য অল্পকিছু বিদ্যুৎ হলেই যথেষ্ট। এমনকি এটা যে আপনার কাছে বিদ্যুৎ দাবি করছে তাও নয়। আপনি চাইলে কম্পিউটার চালালেন, নইলে নয়। এটা আমাদের কাজকর্মে সহায়তাকারী একটি যন্ত্র। আর মানুষের ক্ষেত্রে, বিশ্বায়ন যত বাড়বে প্রতিযোগিতা তত বাড়বে, শ্রমের মূল্য তত কমবে। তাই আমাদের দরকার নতুন নতুন প্রযুক্তি, অভিনব কিছু। অতত্রব এটা সহজেই বলা যায় যে, কম্পিউটার যত উন্নত হবে এটা মানুষকে রদবদল করবে না; বরং মানুষের অসসম্পূর্ণতাকে দূর করবে।

যেসব ব্যবসা মানুষের অসম্পূর্ণতা দূর করবে

কম্পিউটার ও মানুষের মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা আছে, এটা যে ছোটখাটো একটি ব্যাপার, তা নয়। এখান থেকে বড় একটি ব্যবসাও দাঁড় করানো সম্ভব। পেপালে থাকাকালীন আমি যে সমস্যা ও সম্ভাবনার দেখা পেয়েছি তাই বর্ণনা করছি। ২০০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমরা যদিও ডটকম ধস থেকে বেঁচে গেছি তবুও আমাদের সমস্যা শেষ হয়ে যায়নি। আমরা নতুন একটি সমস্যার মুখোমুখি হলাম। প্রতিমাসে আমরা ৮৪ কোটি টাকার আর্থিক জালিয়াতির সম্মুখীন হচ্ছি। যেহেতু প্রতি মিনিটে আমাদের শত শত বা হাজার হাজার লেনদেন হচ্ছে সেহেতু এগুলো সব তো আর পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। প্রতিটি লেনদেন পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়—অনেক মানুষ নিয়ে কাজ করলেও তা হবে না।

তাই আমরা অন্যান্য প্রকৌশলীরা যা করে তাই করলাম—পর্যালোচনার পুরো ব্যাপারটি স্বয়ংক্রিয় করার চেষ্টা করলাম। ম্যাক্স লেভিচিন একদল মেধাবী গণিতবিদদের নিয়ে আর্থিক জালিয়াতির অনুসন্ধানে নামলো। তারপর তারা সেখান থেকে যা শিখলো তার সহায়তা নিয়ে একটি সফটওয়্যার বানালো। সফটওয়্যারটি জালিয়াতি ধরতে সক্ষম এবং কোনো ভুয়া লেনদেনের আভাস পেলে তা বন্ধ করতেও সক্ষম। কিন্তু সফটওয়্যারটি চালু করার দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা টের পেলাম যে, চোরগুলো এখন কৌশল পরিবর্তন করে ফেলেছে। আমরা এমন এক দুর্বৃত্তের সাথে লড়াই করছি যে কিনা সমস্যায় পড়ার সাথে সাথে কৌশল পরিবর্তন করে আঘাত করতে সক্ষম। কিন্তু আমাদের সফটওয়্যারের তো এমন কোনো অভিযোজন ক্ষমতা নেই যে, সমস্যায় পড়ার সাথে সাথে কৌশল পরিবর্তন করে কাজ করবে।

যদিও প্রতারকরা আমাদের স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারকে বোকা বানাতে পারে, কিন্তু আমাদেরকে নয়। আমরা দেখলাম আমাদের যে বিশ্লেষকরা আছেন প্রতারকরা তাদেরকে বোকা বানাতে পারছে না। তাই ম্যাক্স ও তার প্রকৌশলী দল মিলে নতুন করে সফটওয়্যার লিখলো, যা হাইব্রিড ধরনের–মানুষ ও কম্পিউটার উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত। কম্পিউটার সেই লেনদেনগুলোকে দেখাবে যেগুলোতে জালিয়াতির আভাস আছে। আর মানব বিশ্লেষকরা সেই লেনদেনগুলো দেখে সিদ্ধান্ত দিবে যে, লেনদেনগুলো ঠিক আছে কিনা। এই হাইব্রিড পদ্ধতিটি চমৎকার কাজ করলো। এর প্রতি আমরা ধন্য। আমরা এর নাম দিয়েছি '*ইগর*' বা '*Igor*'। রাশিয়ান এক বড় প্রতারককে ধরার পর (যে দাবি করেছিল তাকে আমরা কখনো ধরতে পারবো না) আমরা ২০০২ সালে প্রথম মুনাফা করলাম। এর আগের বছর আমরা ২৪০ কোটি টাকা লস দিয়েছিলাম। এরপর এফবিআই (আইন প্রয়োগকারী সংস্থা) ইগর ব্যবহার করার প্রতি তাদের আগ্রহ প্রকাশ করলো। তারা ইগর ব্যবহার করে আর্থিক জালিয়াতি ধরতে আগ্রহী। আর ম্যাক্সও ব্যাপারটি নিয়ে বেশ উৎসাহী ছিল। সবার কাছে ম্যাক্স 'ইন্টারনেটের শার্লক হোমস' বলে পরিচিত হয়ে উঠলো।

তো যাইহোক, এই রকম মানুষ ও যন্ত্র সমন্বিত প্রচেষ্টায় পেপাল ব্যবসায় টিকে রইল। এতে করে হাজারো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করতে সক্ষম হলো। এগুলোর কিছুই হতো না যদি-না আমরা মানুষ-যন্ত্রে সমন্বিত এমন একটি সমাধান বের করতে পারতাম—যদি বেশিরভাগ লোকজন এই ব্যাপারে তেমন কিছুই জানে না।

আমরা ২০০২ সালে পেপাল বিক্রয় করে দিই। এরপর থেকে আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, কীভাবে মানুষ ও কম্পিউটারের এই সমন্বিত প্রচেষ্টাকে ব্যবসায় পরিণত করা যায়, কীভাবে অন্য কোনো মূল্যবান ব্যবসা সৃষ্টি করা যায়। এরপরের বছর আমি আমার স্ট্যানফোর্ডের বন্ধু অ্যালেক্স কার্প ও একজন সফটওয়্যার প্রকৌশলী স্টিফেন কোহেনকে সঙ্গে করে একটি নতুন উদ্যোগ নিলাম। আমাদের উদ্যোগটি ছিল : আমরা পেপালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে এমন একটি মানুষ ও কম্পিউটার সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করবো যা সন্ত্রাসী

কর্মকাণ্ড ও আর্থিক জালিয়াতির মতো ঘটনা চিহ্নিত করতে সক্ষম। আমরা ইতিমধ্যে জানতাম যে, এফবিআই এমন একটি ব্যবস্থার ব্যাপারে আগ্রহী। তাই আমরা ২০০৪ সালে পালানটির নামক একটি সফটওয়্যার কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করলাম যা লোকজনকে অনেক তথ্যের ভিতর থেকে অনুসন্ধান করে ঠিক তথ্যটি উদ্ধার করে দেয়। কেল্লাফতে! ২০০৪ সালে পালানটির কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এর দাম গিয়ে দাঁড়ায় ৮ হাজার ৪০০ কোটি টাকায়। ফোর্বস ম্যাগাজিন পালানটির সফটওয়্যারকে 'ঘাতক অ্যাপ' বলে ঘোষণা করে। কারণ একটি গুজব ওঠে যে, ওসামা বিন লাদেনকে খুঁজে বের করতে এই সফটওয়্যার সহায়তা করেছে।

লাদেনকে নিয়ে সরকারি সেই কার্যক্রমে কী ঘটেছিল তা অবশ্য আমরা জানি না। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে—না কেবল মানুষের বুদ্ধিমত্তা, না কেবল কম্পিউটারের বুদ্ধিমত্তা আমাদেরকে নিরাপদ রাখতে পারে। আমেরিকার দুইটি বড় গোয়েন্দা সংস্থা পরস্পর বিপরীতমুখী কৌশলে কাজ করে : কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) গুরুত্ব দেয় মানুষের ওপর, আর জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা (এনএসএ) প্রাধান্য দেয় কম্পিউটারের ওপর। সিআইএ বিশ্লেষকদের কাছে এত বেশি তথ্য থাকে যে, সেখান থেকে ঠিক তথ্যটি বের করাটি কঠিন হয়ে পড়ে। এনএসএ অবশ্য পাহাড়সম তথ্য বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। কিন্তু কম্পিউটার একা কখনো একটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সনাক্ত করতে সক্ষম নয়। আমাদের কোম্পানি, পালানটিরের কাজ হচ্ছে এই দুই বিপরীতমুখী কৌশলকে এক করা। আমাদের সফটওয়্যার অংশের কাজ হচ্ছে সরকার একে যে তথ্যাবলি দেয় তা বিশ্লেষণ করা—ফোন রেকর্ডস, ব্যাংকের হিসাব বিবরণীসহ প্রভৃতি তথ্যাবলি। এতে করে কোনো ধরনের সন্দেহজনক অবস্থা দেখলে সফটওয়্যারটি লালবাতি জ্বালিয়ে আমাদের সচেতন করে। এর পাশাপাশি আছে মানুষ নিয়ে সৃষ্ট কর্মীদল। তারা বাকি কাজটুকু সম্পন্ন করে।

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করার পাশাপাশি পালানটির সফটওয়্যারটি আরও অনেক কাজ করে। যেমন আফগানিস্তানের কোথায় কোথায় বোমা বা বিস্ফোরক দ্রব্য থাকতে পারে তাও খুঁজে বের করতে সক্ষম। সম্প্রতি সফটওয়্যারটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় পর্নগ্রাফি দলটিকে ধরতে সহায়তা করেছে।

কেন্দ্রীয় রোগ নিরাময় সংস্থার সাথে কাজ করছে। লাখো সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের আর্থিক জালিয়াতি বন্ধে বড় ভূমিকা রাখছে।

সফটওয়্যারের ক্রমবর্ধমান উন্নতিই এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবে মানুষরূপী যেসব বিশ্লেষক, প্রোগ্রামার, বিজ্ঞানী ও আর্থিকক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা রয়েছে তাদের সহায়তা ছাড়া এটা কখনো সম্ভব হতো না। তাদের সহযোগিতা ছাড়া তো সফটওয়্যার কোনো কাজেরই না।

আজকাল বিভিন্ন পেশায় যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষ তাদের কথা একবার চিন্তা করুন। তারা কীভাবে তাদের এই দক্ষতাকে অর্জন করেছেন? ধরুন একজন আইনজীবী। তিনি নিজ ক্ষেত্রে একজন দক্ষ ব্যক্তি। তিনি বিচারকের দিকটিও বিবেচনা করেন, আবার মক্কেলের ব্যাপারটিও বোঝেন। তিনি যখন বিচারকের সাথে কথা বলেন তখন এক সুর, আবার মক্কেলের সাথে আলাপকালে ভিন্ন সুর। আবার চিকিৎসকদের দেখুন। তারা এমন রোগীদের সাথে আলাপ করে যারা রোগটি সম্পর্কে কিছুই জানে না। দক্ষ শিক্ষকদের মধ্যেও এই গুণাবলি বিদ্যমান। তারা বিভিন্ন ধরনের ছাত্রদের সাথে কথা বলেন এবং প্রত্যেককে তার নিজ নিজ গুণাবলিতে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠতে সহায়তা করেন। হয়তো কম্পিউটার এই কাজগুলোর কিছু কিছু করতে পারে, কিন্তু এটা সমন্বয় করতে জানে না। ভবিষ্যতে যখন আর উন্নত প্রযুক্তি আসবে তখন তা আইনবিদ, চিকিৎসক বা শিক্ষকদের সরিয়ে দিবে না; বরং তাদেরকে আরও দক্ষভাবে কাজ করতে সহায়তা করবে।

কর্মীনিয়োগ নিয়ে লিংকডইন (*LinkedIn*) ঠিক এই কাজটিই করেছে। ২০০৩ সালে লিংকডইন (*LinkedIn*) যখন চালু হলো তখন তারা যে কেবল কার্মচারীদেরকে চাপমুক্ত করার জন্য, নতুন চাকরি খোঁজার জন্য কোম্পানি খুলেছে তা নয়। তারা এমন কোন সফটওয়্যারও বানায়নি যে তা কর্মচারীদের হঠাৎ পরিবর্তন করে ফেলবে। আসলে কর্মীনিয়োগের এক অংশ হচ্ছে গোয়েন্দাগিরি—একজন যা তথ্য দেয় তা সত্য কিনা, তা আমার কোম্পানির কাজের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর আরেকটি অংশ হচ্ছে বিক্রয়, মানুষকে জানানো এবং অন্যদেরকে আপনার সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া। লিংকডইনের (*LinkedIn*) প্রায় ৯৭% নিয়োগকৃত কর্মীরা লিংকডইন ব্যবহার করে। তারা তাদের পেশা সম্পৃক্ত লোকজনের সাথে যুক্ত

থাকার জন্য এটাকে একটি অসাধারণ মাধ্যম হিসেবে দেখে। সারাবিশ্বে লাখো লোক তাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য লিংকডইন ব্যবহার করে। যদি লিংকডইন প্রযুক্তি দিয়ে কর্মীদের সরিয়ে দিতে চাইতো তবে এটা আর কোনদিন একটি সফল ব্যবসায় পরিণত হতে পারতো না।

কম্পিউটার বিজ্ঞানের মূলভিত্তি

কোনকিছুর অসম্পূর্ণতা দূর করাও কিন্তু একটি বিরাট কাজ। কিন্তু আমরা অসম্পূর্ণতা দূর করার যে সুযোগ আছে বা কোনকিছুর অসম্পূর্ণতা দূর করেও যে বিরাট এক ব্যবসার সৃষ্টি করা সম্ভব তা কেন বুঝি না? বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করি। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা কী করে? তাদের প্রশিক্ষণটিই এমন ভাবে করা যাতে তারা এমন কিছু সৃষ্টি করে যা মানুষের কষ্ট লাঘব করবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গবেষকরা এই বিষয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে। গবেষকদের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করা। গবেষণাপত্র প্রকাশ করাটা একটি সম্মানেরও বিষয়। আর কম্পিউটার গবেষকদের মূল কাজ হচ্ছে মানুষের পরিশ্রম হ্রাস করা এবং এমন এমন প্রোগ্রাম রচনা করা যা কাজকর্মকে আরও দ্রুত ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করবে।

কম্পিউটার বিজ্ঞানের ক্রমধারাটি একটু বিবেচনা করুন। 'যন্ত্রবিদ্যা' বা যন্ত্রকে কাজ করতে শেখানোটি পূর্বে একটি কল্পনার বিষয় ছিল। সেখান থেকে আমরা আজকে অনেকদূর এগিয়ে এসেছি। আজকে আমরা বিশ্বাস করি যে, কম্পিউটার নামক এই যন্ত্রটিকে যেকোনো কাজ শেখানো সম্ভব। (এটা যে একটি যন্ত্র তাও অনেক সময় ভুলে যাই।) একে যত তথ্য দেওয়া যায় এটা তত বেশি দক্ষভাবে কাজ করতে সক্ষম। আপনারা যারা গুগল অথবা ইউটিউব ব্যবহার করেছেন, প্রায়ই দেখেন যে, তারা যা সার্চ করে ঠিক সেই সম্পর্কিত অন্যান্য বাক্য, শব্দ বা তথ্যও দেখায়। (ধরুন আপনি গুগলে বাংলায় 'অনুপ্রেরণা' শব্দটি লিখে সার্চ দিলেন। তারপর সার্চ বক্সে অনুপ্রেরণা শব্দটির ওপর ক্লিক করলে অনুপ্রেরণা কী, অনুপ্রেরণামূলক উক্তি, অনুপ্রেরণার গল্প প্রভৃতির পরামর্শ আসে।) এই তথ্য কোথা থেকে দেখায়? এটা হচ্ছে আপনি পূর্বে যা খোঁজ করেছিলেন অথবা এই একই শব্দে অন্যরা যা খোঁজ করে তার পরামর্শ দেখায়। আপনি যত

সময় এখানে থাকবেন তাদের পরামর্শগুলো আপনার জন্য তত বেশি যথার্থ হবে। গুগল ট্রান্সলেটর বা অনুবাদকও ঠিক একই কাজ করে। যদিও এটা ৮০টি ভাষায় অনুবাদ করতে সক্ষম, তার মানে এই নয় যে, সফটওয়্যারটি মানুষের ভাষা বোঝে; বরঞ্চ এটা পাহাড়সম তথ্যকে বিশ্লেষণ করে, পরিসংখ্যান দেখে সবচেয়ে কাছাকাছি শব্দটির প্রস্তাব করতে পারে।

বর্তমানে আরেকটি বহুল প্রচারিত শব্দ হচ্ছে 'বিগ ডাটা'। আজকাল বহু কোম্পানিই তথ্য চায়, অনেক তথ্য। অনেকে মনে করে যত তথ্য থাকবে তত বেশি সুবিধা। (বিগ ডাটা মানে পাহাড়সম তথ্য। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটি ৪০ লাখ মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে। ফেসবুক এই বিশাল বড় জনগোষ্ঠীর তথ্য সংরক্ষণ করে রাখে। এই পাহাড়সম তথ্যকেই বলা হয় বিগ ডাটা। যদি কোনো কোম্পানি নতুন কোনো পণ্য নিয়ে বাংলাদেশে ব্যবসা করতে চায় তবে সে এই তথ্য বিশ্লেষণ করে পণ্য চলবে কি চলবে না, কী পরিমাণ পণ্য চলতে পারে এবং দাম কত হলে গ্রাহক ক্রয় করবে? এই ধরনের নানান জিনিস সম্পর্কে অবহিত হয়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিবে। দেখা যায় এমন একটি সিদ্ধান্তের ওপরই হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। তাই পণ্য চলবে কি চলবে না, এই বাজার বিশ্লেষণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিগ ডাটা আসলে কোনো কাজেরই না। কম্পিউটার হয়তো মানুষকে কৌশলে প্রভাবিত করতে পারে, কিন্তু এটা বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করতে পারে না অথবা মানুষের বিচিত্র আচরণের কোন ব্যাখ্যাও দিতে পারে না। এজন্যই দরকার মানব বিশ্লেষক।)

বিগ ডাটার মতো বিপুল পরিমাণ তথ্য দেখে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। কম্পিউটার একা যেসব কাজ করে সেসব ছোটখাটো কাজ দেখে আমরা হতবাক। কিন্তু আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, কম্পিউটারের সহায়তায় মানুষ কত অসাধ্য সাধন করেছে। ওয়াটসন, ডিপ ব্লু নামক প্রভৃতি সুপার কম্পিউটারের এলগরিদম দেখে অবাক হওয়াই যায়, কিন্তু ভবিষ্যতে যেসব বড় বড় মূল্যবান কোম্পানি আসবে তারা কেবল কম্পিউটার দিয়েই বিশ্ব-সমস্যার সমাধান করবে না। বরঞ্চ তাদের প্রশ্ন হবে : *মানুষের কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান কীভাবে কম্পিউটারের সহায়তায় সমাধান করা যায়?*

অধিকতর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কম্পিউটার :

বন্ধু নাকি শত্রু?

ভবিষ্যতের কম্পিউটার আসলে কেমন হবে তা বলা যাচ্ছে না। যদিও আমরা স্ত্রি, অ্যালেক্স, করটানা ও ওয়াটসনের নাম শুনেছি (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হিসেবে) তবুও আমরা বলতে পারছি না এরপর কী হবে। কম্পিউটার যখন সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে তখন হয়তো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে, কেন তারা আমাদের অধীনে থাকবে।

এদিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কম্পিউটারগুলো মানুষকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুতে ছাড়িয়ে যাবে। এখন এই চিন্তা নিয়ে যদি সামনে এগিয়ে যাই তবে ভবিষ্যৎ অবশ্যই শঙ্কাযুক্ত। এরকম ভবিষ্যৎ চিন্তা করা আমাদের জন্য অস্বস্তিকর যে, ভবিষ্যতে শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি মানবজাতিকে রক্ষা করবে নাকি ধ্বংস করবে। প্রযুক্তি আসলে কেন? আমাদের আশা হচ্ছে প্রযুক্তি আমাদেরকে প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ দিবে, আমাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করবে এবং আমাদের জীবন ধারণ সম্পর্কিত সমস্যা হ্রাস করবে। কিন্তু শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যদি মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হয় তবে এটা কি আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে? শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আসলে একটি লটারির টিকেটের মতো : যদি আপনি জেতেন তবে আপনি স্বর্গ পাবেন, আর যদি হারেন তবে ধ্বংস অনিবার্য।

কিন্তু শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আসলে একটি নেতিবাচক রহস্যের চেয়ে অনেক বড় একটি ইতিবাচক সম্ভাবনা। আর তাছাড়া এটা যে খুব তাড়াতাড়ি ঘটবে তারও সম্ভাবনা নেই। এটা হতে হতে ত্রয়োবিংশ শতাব্দী লাগবে। তখনকার জন্য এটা একটি চিন্তার বিষয় হতে পারে। কিন্তু অদেখা কোন ভয়ের কারণে আমরা আমাদের আজকের নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারি না। লুডাইটিরা ছিল উনিশ শতকের একদল বিদ্রোহী শ্রমিক। তারা পোশাক শিল্পে কাজ করতো। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, যন্ত্র দ্বারা কাজ করা হলে তাদের আর

দরকার হবে না। তাই তারা শিল্প কারখানায় সব ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। লুডাইটিদের মতো অনেকেই নতুন নতুন প্রযুক্তিকে ভয় করে। কিন্তু প্রযুক্তি মানুষকে বাদ দেওয়ার জন্য নয়; বরং মানুষের গুণাবলিকে আরও সমৃদ্ধ করতে সৃষ্টি করা হয়। লুডাইটিদের মতামত হয়তো কম্পিউটার মানুষকে হটিয়ে দিবে। হয়তো হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। এই দুইটি অবস্থানই খুব চরম পর্যায়ের। কিন্তু এগুলোই যে হতে হবে তাও নয়। এই দুইয়ের মাঝেও জায়গা আছে। যেখানে বিশ্বকে আরও উন্নত করতে, আরও সুন্দর স্থানে পরিণত করার বিরাট সুযোগ আছে।

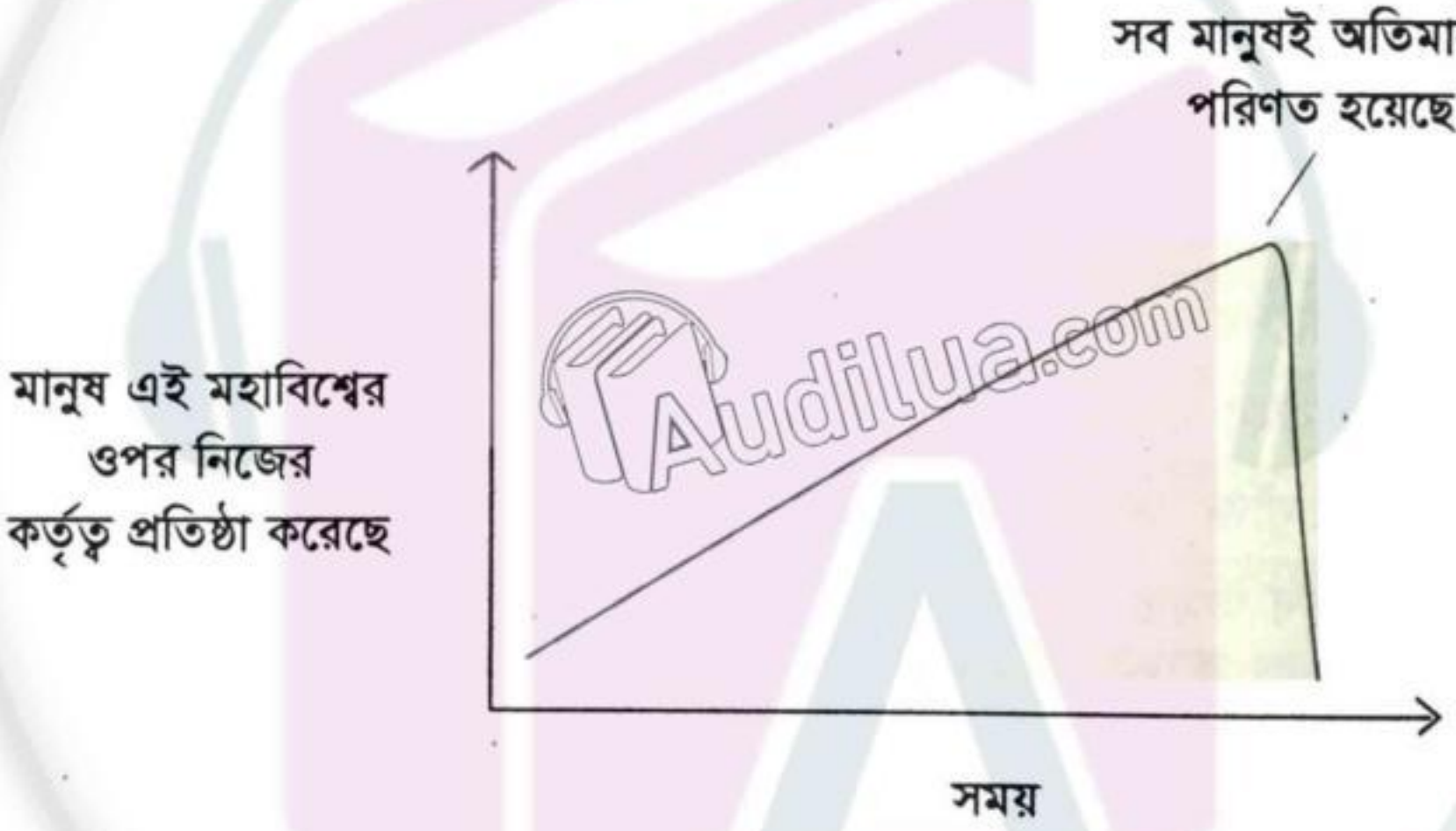

আমরা যত বেশি নতুন নতুন পথে কম্পিউটারকে ব্যবহার করবো, আমরা তত বেশি সামনে এগিয়ে যাবো। কম্পিউটার যে আমাদেরকে কেবল আরও দক্ষভাবে কাজ করতে সহায়তা করবে তাই নয়, আমরা পূর্বে যা কল্পনাও করিনি এমন কাজ সাধন করতেও সহযোগিতা করবে।

তেরো

সবুজ প্রযুক্তি বা নবায়নযোগ্য প্রযুক্তি

একবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সকলেই এই বিষয়ে একমত ছিল যে, প্রযুক্তির পরবর্তী বড় ধাপ হবে নবায়নযোগ্য প্রযুক্তি, পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্প। আর এটার দরকারও আছে। বেইজিং-এ ধোঁয়া ও কুয়াশার মিশ্রণের পরিমাণ এত বেশি হয়ে পড়লো যে মানুষজন এক ভবন থেকে অন্য ভবনে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। আর শ্বাস নেওয়াটা তো পুরোপুরি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের নলকূপগুলোতে যে পরিমাণ আর্সেনিক পাওয়া গেছে তাতে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা লিখেছে 'বিশ্ব ইতিহাসে এত মানুষের মধ্যে বিষ ছড়িয়ে পড়ার একটি অনন্য নজির।' আমেরিকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলোর মধ্যে ঘূর্ণিঝড় একটি বড় সমস্যা। ঘূর্ণিঝড় ইভান ও ক্যাটরিনাকে বলা হয় বার্তাবাহক, এরা হচ্ছে আগামীর বিশ্ব উষ্ণায়নের বার্তাবাহক। আমেরিকার প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি আল গোর আমাদেরকে এই বিষয়ে সতর্ক করেন। এই সমস্যাগুলোকে পূর্বেকার সমস্যা যেমন যুদ্ধবিগ্রহ থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। সতর্কতায় কাজ হলো। লোকজন সব কাজে নেমে পড়ল। উদ্যোক্তারা সবুজ প্রযুক্তি নির্মাণে হাজার হাজার কোম্পানি গঠন করল। আর বিনিয়োগকারীরাও এগুলোতে প্রায় ৮২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ফেললেন। এখান থেকেই আরম্ভ হলো বিশ্বকে ধুয়েমুছে নতুন করে সাজানোর এক নবসূচনা।

কিন্তু এটা কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। আমরা একটি স্বাস্থ্যকর বিশ্ব নির্মাণ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এর পরিবর্তে আমরা সবুজ প্রযুক্তি নামে একটি

বুদবুদ সৃষ্টি করলাম। যা অনেকটা ফাঁকা বুলির মতো হয়ে গেল। এদের মধ্যকার সবচেয়ে বড় ভূত ছিল সলেন্ড্রা। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সবুজ প্রযুক্তি বা পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্প গঠনের নাম যে অন্য যেসব কোম্পানিই এসেছিল তার সবগুলোই বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ২০১২ সালে চল্লিশটিরও বেশি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে পড়ে। আমরা যদি নবায়নযোগ্য শক্তি সম্বন্ধীয় কোম্পানিগুলোর শেয়ারবাজারের দিকে তাকাই তবে আমরা এটা পরিষ্কার দেখবো যে, সবুজ প্রযুক্তি নামে একটি ধোঁয়া তুলে এটা আবার নিম্নমুখী হয়ে পড়ে।

RENIXX (RENEWABLE ENERGY INDUSTRIAL INDEX)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন সবুজ প্রযুক্তি ব্যর্থ হয়? যারা সংরক্ষণশীল, প্রচলিত ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকারী তাদের মতামত হচ্ছে এটা আমরা আগেই জানতাম। সরকার যখন নবায়নযোগ্য শক্তির ওপর গুরুত্বারোপ করে তখনই এটা বিষাক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে কী আমাদের কিছুই করার নেই। আছে, অবশ্যই আছে। এখনও নবায়নযোগ্য শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার মতো অনেক ভালো ভালো কারণ রয়েছে। আর তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সবুজ প্রযুক্তির ব্যাপারটি সরকারের ব্যর্থতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল। বেশিরভাগ

নবায়নযোগ্য কোম্পানিগুলো ব্যর্থ হয় তার অন্যতম কারণ হচ্ছে তারা ব্যবসা আরম্ভ করার সাতটি মূল কারণকে উপেক্ষা করে যায়। এগুলো হচ্ছে :

১। প্রকৌশলগত প্রশ্ন

আপনি কি কেবল একটি ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিক উন্নতি ছাড়া একদম অভিনব কোনো প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারবেন?

২। সময় সম্পর্কিত প্রশ্ন

আপনার নির্দিষ্ট ব্যবসাটি আরম্ভ করার জন্য এটাই কি একদম ঠিক সময়?

৩। একচেটিয়া বাজারের প্রশ্ন

আপনি কি একটি বড় বাজার চাহিদার একটি ছোট্ট অংশ, একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে আরম্ভ করছেন?

৪। লোকজন সম্পর্কিত প্রশ্ন

আপনার দলে কি দরকারি ও প্রয়োজনীয় ঠিক ঠিক সদস্য আছে?

৫। বিতরণ সম্পর্কিত প্রশ্ন

আপনি কেবল আপনার পণ্যটি উৎপাদন করলেন বা সৃষ্টি করলেন তা নয়, তার পাশাপাশি আপনার পণ্যটিকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মতো বিতরণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন কি?

৬। টেকসই বা স্থায়িত্বের প্রশ্ন

বাজারে আপনার কোম্পানিটি কি আগামী ১০ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবে, টেকসই হবে?

৭। ব্যবসার গুমোর সম্পর্কিত প্রশ্ন

আপনি কি এমন কোনো অসাধারণ সুযোগ খুঁজে পেয়েছেন যা অন্যরা এখনো দেখতে পাচ্ছে না?

Audilua.com

আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করেছি। আপনার কারখানা বা কোম্পানিটি যাই নিয়ে হোক না কেন, আপনি যদি আপনার উদ্যোগ বা ব্যবসাকে একটি বড় পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই এই সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আর আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় যদি এই প্রশ্নাবলির উত্তর না থাকে তবে আপনি নিঃসন্দেহে অনেকগুলো বাধার সম্মুখীন হবেন এবং আপনার উদ্যোগটি ব্যর্থ হবে। আর যদি আপনি এই সাতটি বিষয়কে আপনার নখদর্পণে রাখেন তবে আপনি আপনার ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করবেন এবং সাফল্য অর্জনে নেতৃত্ব দিবেন। এমনকি এদের মধ্যকার পাঁচ থেকে ছয়টিও যদি কাজে লাগাতে পারেন তবুও আপনি অনন্য। কিন্তু আপনি যদি লোকের কথায়, সরকারি কোনো উদ্যোগের দিকে তাকিয়ে না জেনে-বুঝে ঝাঁপ দেন, যেমন সবুজ প্রযুক্তি নিয়ে লোকজন ঝাঁপ দিয়েছে কোনো ধরনের প্রশ্ন-উত্তর ছাড়াই। আর কাজে নেমে পড়ার পর তারা সকলে আশা করছে বিস্ময়কর কিছু একটা হয়ে যাবে।

এখন অবশ্যই খুব একটি নির্দিষ্ট করে বলা যায় না কেন কিছু কিছু নবায়নযোগ্য শক্তিনির্ভর কোম্পানি ব্যর্থ হলো, কারণ তারা এত বেশি ভুল করেছে যে, তাদের ব্যর্থতার একটি নির্দিষ্ট কারণ ঠিক করাই মুশকিল। কিন্তু তারপরেও দেখেন *এই ধরনের একটি* ভুলও কিন্তু আপনার পুরো কোম্পানিকে ডোবাতে যথেষ্ট। তাই সবুজ প্রযুক্তি নিয়ে পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদেরকে আরও সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

প্রকৌশলগত প্রশ্ন

একটি প্রযুক্তিগত কোম্পানিকে অবশ্যই তার প্রযুক্তির স্বত্বাধিকারী হতে হবে। এই প্রযুক্তিকে অবশ্যই তার প্রতিযোগী কোম্পানির প্রযুক্তির চেয়ে উন্নত হতে হবে। কিন্তু সবুজ প্রযুক্তি নামে যেসব পণ্য বাজারে এসেছে এগুলো হয়তো আগের পণ্যের চেয়ে একটু উন্নত (তাও সবক্ষেত্রে নয়); অথচ পণ্য হতে হবে দশগুণ উন্নত। আবার এমনও দেখা গেছে পণ্যগুলো এতই *বাজে* যে, তা পুরোপুরি বদলাতে হয়েছে। সলেন্ড্রা কোম্পানি সৌরবিদ্যুৎ কোষ তো তৈরি করেছে, কিন্তু তা তত বেশি কার্যকর নয়। কোষগুলো সাধারণ কোষের মতোই

কাজ করে এবং সূর্য থেকে খুব বেশি আলোও শোষণ করতে পারে না। কোম্পানি অবশ্য একটি আয়না দিয়ে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মিকে সৌরবিদ্যুতে পরিণত করতে চেয়েছে, কিন্তু তা ততটা কার্যকর হয়নি।

নতুন উদ্যোক্তাদের বা কোম্পানিকে অবশ্যই দশগুণ উন্নত পণ্য নির্মাণ করতে হবে। কেবল দায়সারাভাবে পণ্য উন্নত করলে হবে না। কারণ পণ্যের এমন যোগবিয়োগ আসলে গ্রাহকদের কোন কাজেই আসে না। ধরুন, আপনি বায়ুশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য উন্নতমানের টারবাইন তৈরি করলেন যা পূর্বের তুলনায় ২০% কার্যকর। এবার এটা আপনি গবেষণাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে একটি গবেষণাগারে বাস্তবে যে যে বাধাবিপত্তির মুখে পড়তে হয় তা কখনোই সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া লোকজন নতুন পণ্যের মধ্যে যদি কোনো খুঁত পায় তবে সেটাকে এতটাই বাড়িয়ে বলে যে, আপনি নিজেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাবেন আমার পণ্য কী তাহলে এতই খারাপ। একমাত্র যখন আপনার পণ্য দশগুণ উন্নত হবে কেবল তখনই আপনি গ্রাহককে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবেন।

Audilua.com

সময় সম্পর্কিত প্রশ্ন

নবায়নযোগ্য শক্তিনির্ভর কোম্পানিগুলো নিজেদের বোঝানোর চেষ্টা করলো যে, তাদের উপযুক্ত সময় চলে এসেছে। স্পেক্ট্রা ওয়াটের *(SpectraWatt)* সিইও অ্যান্ড্রু উইলসন *(CEO Andrew Wilson)* ঠিক এই চিন্তা করেই ২০০৮ সালে তার নতুন কোম্পানির উদ্বোধনে বলেন, 'আজকের সৌরবিদ্যুৎ শিল্প *(solar industry)* ঠিক সেই জায়গায় আছে যেখানে একদিন মাইক্রোপ্রসেসর শিল্প ছিল। এখানে এখনো অনেক কাজ করার বাকি আছে এবং আমাদেরকে অনেকদূর এগিয়ে যেতে হবে।' দ্বিতীয় বাক্যটি অবশ্য ঠিকই আছে, সৌরবিদ্যুৎ শিল্পে *(solar industry)* এখনো অনেক কাজ করার বাকি। ১৯৭০ সালের মাইক্রোপ্রসেসর শিল্প *(microprocessor industry)* যে জায়গায় ছিল সেখান থেকে মাইক্রোপ্রসেসর শিল্প কেবল উন্নতই করেনি; বরং দশগুণ *(10X)* উন্নতি করেছে। তাই মাইক্রোপ্রসেসর শিল্প দ্রুত গতিতে উন্নতি করেছে। এখানে ইন্টেল *(Intel)*

কোম্পানির মাইক্রোপ্রসেসরগুলোর একটি চিত্র দেওয়া হলো :

জেনারেশন	প্রসেসর মডেল	বছর
৪-বিট	৪০০৪	১৯৭১
৮-বিট	৮০০৮	১৯৭২
১৬-বিট	৮০৮৬	১৯৭৮
৩২-বিট	iAPX ৪৩২	১৯৮১

পক্ষান্তরে, সৌরবিদ্যুৎ কোষগুলো নির্মাণ করা হয়েছে বেল গবেষণাগারে (*Bell Labs*)। তাও প্রায় ১৯৫৪ সালে। প্রথমদিকে বেল গবেষণাগার থেকে এমন একটি সৌরকোষ নির্মাণ করা হয় যা কার্যকারিতা ৬%। এরপর এই সৌরকোষের অগ্রগতি খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি। এমনকি আজকের আধুনিক প্রযুক্তি সত্ত্বেও কোনরকমে ২৫% পর্যন্ত কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা গেছে। যদিও একটি ধীরভাবে এগিয়ে যাওয়া বাজারে প্রবেশ করাটা একটি ভালো কৌশল, কিন্তু এটা কেবল তখনই কাজ করবে যখন আপনার হাতে একটি নির্দিষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা থাকবে।

একচেটিয়া বাজারের প্রশ্ন

(সামনে যাওয়ার আগে আমরা একটু নতুন এক ধরনের বাজারজাতকরণ সম্পর্কে জেনে নেই। বাজারজাতকরণের এই অভিনব কৌশলের নাম নীল সমুদ্র বা ইংরেজিতে বলা হয় ব্লু ওশান। এই সম্পর্কে ড. চ্যান কিম ও রেনি মাউবারগ্নের একটি বই আছে। নাম হচ্ছে ব্লু ওশান স্ট্র্যাটেজি বা *Blue Ocean Strategy*. সাধারণত বিদ্যমান বাজারকে লাল সমুদ্র বলে ডাকা হয়। কারণ এখানে এত বেশি প্রতিযোগিতা হয় যে, বাজার পুরোপুরি রক্তাক্ত মানে মারমুখী হয়ে ওঠে। তাই এই বিদ্যমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারকে বলা হয় লাল সমুদ্র। এর বিপরীতে ধরা হয় নীল সমদ্রকে। যেখানে গ্রাহককে নতুন নতুন সেবা দেওয়া হয়, গ্রাহককে আরও উন্নতমানের পণ্য দেওয়া হয় এবং ব্যবসায়ীরাও একচেটিয়া ব্যবসা করে যেতে পারে। এবার অনুবাদে ফিরে যাই।)

২০০৬ সালে, কোটিপতি জন ডোর, যিনি বিশেষ করে প্রযুক্তিগত

কোম্পানির ওপর বিনিয়োগ করেন, তিনি ঘোষণা দেন যে 'সবুজ হচ্ছে নতুন লাল, সাদা ও নীল।' এখানে তিনি সবুজ প্রযুক্তির ব্যবসায়িক বাজারকে বুঝিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে লাল বলেই থামতে পারতেন। জন ডোর নিজেও বলেছেন, 'ইন্টারনেট মার্কেটের আয়তন হয়তো শত কোটি টাকা, কিন্তু জ্বালানি শক্তির বাজার লাখ কোটি টাকা।' কিন্তু তিনি যেটা বলেননি সেটা হচ্ছে এই শক্তির বাজারটি পুরোপুরি ভয়ানকভাবে প্রতিযোগিতাপূর্ণ। ডোরের মতো এমন আরও অনেকেই ২০০০ সালের দিকে শক্তি বাজারে বিনিয়োগ করা আরম্ভ করে। তখন অনেকেই সুন্দর সুন্দর প্রকল্প নিয়ে, পাওয়ার পয়েন্টে সাজিয়ে এনে উপস্থাপন করেছেন। এই লাখ কোটি টাকার বাজারের সব গল্পগাঁথা তুলে ধরা হয়। যেন এসব কিছুই কত সহজ!

সবুজ প্রযুক্তির লোকজন দেখলো যে, যেহেতু শক্তিখাত অনেক বড় বাজার, লাখ কোটি টাকার বাজার সেহেতু এখান থেকে অবশ্যই অনেক টাকা আয় করা সম্ভব। তারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করতো তার কোম্পানিই শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ বিশেষত্ব রয়েছে। যেমন ২০০৬ সালে সৌরবিদ্যুৎ প্রযুক্তি বিষয়ক কোম্পানি মিয়াসোলের সিইও ডেভ পিয়ার্স বলেন, 'আমরা খুব পাতলা ও কার্যকর সৌরকোষ নির্মাণের চেষ্টা করছি।' এর কয়েক মিনিট পরে পিয়ার্স ভবিষ্যদ্‌বাণী দেন যে, 'মিয়াসোল সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কোম্পানি হয়ে দাঁড়াবে। কারণ আগামী এক বছরের মধ্যে মিয়াসোল কোম্পানি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সৌরকোষ উৎপাদনকারী হিসেবে আভিভূত হবে।' কিন্তু তেমন কিছুই ঘটেনি। আর পাতলা সৌরকোষ তাদেরকে সহায়তাও করতে পারতো না। কারণ অন্যান্য সৌরকোষের মতো পাতলা সৌরকোষও একটি ধরন মাত্র। এসব ক্ষেত্রে গ্রাহকরা কখনো একটি বিশেষ ক্ষেত্র বা ধরন নিয়ে উৎসাহী নয়; যদি না প্রযুক্তিটি একটি অসাধারণ পথে সমস্যার সমাধান করে। আর আপনি যদি একটি অসাধারণ পথে একটি ছোট্ট বাজারকে দখল করতে না পারেন তবে আপনাকে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়তে হবে। ঠিক এই জিনিসটাই মিয়াসোল কোম্পানির সাথেও ঘটেছে। ২০১৩ সালে মিয়াসোল কোম্পানিটি লসে বিক্রয় হয়।

লোকজনের প্রশ্ন

শক্তিখাতে যে সমস্যা তা মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যা। তাই যারা প্রকৌশলী তাদের দ্বারা সৃষ্ট উদ্যোগগুলো বেশ ভালোই চলে। আর অন্যান্যগুলো কেন ব্যর্থ হয়? যারা প্রকৌশলবিদ্যার সাথে জড়িত নয়, এমন লোকজন দ্বারা

চালিত কোম্পানিগুলোই দেখা যায় ব্যর্থ হয়। ব্যাপারটি হচ্ছে যারা বিক্রয়কর্মী বা ব্যবস্থাপক ও পরিচালক পদে থাকে তারা মূলত মূলধন সংগ্রহ করতে দক্ষ। তারা সরকারি কাজকর্মগুলোও সম্পন্ন করতে পটু। কিন্তু তারা গ্রাহকদের জন্য উপযোগী নয়। গ্রাহক যেমন পণ্য কিনতে আগ্রহী তারা সেই ধরনের পণ্য নির্মাণে অপারগ।

ফাউন্ডারস ফান্ডে আমরা যখন বিভিন্ন উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে যাই তখন আমাদের নজরে এই ব্যাপারটি আসে। আমরা মূলত তাদের গায়ে দেওয়া পোশাক থেকে সূত্রটি পাই। সবুজ প্রযুক্তির ব্যবস্থাপক বা পরিচালকরা সাধারণত স্যুট ও টাই পরিধান করে। যা আসলে একটি লালবাতির সংকেত। কারণ আসল প্রযুক্তিবিদরা সবসময় টিশার্ট ও জিন্স পরিধান করে। তাই আমরা সবার প্রথমে একটি নিয়ম করলাম যে, যেসব কোম্পানির উদ্যোক্তারা টিশার্ট ও জিন্স পরিধান করে, তাদেরকেই আসতে দাও। হয়তোবা আমরা যেসব উদ্যোগে বিনিয়োগ করেছি তারচেয়ে ভালো ভালো উদ্যোগ খুঁজে পাওয়া যেত যদি আমরা সবগুলো কোম্পানিকে খুঁটিনাটি বলার সুযোগ দিতাম। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখলাম আমরাই ঠিক। প্রযুক্তিগত কোম্পানিগুলোর বিশ্লেষণ করে দেখা গেল—কখনো এমন কোনো প্রযুক্তিগত কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবেন না যে কোম্পানির সিইও স্যুট পরিধান করে। বিক্রি সবচেয়ে ভালো হয় যখন এটা গোপন থাকে। এখন সিইও যদি বিক্রয় করতে পারে তবে সেটাতো ভালোই। কিন্তু তাকে যদি বিক্রয়কর্মীর মতোই দেখা যায় তবে তা ভালো নয়। আর যদি প্রযুক্তিখাতে এই পোশাক পরে তবে তা আরও অনুপযুক্ত।

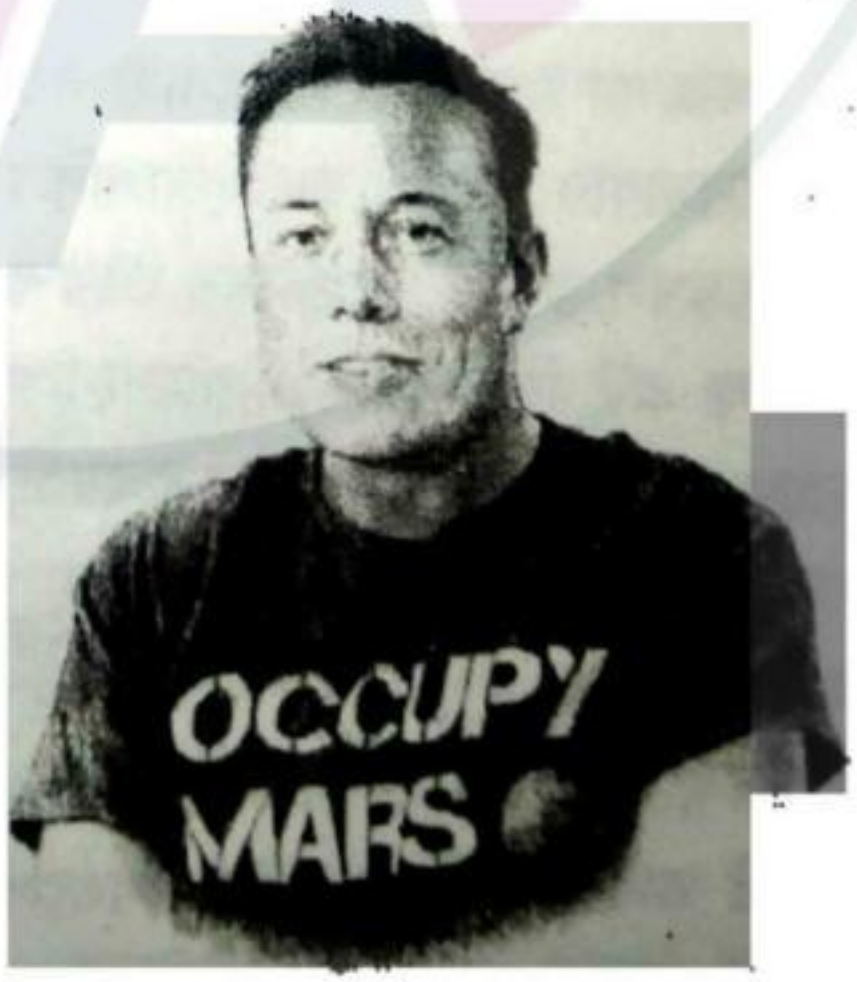

সবুজ প্রযুক্তিগত কোম্পানিগুলো সরকার ও বিনিয়োগকারীদের খুব ভালোভাবেই বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তারা প্রায় গ্রাহকদের কথা ভুলেই গেছে। তারা দেখলো বাস্তব বিশ্ব আসলে গবেষণাগার নয়। একটি পণ্য উন্নত হওয়ার পাশাপাশি পণ্য বিক্রয় করা ও বিতরণ করাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ, ইসরাইলি বিনিয়োগকারীদের কথা বলা যায়। তারা *বেটার প্লেস (Better Place)* নামক একটি উদ্যোগ নেয়। এটি ছিল বৈদ্যুতিক গাড়ি সংক্রান্ত একটি উদ্যোগ। তারা ২০০৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৬,৬৪০ কোটি টাকা যোগাড় করে এবং বিভিন্ন জায়গায় ব্যাটারি ও চাজিং স্টেশন বসাতে ব্যয় করে। কোম্পানি চিন্তা করলো 'আমরা যে তেল-গ্যাস জ্বালানি ব্যবহার করি এবং এর ফলে নিজেদের পরিবেশ দূষণ করি তা থেকে বৈদ্যুতিক গাড়ি আমাদেরকে রক্ষা করবে। অবশ্য কিছু হলেও এটা কাজ করেছে—তারা প্রায় ১,০০০ গাড়ি বিক্রয় করলো। অবশ্য দেউলিয়া হওয়ার আগ পর্যন্ত সংখ্যাটি এটাই ছিল। অবশ্য এটাও একটি সাফল্য। কারণ গাড়িগুলো ক্রয়ের জন্য গ্রাহক পাওয়া খুব মুশকিল ছিল। এর মধ্যে ১,০০০ গ্রাহক গাড়ি ক্রয় করেছে এটাও অনেক।

শুরুর দিকে যারা ক্রয় করে তারা আসলে পুরোপুরি পরিষ্কার থাকে না *'কী ক্রয় করলাম'* সেই ব্যাপারে। বেটার প্লেস কোম্পানি *রেনল্ট (Renault)* কোম্পানি থেকে *সেডান (sedan)* গাড়ি ক্রয় করে তাতে বৈদ্যুতিক ব্যাটারি ও মটর বসিয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে আপনি কি একটি বিদ্যুৎচালিত *রেনল্ট* ক্রয় করেছেন; নাকি একটি *বেটার প্লেস* ক্রয় করেছেন? যাইহোক, আপনি যদি ক্রয় করতেও চান তবে আপনাকে আরও কয়েকটি ধাপ পার হতে হবে। প্রথমে আপনাকে দেখতে হবে আপনি কি *বেটার প্লেস* স্টেশনের কাছে ধারে বাস করেন। আবার আপনাকে দেখতে হবে আমি নিয়মিত যে রাস্তাগুলো দিয়ে চলি তার আশেপাশে বৈদ্যুতিক স্টেশন কোথায় কোথায় আছে। তারপর আপনি যদি সম্মত হন আপনি একটি বৈদ্যুতিক গাড়ির স্বত্বাধিকারী হবেন।

বেটার প্লেস চিন্তা করলো তাদের পণ্যই যেহেতু নিজেকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারছে তাহলে আর এই পণ্য সম্পর্কে লোকজনকে বেশি কিছু জানাতে হবে

না। কোম্পানি যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন এক হতাশ গ্রাহক বলছেন তারা তো টয়োটাও ব্যবহার করতে পারতো। যদিও সে ছিল একজন শখের গাড়ি চালক। যে তার শখ পূরণের জন্য সবকিছু করতে রাজি। কিন্তু তাও হলো না। বেটার প্লেস কোম্পানি ২০১৩ সালে ১০০ কোটি টাকায় তার সব সম্পদ বিক্রি করে দেয়। এ সময় কোম্পানির বিবৃতি ছিল, 'আমরা প্রযুক্তিগত সমস্যা দূর করতে সক্ষম হয়েছি, কিন্তু আরও অন্যান্য কিছু বাধা ছিল যা আমরা অতিক্রম করতে পারিনি।'

স্থায়িত্বের প্রশ্ন

প্রত্যেক উদ্যোক্তার উচিত তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সবার শেষে কদম রাখা। এক্ষেত্রে তার উচিত একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। এটা শুরু হতে পারে নিজেকে এই রকম কিছু প্রশ্ন করে : আজকে থেকে ১০ বা ২০ বছর পর বিশ্ব দেখতে কেমন হবে? এবং আমার ব্যবসা তার মধ্যে কীভাবে নিজের জায়গা করে নিবে?

কিছু কিছু সবুজ প্রযুক্তি বিষয়ক কোম্পানির কাছে ভালো উত্তর ছিল। যেমন, এভারগ্রিন সৌরবিদ্যুৎ কোম্পানি তার একটি কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার আগে এই ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলে :

'চীনের সরকার থেকে চীনা সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কারখানাগুলো অনেক সুযোগ সুবিধা পায় ... যদিও আমাদের পণ্য উৎপাদন খরচ ইউরোপের অন্যান্য উৎপাদনকারীদের থেকে কম, কিন্তু সেই দামও আমাদের চীনা প্রতিযোগীদের থেকে অনেক উপরে বিদ্যমান।'

এখন এই ব্যাপারটি আসলে ২০১২ সালের আগে কারও চোখে পড়েনি। যখন একটি কোম্পানি দেউলিয়া হলো এবং আমরা তার দেউলিয়া হওয়ার কারণ বের করতে গেলাম তখন আমরা দেখলাম নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে চীনা সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের সাথে টেক্কা দিয়ে টিকে থাকা কঠিন। তাই অনেক সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যখন ২০১২ সালে দেউলিয়া হয়ে পড়লো তখন তারা চিনের বিরুদ্ধে বাজারে একচেটিয়া আচরণ ও দামের ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে মামলা করলো। প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার এই ক্ষতিপূরণ

মামলা করা হয় চিনের খ্যাতনামা তিন সৌরকোষ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। আবার সলিনড্রা কোম্পানিও বছর শেষে দেউলিয়া হওয়ার আগে সেই একই কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে মামলা করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাজারে চীনা কোম্পানিগুলোর প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আগে থেকে অনুমান করা কি অসম্ভব ছিল? নবায়নযোগ্য কোম্পানির উদ্যোক্তাদের আরও সতর্ক হতে হবে। নিজেদের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে চিন্তা করতে হবে। তাদেরকে জানতে হবে যে, এমন কী করলে চীন আমার ব্যবসাকে ধ্বংস করতে পারবে না? এই প্রশ্নের উত্তর ছাড়া, একজন ব্যক্তি যে ফলাফল আশা করে তা কখনো বাস্তবে ঘটবে না।

সৌরকোষ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যে প্রতিযোগিতার ভুল পরিসংখ্যানে পড়েছে তাই নয়, তারা শক্তি বাজার সম্পর্কেও ঠিকভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারেনি। তারা চিন্তা করেছিল প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ শেষ হয়ে আসছে, জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারও ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। ২০০০ সালে ১.৭% প্রাকৃতিক গ্যাস আসতো ফ্রাকেড শেল থেকে। এটা পরবর্তী পাঁচ বছর পরে ৪.১% এ পৌঁছাবে। প্রাকৃতিক গ্যাসের যোগান বৃদ্ধি পাবে, উদ্যোক্তারা এই তথ্যটিকে এড়িয়ে গেছেন। তাই ২০১৩ সালে গ্যাসের দাম আরও পড়ে যাওয়ায় নবায়নযোগ্য শিল্পখাত আরও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। ফ্রাকিং হচ্ছে ভূগর্ভ থেকে গ্যাস উত্তোলনের একটি পদ্ধতি। এটা বেশিদিন থাকবে না। অথবা এটা কোন স্থায়ী সমাধান নয়, কিন্তু তারপরেও নবায়নযোগ্য শিল্পখাতকে বিপদে ফেলার জন্য এটাই যথেষ্ট। দুঃখের কথা হচ্ছে সবুজ প্রযুক্তির উদ্যোক্তারা ঠিক এই ব্যাপারটিই দেখেননি।

গোপন প্রশ্ন

সবুজ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিটি কোম্পানিই বুঝতে পারলো যে, আমাদের একটি পরিচ্ছন্ন পৃথিবী দরকার এবং এটাই সত্য। কিন্তু তারা এই ব্যাপারটি দিয়ে নিজেদের চোখ বেঁধে ফেললো এবং এটা যে একটি ব্যবসায়িক সুযোগ সেটাকে অতিরঞ্জিতভাবে দেখতে লাগলো। আসুন দেখি ব্যাপারটি কেমন!

২০০৬ সালে জর্জ ডব্লিউ. বুশ বললেন, 'আমেরিকার প্রতিটি পরিবার

তার বাড়ির ছাদ থেকে প্রাপ্ত সৌরবিদ্যুৎ দিয়েই চলবে। তারা নিজেরাই নিজেদের বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে।' তারপর বিনিয়োগকারী বিল গ্রোস ঘোষণা দিলেন, 'সৌরবিদ্যুৎ খাতের সম্ভাবনা অপরিসীম।' অবশ্য সোলারিয়া নামক সৌরপ্রতিষ্ঠানের সিইও স্বীকার করেছেন যে, 'এখানে যতটা গুপ্তধন আছে, ঠিক ততটা মরীচিকাও আছে।' কিন্তু এতকিছুর পরও যখন জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কোম্পানিগুলো আরম্ভ হলো তা বেশিদিন টিকতে পারলো না। তাদেরকে অতিদ্রুত দেউলিয়ার পথে হাঁটতে হয়েছে। তাই এখান থেকে আমরা একটি জিনিস খুবই স্পষ্ট দেখতে পাই। আর তা হচ্ছে : বড় বড় সফল ও মহান কোম্পানিগুলোর কিছু গুমোর আছে, তাদের সাফল্যের কিছু নির্দিষ্ট কারণ আছে যা বাইরের লোকজন দেখতে পায় না।

Audilua.com

যদিও নবায়নযোগ্য প্রযুক্তির উদ্যোক্তাদের অনেকেই এটাকে লাভজনক ব্যবসা হিসেবে দেখাতে চেয়েছে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য কেবল অর্থলাভই নয়, তারচেয়েও বড় কিছু, এই বিশ্বকে একটি পরিচ্ছন্ন জ্বালানি শক্তির যোগান দেওয়া। তবে সবুজ প্রযুক্তি নাম দিয়ে যে বুদবুদ সৃষ্টি হয় তা কিন্তু বিশাল এক ফাঁকা বেলুন সৃষ্টি করে। আর এই ব্যর্থতাকে 'সামাজিক উদ্যোগ' ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন বলা যেতে পারে। যারা ধনী ও লোকহিতৈষী ব্যক্তি তারা একটি তত্ত্ব নিয়ে উদ্যোগটি নিয়েছিল। তত্ত্বটি হচ্ছে : বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অলাভজনক জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান; এরা ছিল দুই মেরুর বাসিন্দা। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনেক টাকা আছে, ক্ষমতাও আছে, কিন্তু তারা তাদের মুনাফাভিত্তিক উদ্দেশ্য দ্বারা শৃঙ্খলিত। (লাভ, লাভ, আরও লাভ চাই।) অন্যদিকে অলাভজনক জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহ লোকজনের জনকল্যাণের কাজগুলো করে যায়, কিন্তু তারা দেশের বৃহৎ অর্থনীতিতে খুব বেশি ভূমিকা রাখতে পারে না। কারণ তাদের দৈন্যদশা। তো সামাজিক উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ছিল উভয় মেরুকে এক করা এবং 'ভালো কিছুর দ্বারা ভালো কিছু করা।' কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে তারা কোনোটাই করতে সক্ষম হয়নি।

Audilua.com

এ রকম দ্বিমুখী অর্থবিশিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল। এটা না সামাজিক না আর্থিক উদ্দেশ্য সাধন করে। এখন সমস্যা তো 'সমাজ' শব্দটির মধ্যেও রয়েছে। যদি বলি 'সমাজকল্যাণ', তবে কি এটা আসলেই সমাজের কল্যাণ করবে; নাকি সমাজ চায় বলেই কল্যাণ মনে হয়? এখন জনসমাজ দ্বারা যাই প্রশংসিত হয় তাই কি ভালো? এটা অনেকটা প্রচলিত/প্রথাগত একটি ব্যাপার হয়ে গেল, যেমন নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যাপারটি।

আসলে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লোভ অথবা অলাভজনক খাতের জনকল্যাণ; এদের কোনোটাই সমাজের অগ্রগতিকে ধরে রাখেনি। মূলত আমরা এদের একই রকম থেকে যাওয়ার কারণেই সামনে বাড়তে পারছি না। এদের মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর কথাই

চৌদ্দ

প্রতিষ্ঠাতাদের বৈশিষ্ট্য

যখন পেপাল শুরু করি তখন আমরা ছিলাম ছয়জন। এদের মধ্যকার চারজনই তাদের ছোটবেলায় বিদ্যালয়ে বোমা বানিয়েছিল।

আর এদের মধ্যকার পাঁচজনই ছিল মাত্র ২৩ বছর বয়সী বা তারচেয়েও কম বয়সী। আমাদের মধ্যকার চারজনই আমেরিকা ভিন্ন অন্যদেশে জন্মগ্রহণ করেছে। তিনজন সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে। এরা হচ্ছে : চীন থেকে এসেছে ইউ প্যান, পোল্যান্ড থেকে লিউক নোসেক এবং সোভিয়েত ইউক্রেন থেকে ম্যাক্স লেভিচিন। সাধারণত ঐসব দেশে শিশুরা ঐ বয়সে কখনো বোমা বানায় না।

আমরা ছয়জনই ছিলাম একটু খামখেয়ালি স্বভাবের। লিউকের সাথে আমার যখন প্রথম আলাপ হয় তখন সে বলছিলো,—সে চিকিৎসা বিজ্ঞানের

উন্নতির জন্য মরতেও রাজি আছে। ধীরে ধীরে বরফের শীতলতায় শারীরিক যে পরিবর্তন ঘটে এটা পরীক্ষার জন্য সে নিজের জীবন দিতেও রাজি। ম্যাক্স গর্ব করতো যে, তার কোনো দেশ নেই এবং সে এতেই খুশি ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর তার পরিবার একটি দুর্যোগের মধ্যে পড়ে এবং তারা আমেরিকায় পালিয়ে আসে। ইলিনয়ের খ্যাতনামা বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে এসেছে রুসেল সিমনস। একমাত্র কেন হাউয়ারির শৈশব ছিল স্বাভাবিক। সে ছিল আমাদের মধ্যকার অন্যতম। কিন্তু কেন হাউয়ারি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এতটাই উদগ্রীব ছিল যে, সে একটি বড় ব্যাংকে চাকরির প্রস্তাব পর্যন্ত নাকচ করে দেয়। অথচ পেপালে সে ঐ চাকরির তিনভাগের একভাগ বেতন পেত। তাই তাকেও ঠিক পুরোপুরি স্বাভাবিক বলা যায় না।

আচ্ছা, প্রতিষ্ঠাতা লোকজন সবাই কি এমন অস্বাভাবিক হয়? নাকি আমরা তাদের অস্বাভাবিকতাকেই সবচেয়ে বেশি স্মরণ করি? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, প্রতিষ্ঠাতাদের এমন কোন গুণটি অন্যতম যা আসলেই খুব দরকার? এই অধ্যায়টি হচ্ছে—ভিন্ন ভিন্ন লোকজনকে নিয়ে একটি দল গঠন করলে তা কতটা শক্তিশালী হতে পারে তাই নিয়ে। আবার এটা কোম্পানির জন্য বিপজ্জনকও হতে পারে, আমরা সেটা নিয়েও আলাপ করবো।

ইঞ্জিনের ভিন্নতা

কিছু লোক বলবান, কিছু দুর্বল, কিছু লোক মেধাবী, কিছু নির্বোধ–কিন্তু বেশিরভাগ লোকই মাঝামাঝি ধরনের। এটাকে যদি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাই তবে দেখবো :

গুণাবলির সাধারণ বণ্টন ব্যবস্থা

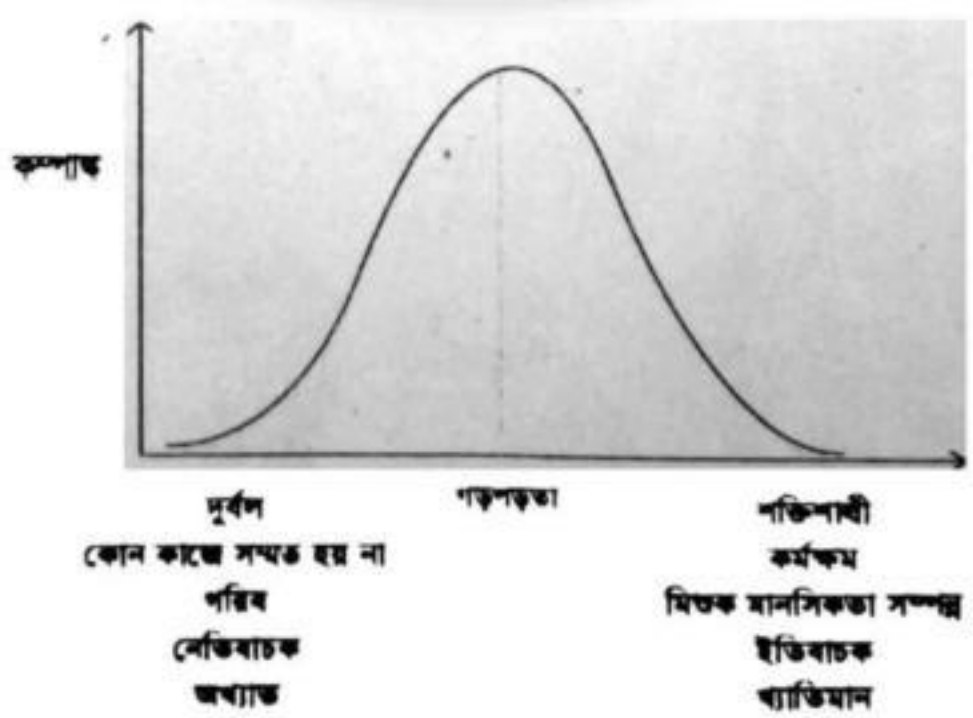

যেহেতু অনেক প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেই অসাধারণ গুণাবলির উপস্থিতি পাওয়া যায়, সেহেতু আপনি হয়তো চিন্তা করতে পারেন তারা আসলে জন্মগতভাবেই এমন কোনো দুলর্ভ গুণাবলি নিয়ে জন্মেছে যা সাধারণ লোকজনের মধ্যে নেই। কিন্তু এতে করেও আসলে মূল ব্যাপারটি ধরা যায় না। সাধারণত আমরা মনে করি ভিন্ন গুণাবলির মানুষদের একত্রিত করাতে কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলি একই সাথে থাকতে পারে না।

গুণাবলির সম্ভাব্য বণ্টন ব্যবস্থা

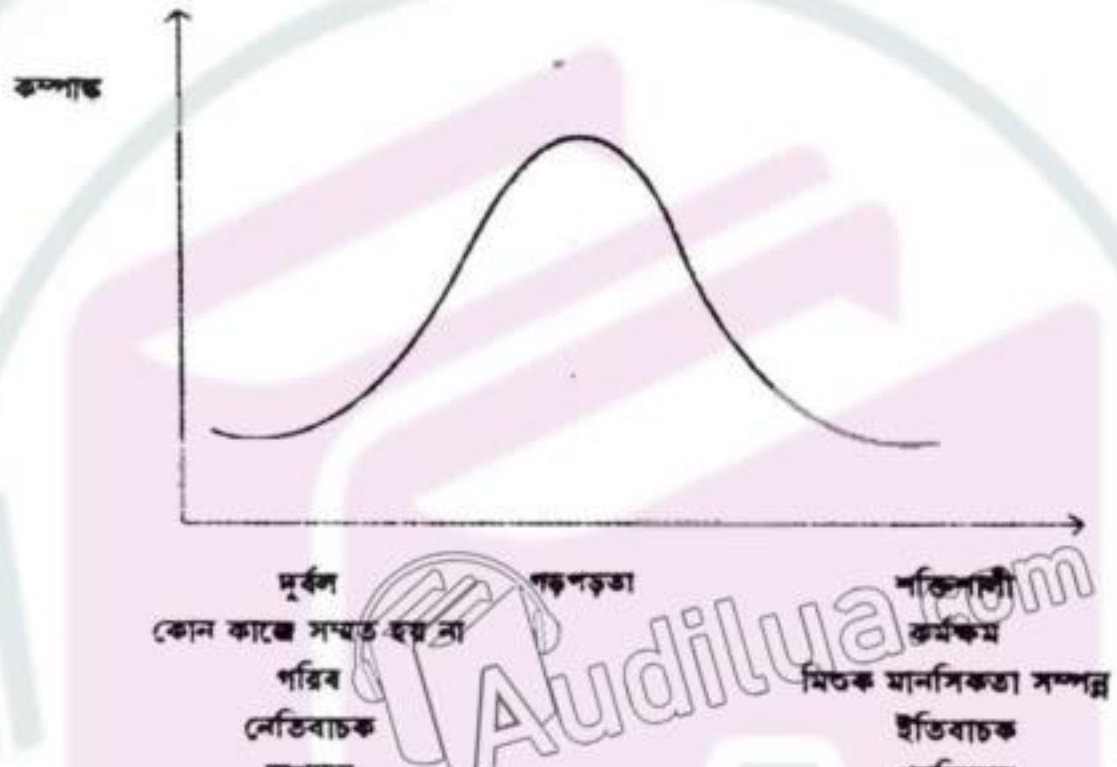

কেউ একই সাথে একই সময়ে ধনী ও গরিব হতে পারে না। কিন্তু ঠিক এই জিনিসটাই প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে ঘটে : যেকোনো উদ্যোগের সিইও নগদ টাকায় গরিব হতে পারে কিন্তু কাগজে কলমে কোটিপতি হতে পারে। তারা আসলে সাধারণ ও অসাধারণ, বোকামি ও বুদ্ধিমত্তার মধ্যে দোদুল্যমান।

প্রতিষ্ঠাতাদের গুণাবলির বণ্টন ব্যবস্থা

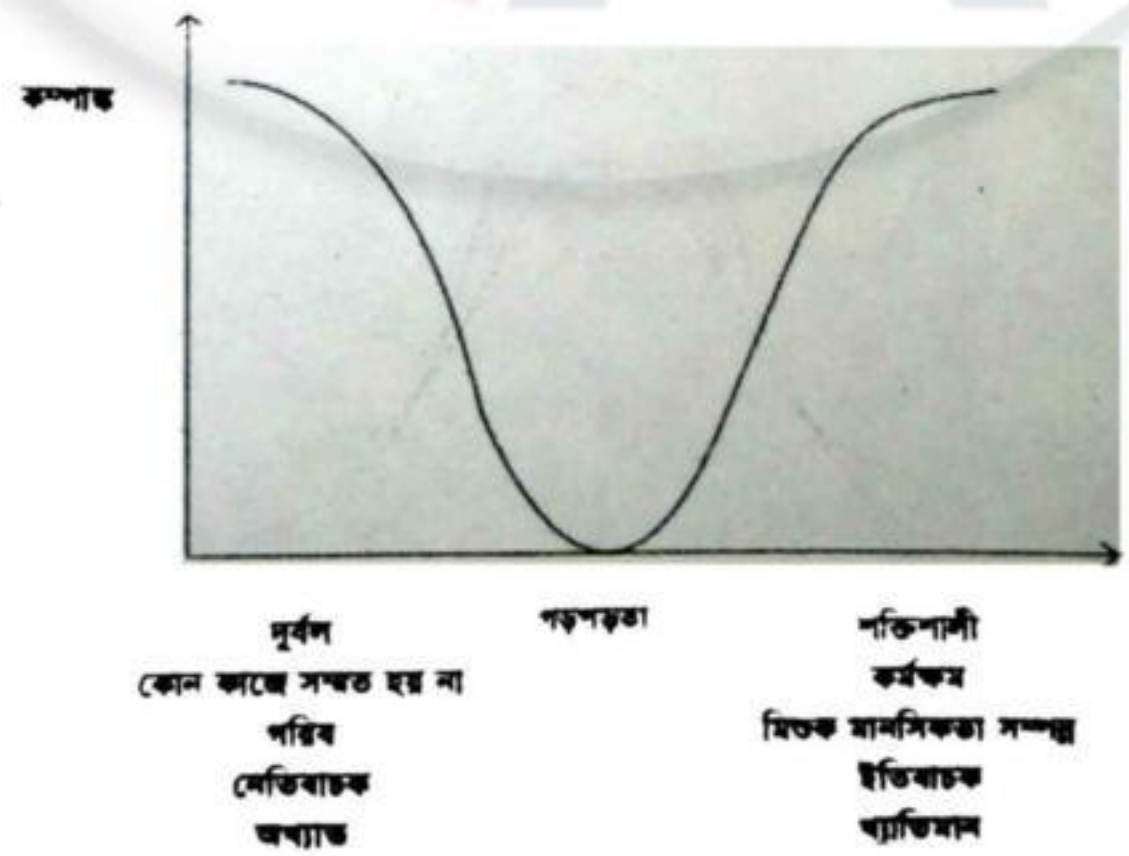

সফল উদ্যোক্তারা প্রায় সবাই একইসাথে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী। আর তারা যখন সাফল্য অর্জন করে, তখন তারা একই সাথে নাম ও বদনাম দুইই অর্জন করে। আপনি যখন তাদেরকে *ব্যবচ্ছেদ* করবেন তখন দেখবেন তারা স্বাভাবিক গুণের ঠিক উল্টোটাই ধারণ করে।

কোথা থেকে এই বিস্ময়কর ও বিচিত্র গুণাবলির আগমন ঘটেছে? হয়তো সফল উদ্যোক্তাদের মধ্যে এই গুণাবলি জন্মগতভাবেই বিদ্যমান; নয়তো তারা তাদের আশেপাশের পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে গ্রহণ করেছে। তবে এটাও সত্য যে, প্রতিষ্ঠাতাদেরকে যেরকম বিস্ময়কর রূপে দেখা হয় তারা মূলত ততটা না। হয়তো তারা তাদের নির্দিষ্ট কিছু গুণাবলিকে অসাধারণভাবে বিকশিত করেছে? অথবা অন্যরা তাদেরকে বাড়িয়ে তুলেছে? এই সবগুলো ব্যাপারই কিন্তু একই সময়ে ঘটা সম্ভব। আর এগুলো যদি একই সময়ে ঘটে তবে ব্যাপারটি একটি শক্তিশালী ব্যাপারে পরিণত হয়। যে শক্তি, যে বল একজন ব্যক্তিকে শিকড় থেকে শিখরে উঠাতে সক্ষম। এখন এই ব্যাপারটি আমরা যদি একটি বৃত্তে সাজাতে যাই তবে দেখবো যে বৃত্ত আরম্ভ হয়েছে বিচিত্র গুণাবলির লোকজন দিয়ে; আর বৃত্তের শেষের দিকে তারা আরও তাজ্জব কাণ্ড করে বসেছে।

স্যার রিচার্ড ব্রানসনকেই দেখুন। তিনি একজন কোটিপতি এবং ভার্জিন গ্রুপের *(Virgin Group)* প্রতিষ্ঠাতা। ব্রানসনকে দেখে মনে হয় তিনি জন্মগতভাবেই একজন উদ্যোক্তা। তিনি ১৬ বছর বয়স থেকে ব্যবসা শুরু করেন।

মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি ভার্জিন রেকর্ডস (*Virgin Records*) প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সুপরিচিত—তার বিখ্যাত চুলের জন্য। এটা দেখে যেকেউ বলবে এটা তার জন্মগত নয়। এটার পাশাপাশি ব্রানসন তার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোকেও বিকশিত করেছে। (যেমন সমুদ্রে নগ্ন সুপার মডেলদের নিয়ে ঘুরতে যাওয়া কি নিজের প্রচার বৃদ্ধির জন্য? নাকি একজন পুরুষ কেবল একটু মজা করার জন্য ঘুরতে গিয়েছে? নাকি দুটোই?) আর আমাদের মিডিয়াও তাকে জোর গলায় সিংহাসনে বসিয়েছে—'দ্য ভার্জিন কিং', 'প্রচারের অবিসংবাদিত নেতা' এবং 'কিং অব ব্র্যান্ডিং'। যখন ভার্জিন আটলান্টিক বিমানসেবা চালু হলো তখন বিমান কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের পানীয়ের সাথে ব্রানসনের চেহারা আকৃতির বরফের চারকোণা টুকরা পরিবেশন করলো। তখন ব্রানসন হয়ে গেল 'দি আইস কিং'।

কী মনে হয়? ব্রানসন কি শুধু একজন ব্যবসায়ী যার একদল লোক আছে যারা মিডিয়ায় তার প্রচার বৃদ্ধি করে? নাকি সে একজন জন্মগত প্রতিভাবান যে সাংবাদিকদের প্রভাবিত করতে দক্ষ? সে যে কোনটা তা বলা মুশকিল—হতে পারে উভয়ক্ষেত্রেই তার রাজত্ব রয়েছে।

এবার ভিন্ন একটি উদাহরণ দিই—সেন পার্কার। যে পরিচিত একজন অপরাধী হিসেবে। সেন ছোটবেলা থেকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং পছন্দ করতো। সে বিদ্যালয় বয়স থেকেই হ্যাকিং করা শুরু করলো। একদিন তার বাবা চিন্তা

করলো সেন খুব বেশি কম্পিউটারের পিছনে সময় দিচ্ছে। তাই তিনি কম্পিউটার থেকে কী-বোর্ডটি সরিয়ে নিল। কিন্তু সেন তখন একটি হ্যাকিং করছিল। সেন হ্যাকিংয়ের সেই মধ্যবর্তী অবস্থা থেকে কী-বোর্ডের অভাবে বের হয়ে আসতে পারেনি। পুলিশ এটা বুঝতে পেরে দ্রুত তাকে গ্রেপ্তার করে।

যেহেতু সেন নাবালক ছিল, তাই সে মাত্র তিন বছরের কারাবাসের পর ছাড়া পেল। তারপর সে একটি শেয়ারিং কোম্পানি খোলে। মাত্র ১ বছরের মধ্যেই কোম্পানিটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটিতে। কিন্তু সংগীত কোম্পানিগুলো এর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে দেয়। এর ফলে মাত্র বিশ মাসের মধ্যে, যখন কোম্পানিটির সবচেয়ে ভালো সময় চলছিল তখন এটাকে বন্ধ করতে আদালত থেকে নির্দেশ আসে। সেন আবার আগের সেই সাধারণ অবস্থায় ফিরে গেল।

তারপর এলো ফেসবুক। সেনের সাক্ষাৎ হলো মার্ক জাকারবার্গের সাথে। এটা ছিল ২০০৪ সাল। সেন ফেসবুকের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চালায়। সেনই প্রথম ব্যক্তি যার চেষ্টায় ফেসবুক প্রথম অর্থ বিনিয়োগকারী খুঁজে পায়। তারপর সেন ফেসবুকে অর্থ সংগ্রাহক পরিচালক পদে আসীন হন। অবশ্য ২০০৫ সালে মাদক সেবনের জন্য সেনকে আবার আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। কিন্তু এতে করে নেতিবাচকভাবে হলেও তার প্রচার বৃদ্ধি পায়। তাকে নিয়ে '*দ্য সোশাল নেটওয়ার্ক*' নামে একটি ছবিও বানানো হয়। সেখানে সেনের ভূমিকায় অভিনয় করেন জাস্টিন টিম্বারলেক। যদিও জাস্টিন টিম্বারলেক সেনের চেয়েও অনেক বেশি সুপরিচিত কিন্তু তবুও জাস্টিন যখন সিলিকন ভ্যালিতে বেড়াতে যেতো তখন লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করতো সেই কি সেন পারকার।

পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যক্তিরা মূলত প্রতিষ্ঠাতা। তারা যে কেবল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে তাই নয়; বরং তারা নিজেদেরও প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে যারা খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব, তারা সকলেই নিজেদেরকে একটি ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেমন ধরুন লেডি গাগা। তিনি বেশ পরিচিত একজন মার্কিন পপশিল্পী। বেশ প্রভাবশালীও বটে। কিন্তু তাকে দেখে কি আপনার একজন প্রকৃত মানুষ বলে মনে হয়?

তার আসল নামটি কিন্তু এখন আর গোপন নয়, তবে তা কেউ জানেও না, আর জানতে চায়ও না। সে এমন এমন বিচিত্র পোশাক পরবে যা দেখলে দুর্বল হার্ট বিশিষ্ট যেকেউ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। আপনার কি মনে হয় গাগা *'জন্ম থেকেই এমন'*–তার দ্বিতীয় এলবামের দুইটি শিরোনামই অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু কেউই ভূতের মতো মাথায় শিং নিয়ে জন্ম নেয় না; সেক্ষেত্রে এমন বানানো সাজের কারণ কী? কে নিজেকে এমন ভাবে বানাতে চায়? হয়তো সফল কেউই স্বাভাবিক নয়। হয়তো গাগার জন্মই হয়েছিল এমন ভাবে। (আপনি *born this way* লিখে ইউটিউবে খুঁজলে লেডি গাগার ভিডিওটি দেখতে পাবেন।)

যাইহোক, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নিজের ক্ষমতা নিয়ে অহংকার করবেন না। প্রতিষ্ঠাতারা অবশ্যই মূল্যবান। তারা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা যে কেবল অসাধারণ কিছু করছে তাই নয়; বরং তারা মহান কারণ তারা তাদের কোম্পানির প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির ভিতর থেকে উৎকৃষ্ট কাজটি বের করে আনে। প্রতিষ্ঠাতারা নিজেদের সাথে সাথে অন্যদের ভিতর থেকেও উত্তম কাজটি বের করে আনে। এখানেই প্রতিষ্ঠাতাদের কৃতিত্ব। তবে বিপদও আছে। যে প্রতিষ্ঠাতা তার কাজকর্ম ও দক্ষতা নিয়ে অতিমাত্রায় বুদ হয়ে থাকে সে তার মন-মস্তিষ্কের

ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। আবার এর বিপরীতও আছে। যে প্রতিষ্ঠাতা কোনো গোপনীয়তা বা রহস্যকে পাত্তা দেয় না, তার সাথেও ঠিক একই বিপত্তি ঘটে।

Audilua.com

১

স্থিরতা নাকি অসাধারণত্ব

ভবিষ্যৎ তাই যা আমরা গঠন করবো, পরিকল্পনা করে সৃষ্টি করবো। যদি সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী উদ্যোক্তারাও আগামী ২০-৩০ বছর পর কী হবে তা পরিকল্পনা করতে না পারে, তাহলে আমরা আমাদের অদূর ভবিষ্যৎ নিয়ে কি কিছু বলতে পারবো? সেটা আমরা ঠিক নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না, তবে আমরা একটু বড় করে সীমারেখা টানতে পারি। দার্শনিক নিক বস্ট্রম মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চারটি রূপরেখা তুলে ধরেন।

আমাদের পূর্বপুরুষরা ইতিহাসকে দেখেছেন একটি শেষ না হওয়া পথ হিসেবে। আমরা ভালো ও মন্দ, অগ্রগতি ও অবনতি বা উন্নতি ও ধ্বংস এই ধরনের একটি চক্রাকার পথে এগিয়ে যাবো। এই পথচলা কখনো শেষ হবে না। এই মতবাদকে বলা হয় *পৌনঃপুনিক উত্থান পতন (Recurrent Collapse)*। অনেকটা তরঙ্গের মতো। একবার উপরে ওঠে, আবার পতন ঘটে। তবে সম্প্রতি লোকজনের মধ্যে এই মতকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস সঞ্চার হয়েছে। আমরা হয়তো এই ধরনের পৌনঃপুনিক চক্র থেকে বের হয়ে আসতে পারবো। যদিও আমরা এখনো সন্দেহের মধ্যে আছি যে আমরা যে, পথ চয়ন করেছি তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ হবে কিনা।

যাইহোক, আমরা সাধারণত আমাদের সন্দেহকে দমন করি। যত রকম সন্দেহই থাকুক না কেন, কাজ করে যেতে হবে। কারণ কাজ করলেই তো তার ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। আরেকটি মতবাদ হচ্ছে *মালভূমি তত্ত্ব (Plateau)*। এটা একটি প্রথাগত মতবাদ। এটার সাধারণ বক্তব্য হচ্ছে পুরো বিশ্ব এক জায়গায় মিলিত হবে এবং উন্নতির ঊর্ধ্বদিকে এগিয়ে যাবে। অনেকটা আজকের ধনী দেশগুলো যেমন জীবনযাপন করছে, সমগ্র বিশ্বও সেদিকে এগিয়ে যাবে। এরকম হলে এটা সহজেই বলা যায় যে, আমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে অনেকটা আজকের মতোই হবে।

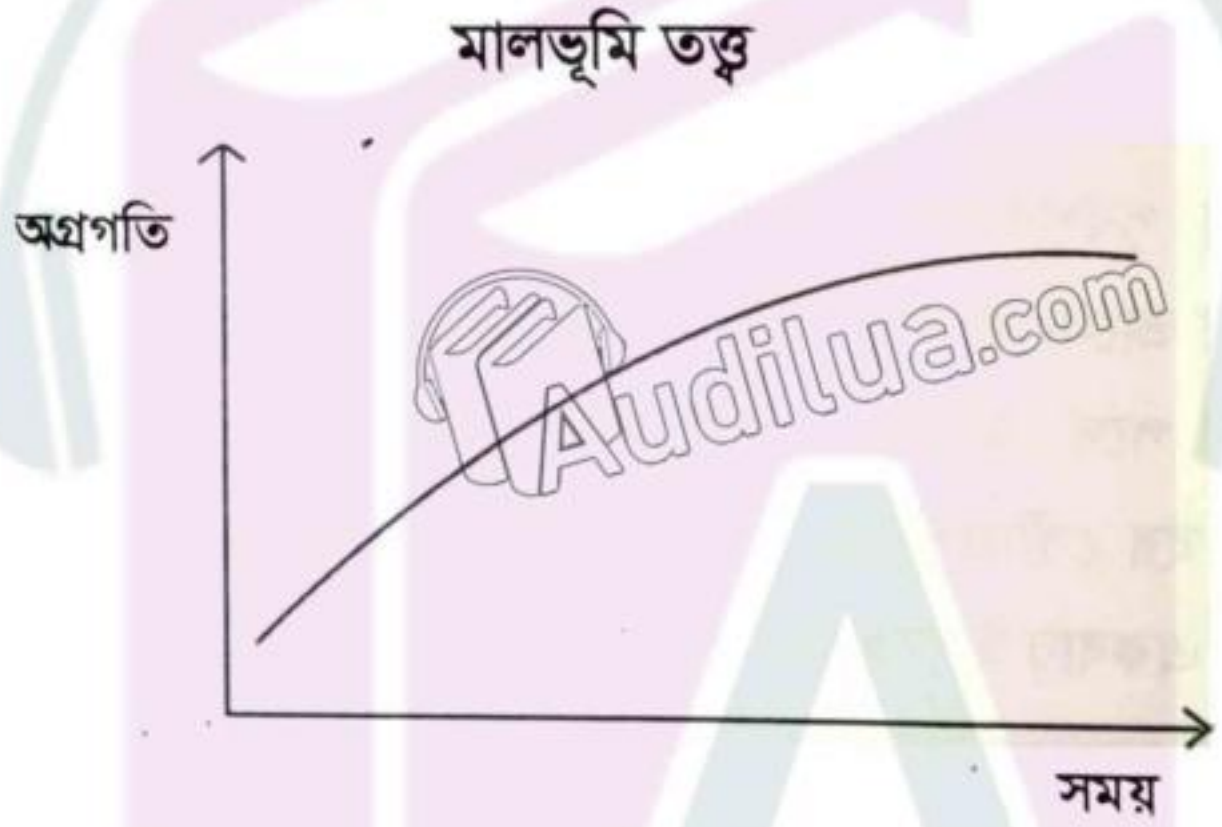

এবার বলি একটি ধ্বংসাত্মক মতবাদ সম্পর্কে। এটা নাম হচ্ছে *বিলুপ্তি তত্ত্ব (Extinction)*। আমাদের আধুনিক সমাজে যে ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক তৈরি করা হচ্ছে তাতে একথা বলা খুব সহজ যে, এই মরণাস্ত্রগুলো দিয়ে পুরো মানব সভ্যতাকেই ধুয়েমুছে ফেলা যাবে। বিশ্বে যদি কোনো বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটে তবে তা আমাদের সারাবিশ্বের মানুষের জন্য একটি মহাপ্লাবন বয়ে আনবে। এতে করে তৃতীয় যে মতবাদটি বলেছি—বিলুপ্তি—ঘটতে পারে। এই ধরনের বড় কোনো বিপর্যয় থেকে আমাদের রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। আমাদের বর্তমান বিশ্বে যে পরিমাণ পারমাণবিক বোমা আছে তাও বিশ্বকে কয়েকবার ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। এই ধরনের অতিমাত্রায় বিধ্বংসী বিস্ফোরক মানবজাতির জন্য হুমকি স্বরূপ।

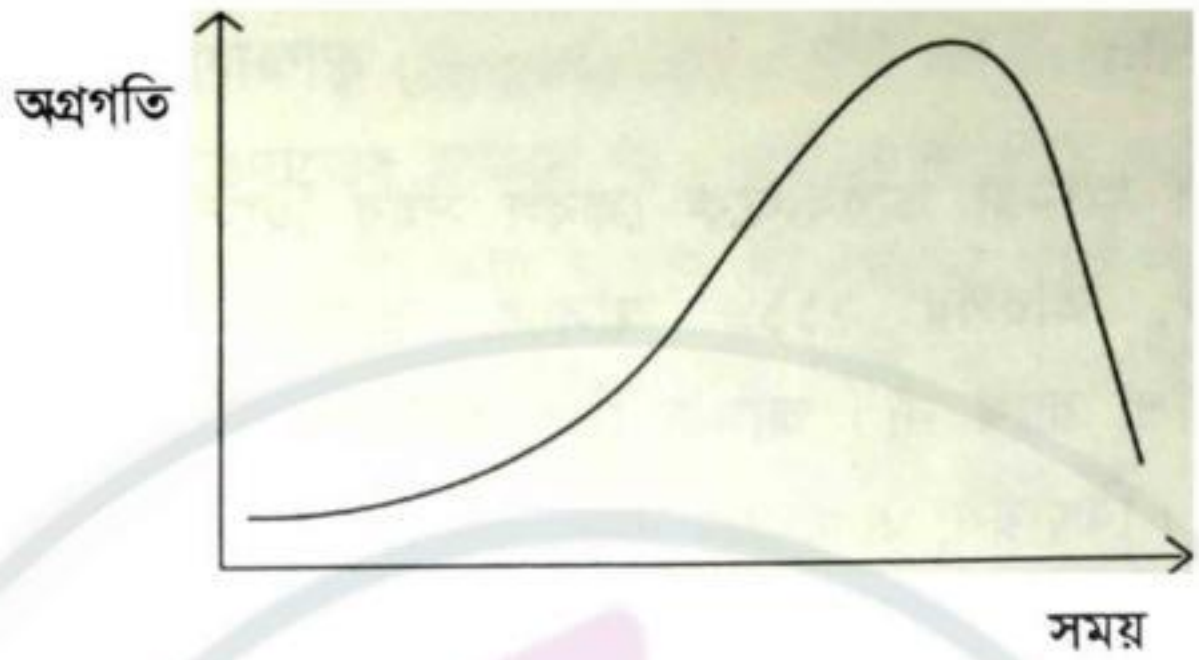

এবার বলি চার মতবাদের শেষটি সম্পর্কে। যদিও এটা নিয়ে চিন্তা করা একটু কঠিন। এটাকে উড্ডয়ন *(Takeoff)* বলা যেতে পারে। আরও উন্নত কোনো ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এটা এমন এক ধরনের পরিবর্তন বা অগ্রগতি অন্য যেকোনো ধরন থেকে ভিন্ন। তাই এটাকে বর্ণনা করে বুঝিয়ে বলাটা মুশকিল।

Audilua.com

উড্ডয়ন

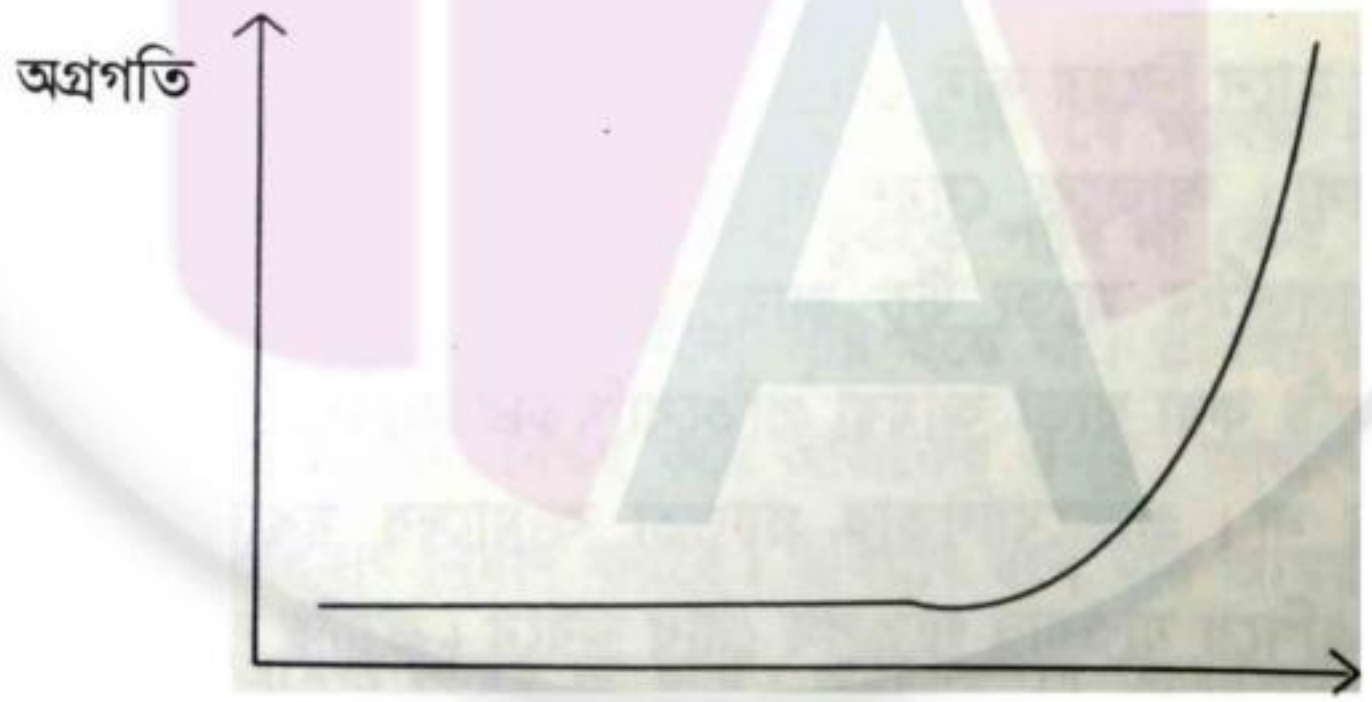

এখন প্রশ্ন হচ্ছে : এই চারটির মধ্যে কোনটি আসলে ঘটবে?

আমরা যদি পৌনঃপুনিক উত্থান পতনের কথা চিন্তা করি তবে এটাকে কিছুটা অনুপযোগী বলে দেখা হয়। কারণ আজকের বিশ্বসমাজ যে পরিমাণ অগাধ

তথ্যপ্রবাহের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা দেখে ভবিষ্যৎ খারাপ হবে ও আবার পুনরায় ভালো হবে, এই ধরনের পৌনঃপুনিক চিত্রের চেয়ে বিশ্বের ধ্বংস ঘটার সম্ভাবনা বেশি। আর ধ্বংস যদি অনিবার্য হয় তাহলে তো মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করাটাই বৃথা।

আর যদি আমরা ভবিষ্যৎকে কেবল সময় হিসেবে বিবেচনা করি যে, আজকে ২০১৮, তারপর ২১১৮ আসবে, তাহলে আমরা আসলে কোন ভবিষ্যতেরই আশা রাখি না। আমরা ঠিক আজকের জিনিসগুলোরই পুনরাবৃত্তি দেখতে থাকবো। বিশ্বায়ন, একদিকে গমন, ঠিক একই ধরনের জিনিস। এই চিত্র থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, গরিব দেশগুলো ধনী দেশের মতো হতে চেষ্টা করবে এবং মালভূমি তত্ত্বের মতো বিশ্বচক্র সৃষ্টি হবে। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন তো, যদি মালভূমি তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি হয়, তবুও কি এটা টেকসই হবে? এতে করে দেখা যাবে বাজার দখলের জন্য আরও প্রতিযোগিতা হবে। আর এই প্রতিযোগিতা পুরো বিশ্বের প্রতিটি কোম্পানি, প্রতিটি মানুষের জন্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে।

যাইহোক, সীমিত সম্পদের মধ্যেই যদি প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয় তবে ঠিক বলা যাবে কি যে এই মালভূমি তত্ত্ব ঠিক কতদিন চলে? (ভয়ংকর অবস্থা। মালভূমি তত্ত্ব মানে নিচের ভূমি থেকে পাহাড়ে, ভূমি থেকে অনেকটা উঁচুতে একটি সমতল জায়গা। আজকে যেমন গরিব দেশগুলো ভূমিতে রয়েছে, আর ধনী দেশগুলো মালভূমির মতো উঁচু জায়গায় রয়েছে। ঠিক তেমন কিছু।) নতুন কোনোকিছু সৃষ্টি করা ছাড়া আমরা প্রতিযোগিতার আবহাওয়া ও চাপ থেকে বের হতে পারবো না। প্রতিযোগিতার প্রচণ্ডতা আমাদের মধ্যকার ন্যায়নীতি ধ্বংস করবে এবং এগিয়ে যাওয়ার গতিপথ রোধ করবে। উন্নতি না হাওয়া এক ধরনের অবনতি। স্থিরতাও এক ধরনের অবনতি। আর প্রতিযোগিতার এই হাওয়া যত জোরে বইবে তত বেশি দ্বন্দ্ব সংঘাতের সম্ভাবনা থাকবে। আর এই সংঘাত যখন পুরো বিশ্বজুড়ে ঘটবে তখন স্থিরতা বিলুপ্তিতে পরিণত হবে।

এরকম চললে তো আর চতুর্থ ধরনটি নিয়ে কোনো প্রশ্নই আসে না। সেটা হচ্ছে উড্ডয়ন। হ্যাঁ, এটা কখন ঘটতে পারে, যখন আমরা আরও উন্নত ভবিষ্যৎ

সৃষ্টির জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তির সৃষ্টি করবো। আবারো বলছি, প্রযুক্তি মানে কেবল তথ্য ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে উন্নতি নয়। প্রযুক্তি মানে যেকোনো কাজকে আরও উন্নতভাবে করা, অভিনবভাবে কোনো সমস্যার সমাধান করা। প্রযুক্তির এই ধরনকে বলা হচ্ছে অসাধারণত্ব (*Singularity*)। এটা এমন এক জায়গা যেখানে মানুষ ও যন্ত্রে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। এখানে আসলে এমন কোনো নয়া প্রযুক্তিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে যা আমরা পূর্বে কখনো দেখিনি। যেমন টাচস্ক্রিন মোবাইল, বিদ্যুৎ চালিত মোটর গাড়ি বা আমার অনুবাদ। মূল ব্যাপারটি হচ্ছে সেই নব্য প্রযুক্তি এতটাই ক্ষমতাশালী হবে যে, আমাদের চিন্তা করার ও বোঝার ক্ষমতাকেও ছাড়িয়ে যাবে। এই অসাধারণত্বের একজন সুপরিচিত প্রবক্তা হচ্ছে রেইমন্ড কার্জওয়াইল। তিনি মুরের তত্ত্ব থেকে সহায়তা নিয়ে গোটা দশেক কর্মক্ষেত্রে সূচকীয় অগ্রগতি দেখান। একটি কোম্পানি মূলত তাদের অভিনবত্ব নিয়ে কীভাবে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবে তাই তিনি তার তত্ত্বে তুলে ধরেন। তিনি বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথেই অতিমানব বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চরম পর্যায় সম্পর্কে তুলে ধরেন। কার্জওয়াইলের মতে, 'অসাধারণত্ব খুবই সন্নিকটে।' এটাকে তিনি অনিবার্যও বলেছেন। তার মতে, এটা যেহেতু আসবেই, সুতরাং আমাদের সকলকে উচিত এই ব্যাপারটিকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা গঠন করা এবং প্রস্তুতি নেওয়া।

এখন এটা তো আপনিও জানেন, আমিও জানি যে আমরা যত রকমের সামাজিক ঝোঁক, স্রোত বা সামাজিক গতিপথ বুঝতে পারি না কেন, আমরা যদি ভবিষ্যৎ সৃষ্টি না করি তবে ভবিষ্যৎ কখনো সৃষ্টি হবে না। ভবিষ্যতে অসাধারণ কিছু আসবে কি আসবে না সেটা নির্ভর করে আজকের ওপর। আজকে আমরা যা করছি তাই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে। ভবিষ্যৎ হবে যদি আমরা কিছু করি, ভবিষ্যৎ হবে না যদি আমরা কিছুই না করি। এটা সম্পূর্ণ আমাদের ওপর নির্ভর করে। ভবিষ্যৎ ভালো হতে পারে, তবে এটার জন্য তখনই নিশ্চিত হওয়া যায় যখন সেটাকে সৃষ্টির জন্য আমরা আজকে থেকে কাজ করি।

হয়তোবা মহাবিস্ময়কর কিছু ঘটবে যা সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা কি আজকে আমাদের কাজগুলো আরও উন্নত করে করার যে সুযোগ আছে তা কি গ্রহণ করবো? আমাদের কাছে সবকিছুরই গুরুত্ব আছে—

এই মহাবিশ্ব, পৃথিবী, আমাদের দেশ, আপনার কোম্পানি, আপনার জীবন এবং এখন, এই মুহূর্তটিও গুরুত্বপূর্ণ—এই সবকিছুই অসাধারণ।

আজকে আমাদের কাজ হচ্ছে এমন কোনো অসাধারণ পথ খোঁজা যাতে নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি করা যায়, যাতে ভবিষ্যতের এমন এমন পথ নির্মাণ করা যায় যা কেবল ভিন্নই নয়, উন্নতও বটে। ০ থেকে ১ এ গমন, শিকড় থেকে শিখরে অভিযান। সবচেয়ে দরকারি জিনিস বা যদি বলি প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে নিজের জন্য চিন্তা করা। একমাত্র যখন আমরা আমাদের বিশ্বকে একদম নতুন করে দেখবো, একদম সতেজ ভাব ও বিস্ময় নিয়ে দেখবো, যেমন আমাদের পূর্বপুরুষরা দেখেছিলেন, একমাত্র তখনই আমরা এটাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবো এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করতে পারবো।

Audilua.com